শারদীয়

একাদশ বর্ষ ৩৮তম সংখ্যা

১৫শ ইন্টারনেট সংখ্যা

জয়ঢাক ৩৮

সূচিপত্র

	বিষয়	লেখা		ছবির সংখ্যা	লেখক	ছবি/গ্রফিক্স
১	মলাট			১		দেবজ্যোতি
২	জয়ঢাকের দলবল			১		দেবজ্যোতি
৩	আমাদের কথা			১	দেবজ্যোতি	দেবজ্যোতি
৪	সমপাদকীয়	জয়ঢাকি বোল		১	**অচিন্ত্য সুরাল**	সংগৃহীত
৫	কমিকস			৬	প্রচলিত	**মৌসুমী**
৬	গল্প	(ক)	**আমাদের পাড়া**	৩	যশোধরা রায়চৌধুরী	সৌভিক
		(খ)	**মিলামের খেলাঘর**	৩	রাজকুমার রায়চৌধুরী	সোমা
		(গ)	**এক হানা-দ্বীপের কাহিনি**	৩	অ্যালগারনন ব্ল্যাকউড (অনু:অমিত দেবনাথ)	দীপংকর
		(ঘ)	**চেতনের গল্প**	৩	ব্রতেন্দু চক্রবর্তী	**মৌসুমী**
		(ঙ)	**আশীর্বাদ**	৩	জিসি ভট্টাচার্য	সৌভিক
		(চ)	**টিঙ্কি, টান্টু আর খেঁকুড়েরা**	৩	অনন্যা দাশ	সোমা
৭	পুজো স্পেশাল	শিলাকান্হ		৪	দিলীপ রায়চৌধুরী	দীপংকর
৮	ভ্রমণ	ঈশ্বরের নিজের দেশে		৫	ড: পি বি গঙ্গোপাধ্যায়	সংগৃহীত
৯	বিচিত্র দুনিয়া	ভূত সমপর্কিত সামান্য কথা		৫	অরিন্দম দেবনাথ	সংগৃহীত
১০	বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	(ক)	**অংকের বিচিত্র জগৎ**	১	বৈজ্ঞানিক	সংগৃহীত
		(খ)	টেকনো টুকটাক	১	বৈজ্ঞানিক	সংগৃহীত
		গ	ভারতের বৈজ্ঞানিক (নাগার্জুন)	১	টুপুর	সংগৃহীত
১১	বনের ডায়েরি	(ক)	বাঘতাড়ু	১	জে জে দত্ত	সংগৃহীত
		(খ)	ভারতের বনাঞ্চল (সত্যমঙ্গলম অভয়ারণ্য)	২	সংহিতা	সংগৃহীত
১২	**ছড়া**	(ক)	চালচিত্তির খেলা	১	তরুণকুমার সরখেল	সংগৃহীত
		(খ)	সব পারে	১	রতনতনু ঘাটী	সোমা
		(গ)	টুনটুনির চালাকি	২	**অচিন্ত্য সুরাল**	সোমা
		(ঘ)	ইন্দির ঠাকরুণের ছেলেপিলে	১	শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়	সোমা
		(ঙ)	মানবদেহ	১	শেখর রায়	সৌভিক
		(চ)	বৈজ্ঞানিক	১	আবু হোসেন	সৌভিক
		(ছ)	ভেনিস	১	ঈশিতা ভাদুড়ি	সোমা
		(জ)	রামে রাবণে	২	পাহারু চট্টোপাধ্যায়	সৌভিক
		(ঝ)	ঘুনসীবুড়ির জামাই	২	অমিতাভ প্রামাণিক	সৌভিক
১৩	দেশ ও মানুষ	**ঝিলিমিলির সন্ন্যাসিনী**		১	ইন্দ্রশেখর	**মৌসুমী**
১৪	ধাঁধা মজা রহস্য	(ক)	ধাঁধা	০	ইন্দ্রশেখর	
		(খ)	কুইজ	০	ইন্দ্রশেখর	
		(গ)	ডুডল	১	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত

		(ঘ)	হযবরল	১	ইন্দ্রশেখর	দেবজ্যোতি
		(ঙ)	মজার খেলা	১	ইন্দ্রশেখর	দেবজ্যোতি
		(চ)	অবিশ্বাস্য	১	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত
		(ছ)	কীসের ফটো	১	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত
		(জ)	মজার ইন্টারনেট	৪	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত
		(ঝ)	জানো কি	০	ইন্দ্রশেখর	
		(ঞ)	গত সংখ্যার উত্তর	০	ইন্দ্রশেখর	
১৫	ধারাবাহিক উপন্যাস	বগাচি জাতির সন্ধানে		২	শৌনক হালদার	**মৌসুমী**
১৬	কাতুকুতু	(ক)	ফ্রিজ চোর ও ডিনার সেট	১	সংগৃহীত	সৌভিক
		(খ)	যোগচিহ্ন!!	১	সংগৃহীত	সৌভিক
১৭	লিখিব খেলিব	(ক)	আমার স্বপ্ন	১	ঋত্বিক প্রিয়দর্শী	মুকুট
		(খ)	কিপটে	১	প্রমণা চট্টোপাধ্যায়	মুকুট
		(গ)	গ্যালারি	৪		রূপসু, অন্তরা, ,মহুল, বউল
১৮	পুরান কথা	হিড়িম্বার বিয়ে		১	সংহিতা	**মৌসুমী**
১৯	রাশিয়ান গল্প	**তিন বন্ধুর গল্প**		২	আলেক্সেই টলস্টয়	সংগৃহীত
২০	পুরাতনী	**তুফান দরিয়ার পাটনী মাঝি**		২	**হরপ্রসাদ শাস্ত্রী**	সংগৃহীত
২১	**স্মৃতিচারণ**	সেই আয়না		৩	সুজয় রায়	সংগৃহীত
২২	স্মরণীয় যাঁরা	**রাধানাথ শিকদার**		৩	মহাশ্বেতা	সংগৃহীত
২৩	সুরঢাক	এসো গান শুনি		১	প্রদীপ মুখোপাধ্যায়	লেখক
২৪	খেলা	খেলার রাজা পর্বতারোহণ		৩	বাসব চট্টোপাধ্যায়	মূল বই থেকে সংগৃহীত
২৫	টাইম মেশিন	ঠগির আত্মকথা		৩	অলবিরুণী	**মৌসুমী**
২৬	বই পড়া	**অব্যক্ত**		১	মহাশ্বেতা	সংগৃহীত
২৭	লোককথা	**গুজব ছড়ায় কেমন করে**		১	দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য	**মৌসুমী**
২৮	ট্রেকিং	হিমালয়ের হিমবাহ পরিচিতি ও ট্রেকিং রুট		৫	রাজকুমার রায়চৌধুরী	সংগৃহীত
২৯	বিশ্বের জানালা	**টুভালু**		৪	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত

জয়ঢাকের এই সংখ্যার দলবল

অক্ষরবিন্যাসে

রমা একটি প্রকাশনা সংস্থার মালিক

নন্দিনী ইশকুলে পড়ায়

কবি শান্তনু পাহাড়ে যায়, চাকরি করে

তুলিতে মাউসে ক্যামেরায়

সোমা

সোমা ভারতের সবচেয়ে বড়ো ব্যাংকে চাকরি করে

মৌসুমী দশটা ছ'টা অফিস করে

মৌসুমী

সৌভিক

সৌভিক বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করে

দীপংকর ন্যাশনাল ইনসটিট্যুট অব ডিজাইন -এর ছাত্র

দীপংকর

হাজারো ব্যস্ততার মধ্যেও ওরা সবাই তুলিতে মাউসে ক্যামেরায় ও কিবোর্ডে ছবি বানিয়ে ও অক্ষর সাজিয়ে এই সংখ্যার জয়ঢাককে তোমাদের সামনে হাজির করেছে।

জয়ঢাকের কাজ করতে এগিয়ে এসেছে ইশকুলপড়ুয়ারাও। অক্ষরবিন্যাসে, বুক রিভিউতে এবং ছবি আঁকায়। এইখানে তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম–

মহুল
অক্ষরবিন্যাস

মহাশ্বেতা
ছবি আঁকা, বুক রিভিউ

মুকুট
ছবি আঁকা

আমাদের কথা

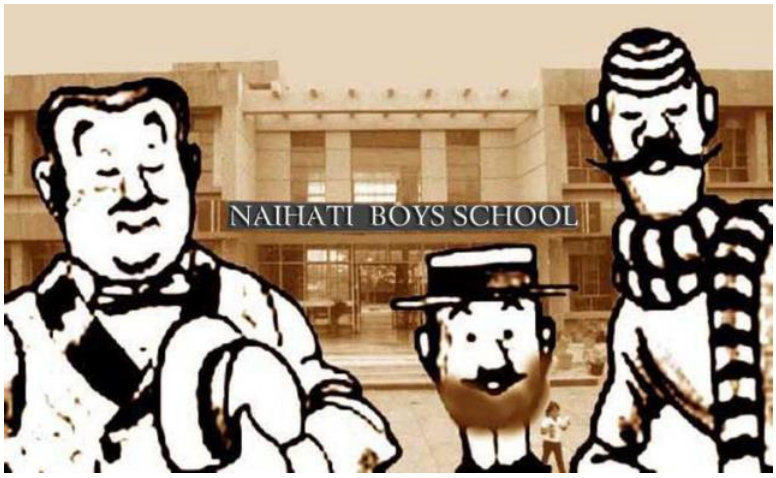

আজ থেকে অনেককাল আগে শুকতারা পত্রিকার শক্তিমান হিরো বাঁটুল দি গ্রেট মাঝে মাঝে হাঙরের রোস্ট দিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে করতে একটা খবরের কাগজ পড়ত। তার নাম দৈনিক জয়ঢাক। একবার স্কুলপড়ুয়া তিন বন্ধু মিলে একটা পোস্টকার্ডে শুকতারা দফতরে এই মর্মে চিঠি পাঠিয়েছিলো যে দৈনিক জয়ঢাক পত্রিকার সদস্য হতে চায় তারা। 'পয়সা লাগিলে বাবা দিয়া দেবে।' ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে প্রায় ছ'টি মাস অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবার পরও যখন তার কোনও জবাব পাওয়া গেল না, তখন কাগজওয়ালাদের ওপর রাগ করে তিনজন মিলে ঠিক করল, না পাঠালো তো বয়েই গেল। তারা নিজেরাই তৈরি করে নেবে জয়ঢাক কাগজ।

সেই ঘটনার পঁচিশ বছর পরে ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে সেই তিন বন্ধু কলেজ স্ট্রিট থেকে ছেপে বের করল জয়ঢাক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। তারপর থেকে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। ইন্টারনেট সংস্করণ বের হতে শুরু করল ২০০৮-এর মার্চ থেকে।

কিছুকাল আগে জয়ঢাকের এক বন্ধু হঠাৎ এক বিচিত্র হিসেব নিয়ে এলেন দফতরে। তাতে দেখা যাচ্ছে এক ফুট চওড়া ও চল্লিশ ফুট উঁচু একটা গোটা গাছ দিয়ে যতটা কাগজ তৈরি হয় ততটা কাগজ লাগছে জয়ঢাকের একটা সংখ্যা ছেপে বের করতে। তিনি প্রশ্ন করলেন সাহিত্যসেবা করবার জন্য প্রতি তিন মাসে একটা করে স্বাস্থ্যবান , পুরোন গাছকে মারাটা কি জয়ঢাকিদের উচিৎ হচ্ছে? সেই শুনে ইস্তক এই মুহূর্তে শুধুমাত্র আন্তর্জাল সংস্করণেই বের হচ্ছে জয়ঢাক পত্রিকা। ছাপার বই বেরোন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

দুটো প্রধান উদদেশ্য নিয়ে কাজ করে এই পত্রিকা। নির্ভেজাল আনন্দ দেবার পাশাপাশি নিজের দেশ ও সংস্কৃতির সঙ্গে কিশোর পাঠকদের গভীর যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়া, আর অন্যদিকে সারা দুনিয়ার নানা আকর্ষণীয় খবর তাদের কাছে এনে হাজির করা। যে শিক্ষা প্রথাগত স্কুলের সিলেবাসে মিলবে না অথচ বড় হয়ে ওঠবার পথে নিতান্তই প্রয়োজন, আনন্দের পাশাপাশি সেই শিক্ষার স্বাদটিও স্কুলপড়ুয়াদের কাছে পৌঁছে দেবার কাজটা সাধ্যমত করছে জয়ঢাক।

কিছু প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

সমপাদকমণ্ডলী: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য , বাসব চট্টোপাধ্যায় (অ: জা:), পার্থ চট্টোপাধ্যায় (পু:নি:)
অলংকরণ নির্দেশনা: মৌসুমী রায়
আন্তর্জাল নির্দেশনা: রোহন কুদদুস।
ডাকযোগাযোগ: জয়ঢাক, প্রযত্নে সুচেতনা প্রকাশন,
১৬এ টেমার লেন। কলিকাতা-৯
মেইল যোগাযোগঃ joydhak@gmail.com

সেদিন বিনির বাড়ি গেছি-আমার হাতে ধরিয়ে দিলো ছবি আঁকার খাতা। চোখ নাচিয়ে বললো, 'তুমি খুলে দেখো সবকটা এর পাতা, দেখতে পাবে মনমাতানো কত রঙিন ছবি। আমার আঁকা সবই।' উল্টে দেখি কোথায় ছবি? পাতাগুলো এক্কেবারে ফাঁকা। আমি বলি, 'মিথ্যে কথা খুব শিখেছ। কিছুই তো নেই আঁকা। মুখটা করে ভার, বিনি বলে, ' মানবো কেন হার? এই তো দেখো প্রথম পাতায় পাহাড়চূড়ার খাঁজে খাঁজে বরফ আছে জমে। ওই পাতাতে সন্ধ্যা নামার ছবি। দিনের আলো আসছে কেমন কমে! উল্টো পাতায় দেখতে পাবে আঁকাবাঁকা ছোট্ট একটা নদী। খেয়ার মাঝি টানছে কেমন দাঁড়! ওই পাড়ে তার খেয়াল করে দেখো, হাতছানি দেয় সবজেরঙা স্বপ্নমাখা পাড়। বাদ দিয়ে দাও পরের দুটো ছবি। সেদিন আমি কি কারণে মায়ের বকা খেয়ে, বসেছিলাম জানলা দিয়ে চেয়ে। খানিক পরে আঁকতে বসে বারেবারেই আসছিলো চোখ বুঁজে। মনের মতো রঙগুলোকেও পাইনি আমি খুঁজে। তার পরে যা হবার, হল! এখন মরি হেসে, দু'চার ফোঁটা জল গড়িয়ে ছবিই গেল ভেসে। যাক গিয়ে সে- এবার দেখো এই পাতাতে– নাওয়া খাওয়া ফেলে, বটের গোড়ায় একটা ছোট ছেলে বাজায় বাঁশি, তারই সুরে পরের পাতার মাঠ পেরিয়ে মন চলে যায় অনেক অ-নেক দূরে। রুপাই বলে, শেষের পাতার ছবি নাকি সবচে' বেশি ভালো। সবক'টা রঙ ছড়িয়েছি তাই ওই পাতাতে রামধনুকের আলো। পাতায় পাতায় রঙমাখানো কতই ছবি আছে ভরে, দেখার মতন মন না থাকে যদি, দেখবে কেমন করে? আচ্ছা , তোমার চোখে দিলাম চাপা। মনে করো আকাশটা এক খাতা। চিন্তাগুলো সরিয়ে রাখো দূরে। মনটাকে খুব আলগা করে রাখো। হাওয়ায় ভেসে যাওতো দেখি উড়ে, আকাশ-খাতায় যেমন খুশি আঁকো। তারপরে সেই ছবিটাকে মনে মনে কাগজ-খাতায় আটকে নিলেই পারো। দেখবে তখন ইচ্ছে হবে আঁকতে আরও আরও।পারলে না তো? তুমিও যে বাবার মতো বড়। এসব কথা বুঝবে না যে, আগেই ছিলো জানা। তাইতো বলি বড় হওয়া ভীষণ ভী-ষণ বাজে। বড় হলেই যায় হারিয়ে ছোট্টমনের স্বপ্নে ওড়ার ডানা।
বিনির কথায় আমার মাথা আপনি গেল ঝুঁকে। চমকে দেখি আজও আমার বুকে বন্দি হয়ে একটা ছোট ছেলে, চেয়ে আছে আকাশ পানে অধীর দুচোখ মেলে। বড় হওয়ার খাঁচায় আটকে গেছে ওড়ার ডানা তার। হারিয়ে গেছে আকাশ খাতায় আঁকার রঙবাহার।

কেমন লাগলো বলো। তোমরা কখনো বিনির মতন মনের রঙ দিয়ে আকাশ খাতায় ছবি এঁকেছো? আমরা চেষ্টা করে দেখেছি। এখনো পুরো বড়ো হইনি তো! তাই একটু একটু ছবিও ফুটেছে। তোমরা চেষ্টা করে দেখো তো! তোমাদের জন্য এবারের এই . রঙিন জয়ঢাকি বোল তুলেছেন তোমাদের অচিন্ত্যদাদা, মানে শ্রী অচিন্ত্য সুরাল। ভালো থেকো সবাই মিলে।
পুজোয় আনন্দ কোরো খুব।

শুভেচ্ছায়,
তোমাদের জয়ঢাকি দাদারা।

পোস্তমনি

অনেককাল আগে গঙ্গাতীরে এক ঋষি থাকতেন

স্বপ্নে থাকতো এক ছোট্ট ইঁদুর। ঋষি তাঁকে কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছিলেন।

একদিন বলল

প্রভু, আপনার অনেক দয়া। যদি কিছু মনে না করেন, একটা প্রার্থনা করি

বলো বাছা, তোমার কি চাই?

প্রভু, এখন আপনি গঙ্গাতীরে যান, একটা বেড়াল এসে কেবল আমাকে ভয় দেখায়। যদি দয়া হয়, আমাকেও বেড়াল করে দিন।

তাই হোক

ধপাস

কয়েকদিন পরে —

কিগো বাছা, সুখে আছো তো এখন?

প্রভু, কতুন বিপদ জুটেছে। কুকুরের অত্যাচারে টিকতে পারছি না, দয়া করে আমাকে কুকুর বানিয়ে দিন।

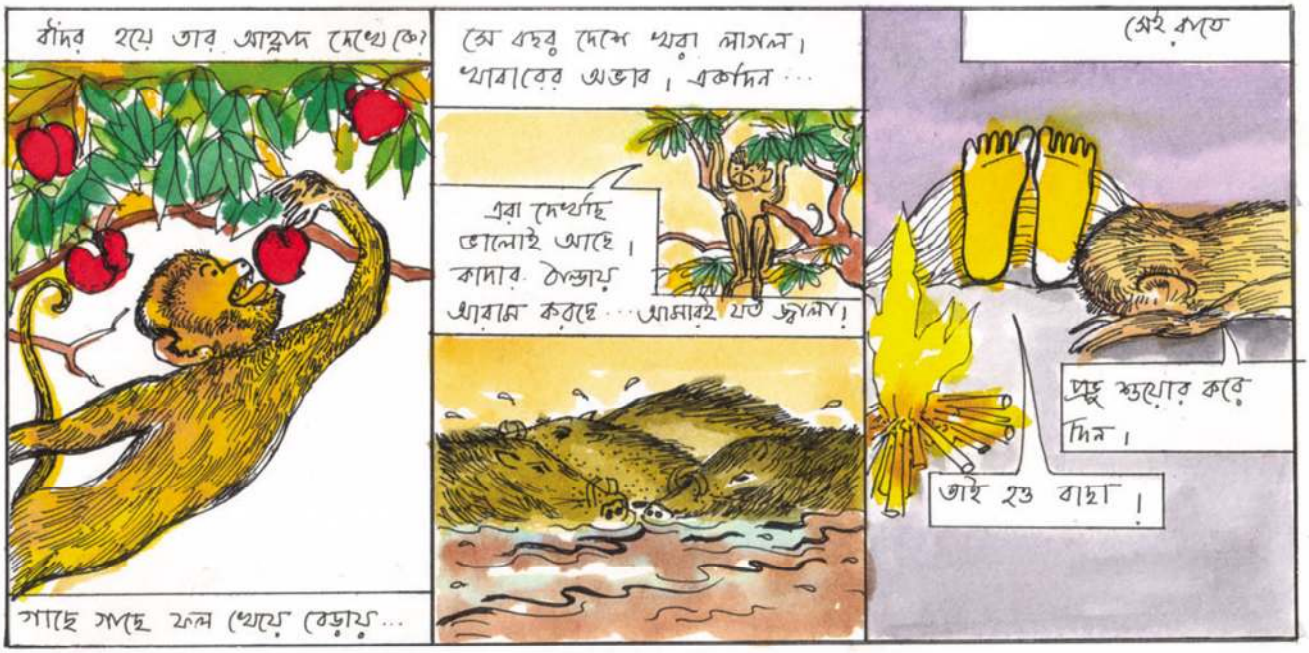

তাই হোক
ভৌ ভৌ ভৌ
কয়েকদিন পরে —
প্রভু আপনার অসীম দয়া। কুকুর হয়ে ভয় কমেছে, কিন্তু খাবারের বড় কষ্ট ...
কি হতে চাও বাছা?
ঐ বাঁদরগুলো খেয়ে বেড়িয়ে মহাসুখে আছে ...আমাকে বাঁদর করে দিন।
তাই হোক

বাঁদর হয়ে তার আহ্লাদ দেখে কে?
গাছে গাছে ফল খেয়ে বেড়ায়...
সে বছর দেশে খরা লাগল। খাবারের অভাব, একদিন ...
এরা দেখছি ভালোই আছে। কাদার তলায় আরাম করছে ...আমারই যত জ্বালা!
সেই রাতে
প্রভু শুয়োর করে দিন।
তাই হও বাছা!

অমনি শুয়োরটা গিয়ে কাদায় নেমে পড়ল।
আঃ কি আরাম!
কিছুদিন পরে দেশের রাজা জঙ্গলে শিকার করতে এলেন - অনেক শুয়োর মারা পড়ল
এতই যদি বিপদ তাহলে শুয়োর কি লাভ হল? তার চাইতে রাজার হাতি হলে কত সুখে হত।

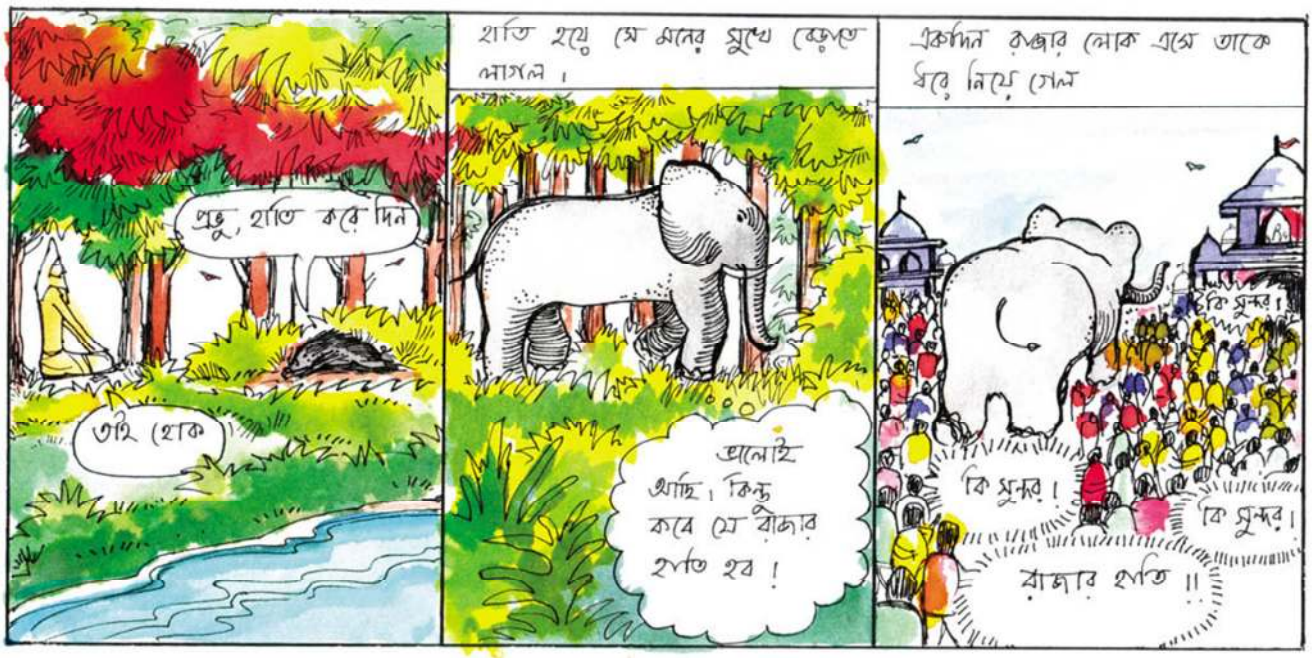

প্রভু, হাতি করে দিন
তাই হোক
হাতি হয়ে সে মনের সুখে বেড়াতে লাগল।
ভালোই আছি। কিন্তু কবে যে রাজার হাতি হব!
একদিন রাজার লোক এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল
কি সুন্দর!
কি সুন্দর!
কি সুন্দর!
রাজার হাতি!!

একদিন রাজা-রানী যাবেন গঙ্গাস্নানে — হাতির পিঠে চড়ে —
রানীকে পিঠে তুলে হাতি মোটেই খুশী নয়।
রানীটা উঠেছে কেন? আমার পিঠে শুধু রাজা উঠবে। অ্যাঁ?
রাজা পড়ে গেছেন! রানী পড়ে গেছেন!

?
রানী, আহা। লাগেনি তো?
সেইসঙ্গে হাতি সব ছেড়েছুড়ে সটান বনের দিকে লম্বা দিয়েছে!
রানীর মতন সুখী আর কেউ নেই পৃথিবীতে!!!
ঋষির আশ্রমে পৌঁছে -
ওকি বাছা, কি হল? রাজার হাতিশালা ছেড়ে চলে এলে কেন?
কি আর বলি ঠাকুর? আপনার এত দয়া - যখন যা চেয়েছি, তাই দিয়েছেন। শেষবারের মতন আমায় একবার শুধু রানী করে দিন।

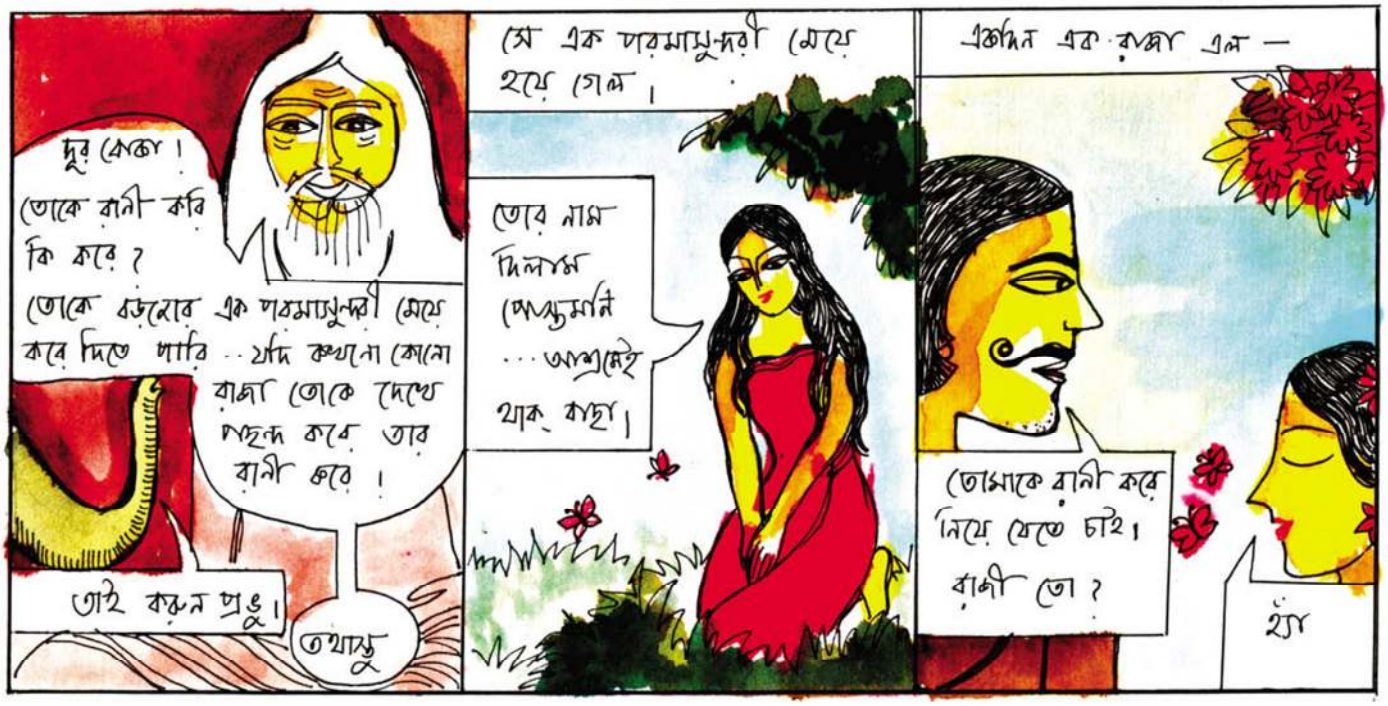

দূর বোকা!
তোকে রানী করি কি করে?
তোকে বরং এক পরমাসুন্দরী মেয়ে করে দিতে পারি.. যদি কখনো কোনো রাজা তোকে দেখে পছন্দ করে তার রানী করে!
তাই করুন প্রভু।
তথাস্তু
সে এক পরমাসুন্দরী মেয়ে হয়ে গেল।
তোর নাম দিলাম পদ্মমণি ... আশ্রমেই থাক বাছা।
একদিন এক রাজা এল —
তোমাকে রানী করে নিয়ে যেতে চাই। রাজী তো?
হ্যাঁ

রানী হয়ে তার বেজায় সুখ!
হাতির পিঠে ঘুরে বেড়ায়
কোনো ভয় নেই
ভালোমন্দ খায়
কোনো চিন্তা নেই
সাজেগোজে

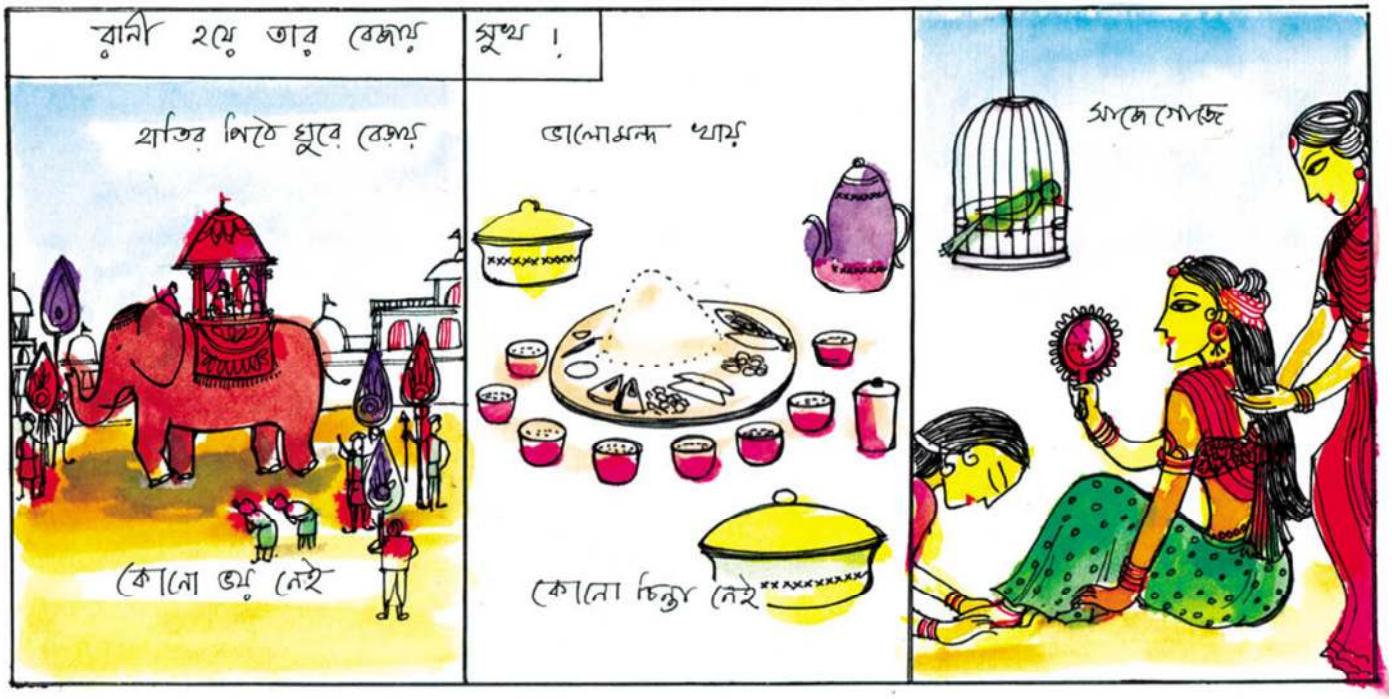

কিন্তু পোস্তমণির বেশিদিন সুখ সইল না। একদিন কুয়োতে ঝুঁকতে গিয়ে
ঝপাস্
হায় হায়! রানী পড়ে গেল!
ধর.. ধর..
রাজা শোকে অধীর হয়ে ঋষির কাছে গেলেন
মহারাজ, যা ঘটে গেছে তারজন্য দুঃখ করবেন না, পোস্তমণি ছিল আমার পালিতা কন্যা... এর গল্প বলি শুনুন
ঋষি একে একে সব গল্প বলে গেলেন
এ কুয়োতেই ওর দেহ থাক মহারাজ। মাটি ভরে দেবেন, ওর দেহ থেকে এক আশ্চর্য গাছ হবে। তার নাম পোস্ত ....
ঐ গাছের অপূর্ব সুন্দর সাদা ফুল ফুটবে। তার বীজ থেকে আফিম নামে এক আশ্চর্য জিনিষ পাওয়া যাবে, যে খাবে তারই নেশা হবে।
নেশার ঘোরে তারা এর মতন দুরন্ত হবে, এর মতন দুধ ভালোবাসবে,
এর মতন ঝগড়া করবে,
এর মতন নোংরা হবে,
এর মতন হিংস্র হবে
আর মতন মেজাজী হবে।
সেই থেকে আফিমের জন্ম হল

পুজো স্পেশাল

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার, শ্রীমতী যশোধরা রায়চৌধুরী)

এ জায়গাটা আমার ভারি ভালো লাগে। সমুদ্র যেন কবে আপন খেয়ালে এই পাহাড়ে ঘেরা নির্জন খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল,তারপর আর বেরোতে পারেনি।জোয়ারের সময় দুই পাহাড়ের মাঝখানে ওই সিংহদুয়ারের মতো পথ দিয়ে হু হু করে জল ছুটে আসে। তারপর নিস্ফল আক্রোশে সারাদিন পাথরের গায়ে মাথা খুঁড়ে মরে।

জাহাজ-কোমপানির লোকেদের বুদ্ধি আছে।বন্দর অনেকটা দূরে। তবুও এই অঞ্চলের বিশেষ আকর্ষণের দিকে লক্ষ্য রেখে সাগরের মুখোমুখি একটা টিলার ওপর সুন্দর বিদেশী কায়দায় হোটেল বানিয়েছে। বর্ষাকাল ছাড়া বাকি আট-ন' মাস হোটেলটা লোকে গিজগিজ করে। জাহাজের যাত্রীরা ছাড়াও দূর-দূরান্তর থেকে লোকেরা ছুটি কাটাবার জন্য এখানে আসে,বিশেষত অক্টোবর থেকে জানুয়ারি এখানে ঠাঁই মেলাই মুশকিল।

অফিসের কাজে এ অঞ্চলে এলেই আমি এখানে উঠি। শহরের ভেতর গরমে পচবার চাইতে এ ঢের ভালো।সঙ্গে অফিসের জিপখানা যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ দূরের পথ আর গায়ে লাগে না।উপকূলে ছড়ানো কফি ও রাবার প্ল্যান্টেশানেই আমার কাজ। এক-একদিনে পঞ্চাশ কি একশো মাইল ঘুরে আসি। তারপর সন্ধ্যায় হোটেলের পোর্টিকোতে যখন পা ছড়িয়ে নিম্বুপানি হাতে নিয়ে বসি,দূরে মাঝ-সমুদ্রে জাহাজের আলোগুলো একে একে জ্বলে ওঠে।

সেবারে ঠিক করেছিলাম অফিসের কাজ শেষ করে দিন সাতেক ছুটি নিয়ে এই হোটেলটায় কাটাব। অনেকদিনের একগাদা লেখার কাজ জমে রয়েছে। কলকাতায় আড্ডার নেশায় হয়েই ওঠে না। সেপ্টেম্বর মাস-কলকাতায় কাজের চাপ কম। স্নেহপ্রবণ ম্যানেজার এককথাতেই রাজি হয়ে গেলেন।

সবে বর্ষা শেষ হয়েছে,আবহাওয়া ভারি চমৎকার, সমুদ্রে চান করেও আরাম। রোদ্দুরে হাত-পা ছড়িয়ে বসে থাকলেও গা পুড়ে যায় না। দিন কাটছে বেশ। হোটেলের লবিতে বসে সারা সকাল কলম কামড়াচ্ছি। এক লাইন লেখা বার করে কার সাধ্য,কোনওরকমে আর মিনিট পনেরো-কুড়ি কাটিয়ে দিতে পারলেই লাঞ্চ,তারপর খেয়েদেয়ে দিব্যি তোফা এক ঘুম।

হঠাৎ মনে হল হনহন করে যেন এক পরিচিত ভদ্রলোক পাশ দিয়ে ডাইনিং হলের দিকে বেরিয়ে গেলেন। মিনিট পাঁচেক বাদেই সন্দেহ ভঞ্জন হল।ঠিক ধরেছি। হলের এক প্রান্তে একটি ছোট টেবিলে আপনমনে খেয়ে চলেছেন আমাদের অতি পরিচিত অধ্যাপক সুশোভনবাবু।

'কী ব্যাপার,এখানে কী মনে করে,স্যার।'

আমার দিকে না তাকিয়েই উনি বললেন,'কেন,সমুদ্র কি আমাদের টানতে পারে না নাকি?'

কলেজ জীবন সে কবেকার কথা। আমাদের ছোট কলেজে পড়াতেন বলে ভুলেই গিয়েছিলাম সুশোভনবাবু একজন উচ্চশিক্ষিত ম্যারিন বায়োলজিস্ট। দেশ স্বাধীন হওয়ার ক'বছর বাদেই সরকারি সামুদ্রিক জীবনবিজ্ঞানের দপ্তরে যোগ দেওয়ার পর উনি আমেরিকার ম্যাসাচুসেটসের উডসহোল ল্যাবরেটরিতে কাজ করে বেশ নামও করেছিলেন। এখন আন্তর্জাতিক সংস্থার চেষ্টায় সমুদ্রের তলদেশ সমপর্কে যেসব গবেষণা চলছে,সুশোভনবাবু তার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত।

সময় কাটাবার এরকম একজন অভাবিত সঙ্গী পেয়ে ভীষণ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম। ভারতীয় নৌবাহিনীর 'চন্দ্রশেখর' জাহাজখানাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ভারত মহাসাগরের উপকূলে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজের জন্যে।সুশোভনবাবু সেই গবেষক গোষ্ঠীর প্রধান। সারাটা দিন জাহাজেই কাটান,কেবল খাওয়ার জন্য কিছুক্ষণ ফেরেন।কখনও-সখনও দূরের পাড়ি হলে জাহাজেই ক'দিন কাটে।

সন্ধের পর একা একা হোটেলের লবিতে বসে কলকাতার প্লেনে সদ্য আমদানী স্টেটসম্যান কাগজখানা চোখ বুলিয়ে দেখছি,এমন সময় সুশোভনবাবু এলেন। চান-টান করে বেশ মেজাজ শরিফ মনে হচ্ছে।

'মাফ করো সঞ্জয়,সকালে তাড়াহুড়োয় তোমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলা হয়ে ওঠেনি। কিছু মনে করোনি তো?'

'না স্যার,আমি বুঝতে পেরেছি।কিন্তু কেবল ভাবছি কোথায় সেই ল্যাবরেটরি আর কোথায় জাহাজের ডেক। এ-জীবন আপনার কেমন লাগছে,স্যার?'

'কোনওদিন পাহাড়ে চড়েছ,সঞ্জয়?উঁচু পাহাড়ে চড়ার যে উত্তেজনা,মহাসাগরের তলায় ব্যাথিস্ফিয়ারে নেমে যাওয়া তার চেয়ে কম উত্তেজক নয়।'

আস্তে আস্তে গল্প জমে গেল। সুশোভনবাবু অদ্ভূত ভালো বলতে পারেন।

'সমুদ্রের রৌদ্রালোকিত ওপরতলার এবং একেবারে নিচেকার পাহাড় ও উপত্যকার মাঝখানেই মহাসাগরের সবচেয়ে অজানা অংশ। এই গভীর অন্ধকার রহস্যময় সাম্রাজ্যের সঠিক খবর সংগ্রহ করাই এ-শতাব্দীর ওশানোগ্রাফারদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

'একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে,সঞ্জয়,এই রহস্য ভেদ করার কাজে আমাদের ক্ষমতা কতটুকু। ডুবুরিরা অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে তিনশো ফুট পর্যন্ত যেতে পারে। বিশেষ হেলমেট ও

রবারের পোশাক পরে মেরে-কেটে নয় ওটাকে বাড়িয়ে পাঁচশো ফুট করা গেল। কিন্তু সূর্যের আলো যেখানে ঢোকে না সেই নিরন্ধ্র অন্ধকারের রাজ্যে যেতে গেলে ব্যাথিস্ফিয়ার ছাড়া গতি নেই। প্রায় তিরিশ বছর আগে দু'জন আমেরিকান প্রায় আধ মাইল পর্যন্ত ব্যাথিস্ফিয়ারে নামতে পেরেছিলেন। তার চেয়ে উন্নত ধরনের স্টিল স্ফিয়ার এখন তৈরি হয়েছে যাতে আরো তলায় যাওয়া যায়।

'আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। তুমি কাল আমার সঙ্গে চলো না, আমাদের জাহাজটা দেখে আসবে। ব্যাথিস্ফিয়ার ছাড়া আমাদের আরও ইন্টারেস্টিং যন্ত্রপাতি আছে। সমুদ্রতলের জন্য উন্নত ধরনের ক্যামেরা, প্রতিধ্বনি যন্ত্র, অ্যাসকানিয়াগ্রাফ--সমুদ্রের গ্র্যাভিমিটার--যা দিয়ে কিনা সমুদ্রের তলাকার মাধ্যাকর্ষণের তারতম্য বুঝতে পারি--এই সব নানা যন্ত্র। কাল সকালেই চলো, কেমন? রাত হয়ে গেছে, চলো, খেয়ে নেওয়া যাক।'

ভীষণ উৎসাহিত হয়ে পড়লাম। এ যে মেঘ না চাইতেই জল। ছুটি কাটাবার এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর কী হতে পারে। চুলোয় যাক লেখা। উত্তেজনায় রাত্তিরে ঘুম এল না।

সকাল এখানে দেখবার মতো। পাহাড়ের ওদিকটা দিয়েই আমাদের ঘুরে যেতে হবে।

ওঁদের জাহাজটা হারবার থেকে প্রায় মাইল দশেক দূরে নোঙর করা হয়েছে। সমুদ্রের কোল ঘেঁষে অপূর্ব মসৃণ পথ। ডাইনে সমুদ্রের দিকে যতদূর নজর যায় দু-একটা সি-গাল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। খালি একপাশে একটি আলোকস্তম্ভ সকালের কাঁচা রোদে চিকচিক করছে।

'চন্দ্রশেখর' জাহাজের কাছাকাছি আসতেই সুশোভনবাবু নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন,'তোমাকে যে নিয়ে যাচ্ছি সঞ্জয়, এটা সমপূর্ণ নিজের দায়িত্বে। ওখানে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট অমরেশ তোমার সহপাঠী ছিল। সে ছাড়া আর কেউ তোমাকে চেনে না। সরকারি ঝামেলা এড়াতে তোমাকে সদ্য আমেরিকা-প্রত্যাগত ডা, বোস বলে পরিচয় দেব। ওদের কাছে তুমি একজন নামকরা বৈজ্ঞানিক বলেই প্রতিভাত হবে।'

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে অনেকটা উঠতে হল। জাহাজের ডেকে দু-একজন সাধারণ খালাসি ঘষামাজা করছে। এছাড়া প্রাণের আর বিশেষ সাড়া নেই। কেবিনের মধ্যে ঢুকে দেখি কে একজন কানে হেডফোন লাগিয়ে কি শুনছে, এবং তাকে ঘিরে প্রায় জনা দশ-পনেরো মানুষ চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে। ভিড়ের মধ্যে অমরেশকে চিনতে কষ্ট হল না। সে আমাকে বিশেষ লক্ষ্য না করে সুশোভনবাবুর দিকে এগিয়ে এল, তার গলায় ঈষৎ উত্তেজনার আভাস, 'স্যার,কী এক অদ্ভুত আওয়াজ আসছে হাইড্রোফোন মারফত। কখনও মনে হচ্ছে ক্রুদ্ধ পশুর গর্জন, কখনও মনে হচ্ছে বাঁশঝাড়ে আগুন লেগেছে--কাঁচা বাঁশ ফাটার আওয়াজ।'

সুশোভনবাবু একটু বিরক্ত হয়ে বললেন,'এখানে এত ভিড় কেন? তোমরা সকলে যে যার কাজে যাও। গোয়েল,প্লিজ,হেডফোনটা আমাকে দাও।'

আস্তে আস্তে কেবিন খালি হয়ে গেল। সুশোভনবাবু হেডফোন কানে দিয়ে চিন্তিত মুখে মাঝে মাঝে কী যেন নোট করতে লাগলেন।কিছুক্ষণ পরে হেডফোনটা নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলেন,'অমরেশ,যেখানে হাইড্রোফোনটা রয়েছে তার গভীরতা কত হবে?'

'স্যার,পঞ্চাশ ফ্যাদমের বেশি হবে না।'

'মাত্র! ভাবিয়ে তুললে তো। আওয়াজটা কোনও বড়সড় সামুদ্রিক জীবের হলে আমরা আগে জানতে পারতুম, কারণ ইকো-সাউন্ডিং-এ তাহলে দুটো প্রতিধ্বনি আসত। আচ্ছা,ও-জায়গাটার টোপোগ্রাফি আমরা কি জানি?'

‘স্যার টোপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপটা আমরা কালকেই শেষ করেছি। যেখানে জাহাজটা আছে সেটা মহাদেশের ঢালু অংশের প্রান্তে। এরপরে অগভীর অংশটা খুবই এবড়ো-খেবড়ো।অবশ্য পঞ্চাশ কিলোমিটার এগোলে সেটা মসৃণ হয়ে গেছে।’

আমি বিস্মিত হয়ে ওদের ম্যাপটা দেখছিলাম। ভীষণ খেটেছে বলতে হবে। উপকূল থেকে পাঁচশো কিলোমিটার পর্যন্ত সমুদ্রতলের খুঁটিনাটি অনেক কিছু জেনে ফেলেছে। কোথায় কী ধরনের সেডিমেন্ট আছে, সেডিমেন্টের তলায় কী ধরনের পাথর, সবই এক ঝলকে বোঝা যায়।

ঘন্টা দু-তিন কাটতেই বুঝলাম সুশোভনবাবু আমার অস্তিত্ব বেমালুম ভুলে গেছেন।সেই যে কখন একবার কফি খেতে খেতে দু-একজনের কাছে আমাকে ডা,বোস বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তারপর একেবারে নিজের কেবিনে। আমিও ওঁকে বিশেষ ঘাঁটাতে সাহস পাচ্ছি না।

জাহাজের ডেকে অবশ্য বিশেষ খারাপ লাগবার কথা নয়। একটা ডেক চেয়ারে বসে উপভোগ করছি সমুদ্রের হাওয়া। দূরে কয়েকটা জেলে-ডিঙিতে নুলিয়ারা জাল ফেলে মাছ ধরছে।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম,দূরের একটি ডিঙিতে যেন কিসের একটা উত্তেজনা। একটি নুলিয়া তার পাশের সঙ্গীকে নিয়ে কী এক অজানা ভয়ে যেন বিপর্যস্ত। পাশের কেবিনে গোয়েল ছিল। ওর সঙ্গে ইতিমধ্যেই আমার আলাপ হয়ে গিয়েছিল। ওকে বললাম,‘গোয়েল,প্লিজ,বাইনোকুলারটা একবার দেবে?’

বাইনোকুলারটা লাগিয়ে দেখি ইতিমধ্যে নুলিয়ারা হাত নেড়ে ওদের আশপাশের বেশ কিছু সঙ্গী-সাথীদের জড়ো করেছে। সবাই মিলে ঝুঁকে পড়ে নৌকোর খোলের মধ্যে কী যেন দেখছে।

কৌতূহল আর রাখতে পারলুম না। ডেকে লাইফ-বোটের অভাব নেই।নাবিক-লস্কর নিতান্ত কম নয়। সোজা গিয়ে সুশোভনবাবুকে বললাম,‘স্যার,চুপচাপ বসে আছি, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে দু’জন লোক নিয়ে একটা নৌকোয় কিছুক্ষণ ঘুরে আসি।’

সুশোভনবাবু অন্যমনস্কভাবে বললেন,‘সে তো ভালোই।কিন্তু বেশি দূরে যেও না। আর একটা কথা, চারটের আগেই ফিরে এসো,কারণ তোমার সঙ্গে হোটেলে ফিরে গিয়ে আমাকে কয়েকটা ট্রান্স-কন্টিনেন্টাল টেলিফোন করতে হবে।’

জেলেদের নৌকোটাকে ধরতে কুড়ি মিনিটের বেশি সময় লাগল না। সমুদ্র যেন শান্ত হ্রদ।মাল্লারা ওদের ভাষা জানে। সরকারি জাহাজ থেকে দেখতে এসেছি শুনে ওরা সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল।যা দেখলাম,তা কোনদিন কল্পনাও করিনি।

একটা অবিশাস্য মাছ--না,জন্তুও বলা যায়। প্রায় পাঁচ ফুটের মত লম্বা হবে। বিচিত্র ধরনের উজ্জ্বল নীল আঁশ, এক অস্বাভাবিক বিরাট মাথা। তাছাড়া পাখা,লেজ,সব মিলিয়ে যেন প্রাগৈতিহাসিক কাহিনীর পাতা থেকে উঠে এসেছে। দেখলে গা শিরশির করে।

মাল্লাদের বললাম,‘ওদের বুঝিয়ে দাও সরকার এ-মাছ কিনে নেবে।’ এরকম হিংস্র জীব ওদের কাছে থাকা ঠিক নয়। মাছটা তখনও অল্প অল্প নড়ছে। ওটাকে জাল মুড়ি দিয়ে লাইফ বোটে তুলতে চারজন লোক হিমশিম।অবশ্য জাহাজের ওপরে তুলতে বেগ পেতে হল না।ভাগ্যে ছোট ক্রেনের বন্দোবস্ত ছিল। ইতিমধ্যে ডেকে এক উৎসুক ভিড়। কখন কে যেন সুশোভনবাবুকে খবর দিয়েছে। তিনি ভিড় সরিয়ে এসে থমকে দাঁড়ালেন, যেন ভূত দেখেছেন। মৃদু স্বরে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল,‘মাই গড, শিলাকান্থ।’ ছ’কোটি বছর আগে এদের যে ফুরিয়ে যাওয়ার কথা!’

সকলে প্রায় পাঁচ মিনিট বিস্ময়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্থাণু। হঠাৎ সুশোভনবাবুর গলার আওয়াজে সংবিৎ ফিরল।

‘শিগগির, এটা এখনও বেঁচে আছে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে হয়তো মারা যাবে। তার আগে নিয়ে চলো জাহাজের অ্যাকোয়ারিয়ামে।’

এ-জাহাজে যে এত সুন্দর একটা অ্যাকোয়ারিয়াম আছে কে জানত! তার জলের তাপমাত্রা দরকারমতো বাড়ানো-কমানো যায়। এই অদ্ভূত জীবটার প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবেশ সৃষ্টি করতে খুব বেশি সময় লাগল না। তখন মাছটা আবার স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে লাগল। বেশ কয়েক জোড়া উৎসুক চোখ ওর দিকে সে-সময় নিবদ্ধ। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। অ্যাকোরিয়ামের মধ্যে একটা ছোট হাইড্রোফোন লাগানো। সুশোভনবাবুর কানে হেডফোন এবং তার মুখের চেহারায় যেন কোনও এক দূরূহ সমস্যা সমাধানের আনন্দের চিহ্ন।

হোটেলে ফিরে যাওয়া আর হল না। সারাটা বিকেল, সারাটা রাত ধরে ওঁরা শিলাকান্থ সমপর্কে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন।মেটাবলিজম,রেসপিরেশন রেট, এরকম আরও কত কি সব জৈব রাসায়নিক ব্যাপার। সে-রাতে কারোই ভালো করে ঘুমানো হল না। ভোরবেলায় দেখি বিরাট তোড়জোড় চলছে। যে-জায়গায় হাইড্রোফোন মারফত ওইসব বিচিত্র আওয়াজ আসছিল সেখানে ব্যাথিসফিয়ার নামিয়ে দেখা হবে। কী করে যে ওই ব্যাথিস্ফিয়ারের যাত্রী হওয়া যায় তাই ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে সুশোভনবাবুর কেবিনের দিকে গেলাম।

কেবিনের দরজা ভেজানো ছিল। নক করতেই আওয়াজ এল,‘কাম ইন। ও, তুমি। দেখো তো কী কান্ড।’ ছুটিতে বেড়াতে এসে তুমি কিসের মধ্যে জড়িয়ে পড়লে। যাই হোক ডক্টর বোস,জাহাজের প্রত্যেকটি কর্মীর কাছে তুমি এখন একজন অত্যন্ত নামী লোক। তোমারই আগ্রহে আমরা বিবর্তনের একটা হারানো সূত্র খুঁজে পেয়েছি।’

আমি একটু লজ্জিত হয়ে পড়লাম,'সে কী কথা,স্যার! আমি আবার কী করলুম। এটাকে চিনতে পারা তো খুব সহজ কথা নয়।'

'সেটা ঠিকই। যদিও পৃথিবীর বহু মিউজিয়ামে শিলাকান্থের ফসিল সংগৃহীত হয়েছে,আগে কেবলমাত্র দু'বার সজীব প্রাণীর দেখা পাওয়া গেছে। প্রথম ১৯৩৮ সালে,দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে। সেবারে যে জেলের দল ওই জীবটিকে ধরেছিল, বিজ্ঞানীরা খোঁজ পাওয়ার আগেই তারা ওটাকে কেটেকুটে শেষ করে ফেলে। তারপর ১৯৫২ সালে মাদাগাস্কারের কাছে যেটিকে পাওয়া যায় তার সম্পর্কেও পুরো গবেষণা হয়নি।

'আমরা জানি,ফসিলের হিসেবে অন্তত ছ'কোটি বছর আগে এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু অন্তত তিরিশ কোটি বছর আগেও যে এদের পূর্বপুরুষরা প্রাগৈতিহাসিক সমুদ্রে বিচরণ করত,এ-কথা জোর দিয়ে বলা যায়। সেদিক থেকে এরা ডাইনোসরদের চেয়েও বয়সে বড়।

'শিলাকান্থ কথাটার অর্থ হল ফাঁপা মেরুদন্ড। এই জাতের মাছ থেকেই যে সবরকমের মেরুদন্ডী জীব-খেচর,ভূচর,উভচর উদ্ভূত হয়েছে,একটু খুঁটিয়ে দেখলেই সেটা আমরা বুঝতে পারব। লক্ষ্য করে দেখেছ, ওটার পাখনাগুলো ঠিক অন্য মাছের পাখনার মতো নয়,বরং কতকটা হাঁসের পায়ের মতো।যেন এখনই উঠে আসবে ডাঙায়। অগভীর জলে ওদের পাওয়া গেলে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

'তবে আমার প্রশ্ন হল, এই যে এক-একটা শিলাকান্থ ধরা পড়ছে, এদের সত্যিকারের আস্তানা কোথায়? সমুদ্রের এই ওপরতলার বাসিন্দা ওরা নয়। সেটা ওদের গায়ের আঁশের রঙ,নি,শ্বাস-প্রশ্বাসের ধরন-ধারণ দেখলেই বোঝা যায়।

'...কিন্তু এখন আমাকে থামতে হবে। ব্যাথিস্ফিয়ারে নামার জন্যে তৈরি হতে হবে। তা বেশ তো,তুমিও চলো না।'

বাইরে বেরিয়ে দেখি, শিলাকান্থের গল্পে এত তন্ময় হয়ে ছিলাম যে,বুঝতে পারিনি জাহাজ নোঙর তুলে কতদূর চলে এসেছে। জাহাজের প্রপেলারের ঘায়ে সাগর ফেনায় ফেনা,গাঙ চিলেরা জাহাজের গায়ে ভিড় করেছে খাবারের লোভে।

কতদূরে এসে যে জাহাজের গতি মন্থর হল তা বলতে পারিনা। সূর্য তখন প্রায় মাথার ওপরে।ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ।

ব্যাথিস্ফিয়ারের ভেতরকার বন্দোবস্ত ভারি চমৎকার। শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত। বসবার আসন পুরু গদি মোড়া। টেলিফোন, লেখার ডেস্ক, একপাশে সবই ব্যবস্থা আছে। প্রথমে সিঁড়ি বেয়ে ঢুকে গেল অমরেশ। ভেতর থেকে সংকেত দেওয়ার পর সুশোভনবাবু, আমি ও রহমান বলে আর-একটি অ্যাসিস্ট্যান্ট একে একে ঢুকলাম। শুনতে পেলাম, প্রেশারাইজড ঢাকনাটা ওরা বাইরে থেকে সশব্দে বন্ধ করে দিল। এরপর ভেতরে এয়ারকন্ডিশনারের ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকের মতো আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই উইঞ্চ-লিফটে আমাদের ব্যাথিস্ফিয়ার নামতে শুরু করল। দেখি হাতঘড়িতে তখন প্রায় বেলা বারোটা।সুশোভনবাবু আগে একবার বলেছিলেন চারটের আগে ওপরে উঠে ওকে আজ রাত্তিরের মধ্যেই হোটেলে ফিরতে হবে।আস্তে আস্তে ব্যাথিসফিয়ারের জানলায় সূর্যের আলো মিলিয়ে গেল।তবুও দেখি এক তীব্র লাল আভা জেগে রয়েছে।এখানে-ওখানে দু-একটা সামুদ্রিক মাছ।কখনও বা ভাসমান শ্যাওলা।।তারপর হঠাৎ কোন জাদুমন্ত্রে যেন সেই লাল আভা অদৃশ্য হল। পাশে মিটারে দেখি নেমেছি মাত্র দ'শ ফুট। বাইরে এখন নীল-সবুজে-মেশানো গাঢ় শীতল এক

ভয়ের রাজ্য। ব্যাথিস্ফিয়ারের তীব্র আলোয় কখনও মাছের ঝাঁক ত্রস্তভাবে দ্রুতগতিতে এদিক থেকে ওদিকে চলে যায়। কতরকমের মাছ--কোনওটা কাচের মতো স্বচ্ছ,এক্স-রে ছবির মতো অশরীরী। আবার কোনওটার বা হাঙরের মতো ধারালো দাঁত।

'ওই যে, ওগুলো এরোওয়ার্ম, তার পাশেরগুলো কম্বজেলি,' সুশোভনবাবু বলে যেতে লাগলেন। আমাদের দৃষ্টি চুম্বকের মতো জানলায় আঁটা।

শৈশবের অনেক প্রশ্ন চুপিসাড়ে মাথাচাড়া দিতে লাগল মনের মধ্যে, মাছ কী করে গভীর সমুদ্রের তলায় অত চাপ সহ্য করে বেঁচে থাকে? অক্সিজেনই বা পায় কোথা থেকে? এক-একবার ভাবি সুশোভনবাবুকে জিজ্ঞেস করব,কিন্তু সাহস পাই না। উনি একেবারে নিমগ্ন হয়ে গেছেন।

হঠাৎ অ্যালার্ম ঘন্টির ঝনঝন আওয়াজে আমরা সকলেই সচকিত হয়ে পড়লাম। কী ব্যাপার! কোনও ডুবো পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগল নাকি?তাই বা কী করে হয়? অমরেশ তো সর্বক্ষণ রেডারের সামনে বসে কন্ট্রোল করছে আর ওপরে গোয়েলকে নির্দেশ দিচ্ছে। এদিকে এমার্জেন্সি আলোটা দপদপ করে কী যেন জানাতে চাইছে।

'কুইক অমরেশ, গোয়েলকে বলো আমাদের সাউথ-ওয়েস্ট-এ সরিয়ে নিতে। আমরা নিশ্চয়ই কোনও বড় মাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছি। এটা ডুবোপাহাড়ের চেয়েও বেশি বিপদজনক হেতে পারে,কারণ অনেক মাছের লেজের ঝাপটায় পুরু ইস্পাতের পাতও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।'

সুশোভনবাবুর ধারণা নির্ভুল।কয়েক মিটার সরে যেতেই সার্চলাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেলাম সেই বিচিত্র উজ্জ্বল নীল মাছ,শিলাকান্থ! অকস্মাৎ ধাক্কা লাগায় চোখ থমথমে ক্রুদ্ধ।

'দেখুন স্যার,ওটা কোনও গর্ত থেকে বেরিয়েছিল।আবার সেখানে ঢুকে যাচ্ছে!' অমরেশ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে গর্তের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক মাছটা ঢুকছে সেটা একটা ডুবো আগ্নেয়গিরির গহ্বর। কবে কোন সুদুর অতীতে এই আগুন-পাহাড়ের আগুন নিভে গিয়েছিল কে জানে! সার্চলাইটের তীব্র আলোয় দেখা গেল গহ্বরের মুখটা যথেষ্ট বড়। প্রায় কুড়ি ফুট ব্যাসের এক বৃত্ত। শিলাকান্থটা মিলিয়ে যাওয়ার পর সূচীভেদ্য অন্ধকারে আর কোনও প্রাণের সাড়া নেই।

অনেকক্ষণ আমরা নিস্তব্ধ হয়ে কাটালাম।সকলের মনে একই প্রশ্ন, গহ্বরের মধ্যে আমরা ঢুকব কি না। তাকিয়ে দেখি,সুশোভনবাবু গভীর চিন্তামগ্ন। অবশেষে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে উনি বললেন,'আমাদের নিচে নামতে হবে। রিস্ক কিছুটা আছে,কিন্তু নাটকের শেষ দৃশ্য দেখতে হলে এছাড়া আর উপায় কী?কিছু না জানিয়ে গোয়েলকে খুব শান্তভাবে গাইড করো,অমরেশ।'

গহ্বরের মুখ বরাবর ব্যাথিসফিয়ার ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল। আড়াই হাজার ফুট...দু'হাজার সাতশো ফুট...। আরও কিছুদূর এগোনোর পর অন্ধকার যেন তরল হল। কোথা থেকে যেন আলো আসছে। অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ছোট গাছপালায় ভর্তি পাহাড়। কিন্তু সে গাছপালা পৃথিবীর কোনও পরিচিত চৌহদদির নয়। পাহাড়গুলো ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় সেগুলো গ্রানাইটের নয়,যেন প্রবালে পূর্ণ। আরও বোঝা যায়,সেখানে স্বচ্ছ স্ফটিকের মত অসংখ্য তারামাছ রয়েছে। তাদের দেহ থেকে বিচ্ছুরিত আলো কেমন এক আলো-আঁধারি ভৌতিক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। প্রবাল ও অন্যান্য সামুদ্রিক গাছপালা দেখলে মনে হয় সমুদ্র এখানে খুব ঠান্ডা নয়।

সুশোভনবাবু হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলতে আর করলেন,'এ কী! আমরা একেবারে প্রাগৈতিহাসিক পরিবেশে এসে পড়েছি। ওই তো, দ্যাখো, কাঁকড়ার মত ওগুলো ক্রাস্টাসিয়া গ্রানটোলাইট। আরও কত কী!রুদ্ধ নি,শ্বাসে আমরা তখন দেখছি চোখের সামনে দিয়ে সিনেমার ছবির মতো সরে যাচ্ছে অসংখ্য অচেনা সামুদ্রিক প্রাণী। কোনওটার পুরু আঁশ,কোনওটা বুকে-হাঁটা চিংড়ির মতো সাঁতারু--কপালের মাঝখানে একটা বিরাট ভয়াল চোখ। সমুদ্রের ওপরতলায় যা ভাবা যায়নি, বোঝা যায়নি, সেইসব অবিশ্বাস্য জীব!

'অমরেশ,লক্ষ্য করো, প্রাণীগুলো যেন পুবদিকে চলেছে কোন এক অন্ত,সলীলা স্রোতে ভর করে। জলের টেমপারেচারটা একবার দেখো তো।'

অমরেশ অনেকক্ষণ মন দিয়ে কী সব মিটারে যেন দেখল; তারপর চেঁচিয়ে উঠল,'গুড হেভেনস স্যার! সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর নামাটা কি...'

ওর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। দিগন্তে কোথায় যেন একসঙ্গে একশোটা বাজ পড়ল। কী হয়েছে কিছু বুঝে ওঠার আগেই চারদিকে যেন প্রচন্ড আলোড়ন। প্রাথমিক বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে দেখি আমরা সকলেই ব্যাথিস্ফিয়ারের চারদিকে ছিটকে পড়েছি। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে।মনে হচ্ছে, ব্যাথিস্ফিয়ারের ইস্পাতের দরজায় বিরাট এক গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে। সেখান দিয়ে জল ঢুকছে কুলকুল করে। ক্রমে সেই জল যেন আমার মাথা বেয়ে জামার মধ্যে ঢুকছে। হাত দিয়ে দেখি জল নয়,রক্ত!পড়ে গিয়ে চোট পেয়ে কেটে গিয়েছে। সেই চেতন-অর্ধচেতন অবস্থার মধ্যেই দেখলাম সমুদ্রের তলা থেকে বিস্ফোরণের বেগে উঠে আসছে ধোঁয়ার কুন্ডলী মতো উৎক্ষিপ্ত মাটি,পাথর। পাহাড়ের প্রান্ত থেকে ছুটে আসছে যেন এনসাইক্লোপিডিয়ায় দেখা প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর ছবির জীবন্ত প্রতিমূর্তি,ইকথাইওসর--হাড়ের খাঁচায় ঢাকা চোখ তেকোনো ধারালো দাঁত অস্পষ্ট আলোয় ইস্পাতের ফলকের মতো চকচকে, লম্বা গলা ও পাখনাওয়ালা বীভৎস সামুদ্রিক সরীসৃপ--প্লেসিওসর। সেই প্রবাল পাহাড় খানখান হয়ে

ভেঙে পড়ছে। যেন কোনও আহত দানবের অসংখ্য ক্ষতস্থান দিয়ে রক্তপ্রবাহের মতো পাহাড়ের বিদীর্ণ জায়গাগুলো দিয়ে বেরিয়ে আসছে তরল আগুনের মতো লাভা স্রোত।

মনে হল বর্ষার নদীতে চান করতে নেমেছি। প্রচন্ড ঝড় উঠেছে,আমার নাক, কান ও মুখ দিয়ে প্রমত্ত বেগে জল ঢুকছে। ভেসে থাকতে পারছি না। আমি ডুবে যাচ্ছি। চোখ খোলার চেষ্টা করলেই ঘোলা জল সবকিছু মুছে অন্ধকার করে দিচ্ছে। অবসাদে সমস্ত শরীর শিথিল...ঘুমে সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ছে দীর্ঘ,ক্লান্ত দিনের শেষে ঘু...ম...।

তারপর কখন চোখ খুলেছি জানি না। দেখি একটা খোলা জানলার পাশে শুয়ে আছি। বাতাসে জানলার পর্দাটা অল্প অল্প দুলছে। একটা ছোট টিপয়ে ফুলদানিতে সুন্দর ফুল সাজানো।পরিষ্কার ইংরেজিতে শাসনের সুরে নারীকন্ঠে কে যেন বলছে, 'এখন কিন্তু মোটেই উঠবার চেষ্টা করবেন না। শরীর আপনার ভীষণ দুর্বল।'

আমার মাথায় পুরু ব্যান্ডেজ, কোনও এক তীব্র ওষুধের গন্ধে সমস্ত ঘর ভরে আছে।

'কোথায়? কোথায় আমি?'

'এটা হারবার হসপিটাল।'

সংক্ষেপে আমাকে আশ্বস্ত করে মেয়েটি চলে গেল। বোধ হয় নার্স হবে। কিছুক্ষণ বাদেই নার্সটি ফিরে এল। সঙ্গে সুশোভনবাবু ও অমরেশ।

'এই যে সঞ্জয়। এখন কীরকম লাগছে? বাপ রে, তুমি যা ভাবিয়ে তুলেছিলে! তোমার ছাড়া আমাদের কারও আঘাতই তেমন গুরুতর হয়নি।'

অমরেশের কপালে ছোট একটা প্লাস্টার লাগানো। ও বলল,ভাগ্যিস বিদ্যুৎ আমাদের আচ্ছন্ন মস্তিষ্কের চেয়ে দ্রুত কাজ করে! তাই আমাদের বিপদের সংকেত কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গোয়েলের কাছে পৌছে যায়। এমার্জেন্সি এলার্মটা একটা কর্ড দিয়ে সবসময় আমার হাতে বাঁধা থাকত। তাই পড়ে যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই ওপরে খবর গেছে।'

হাসপাতালে ক'দিন কাটিয়ে হোটেলে ফিরেই কলকাতায় ফেরার গোছগাছ আর করেছি।কাল সকালের প্লেনেই যাব।সেদিন রাতে 'চন্দ্রশেখর' জাহাজের সব অফিসারদের খেতে বলেছি।খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের প্রিয় পোর্টিকোতে বসে কফি খাচ্ছি সকলে মিলে।রাত্রি দশটার পর হোটেল এখন নির্জন হয়ে গেছে।আমরা ছাড়া কেউ বোধ হয় জেগে নেই।

সুশোভনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম,'স্যার,সমুদ্রের এ-কাহিনী কাকেই বা বলব, কে-ই বা বিশ্বাস করবে। তবুও নিজের মনটাকে পরিষ্কার করার জন্যে একটা প্রশ্ন করি,যা আমরা দেখেছি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কী? বিবর্তনের রাস্তায় কোটি কোটি বছর অগেকার প্রাণীদের ওভাবে টিকে থাকার রহস্যটা কী?'

'দু,খের কথা সঞ্জয়,একটা আগ্নেয়গিরির আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতে ওরা ধ্বংস হয়ে গেল। এমনকি আমাদের ক্যামেরার ছবিগুলো পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেল--নইলে আমাদের এই তথ্য পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজে এক দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি করত। প্রায় একশো বছর আগে ইংল্যান্ড থেকে 'চ্যালেঞ্জার' জাহাজে চড়ে বিজ্ঞানীর দল গভীর সমুদ্রের তলায় যে প্রাণের সাড়া আছে তার প্রমাণস্বরূপ নানা জাতের বিদঘুটে মাছ সংগ্রহ করেন। তার মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক বিশেষ কিছু ছিল না,যদিও যা তাঁরা এনেছিলেন মানুষের চোখে তা অতি অদ্ভুত ঠেকেছিল। অর্থাৎ, সেগুলো পরিচিত চৌহদ্দির কিছুই নয়।

'আমার মনে হয়,সমুদ্রের গভীরে প্রাণীদের বসবাস সময়ের হিসেবে অপেক্ষাকৃত আধুনিক। অগভীর জলে যাদের জন্ম,সমুদ্রের তলায় খাপ খাইয়ে নেওয়া তাদের পক্ষে কঠিন। শীতল অন্ধকার

আবর্তে অত গভীর চাপে প্রাণী বাঁচে কী করে? অবশ্য আস্তে আস্তে সইয়ে নিয়ে কিছু মাছ সমুদ্রের তলায় বাস করছে বটে, কিন্তু তাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।

'আবার এমন যদি হয় যে,সমুদ্রতলে অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত ও নিম্নচাপের একটা এলাকা অনেকদিন ধরে বজায় রয়ে গিয়েছে, যেসব সামুদ্রিক প্রাণী সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে তার সন্ধান পেয়েছিল তারা সেখানে গিয়ে বংশপরম্পরায় টিকে থাকতে পারে। ওই যে ডুবন্ত আগ্নেয়গিরির মধ্যে আমরা ঢুকেছিলাম,ওই এলাকাটা এমনই একটা জায়গা। তবে আমরা বাইরে থেকে বুঝতে পারিনি যে,ওর সমস্ত অংশ এখনও সম্পূর্ণ মৃত নয়। অথবা এমনও হতে পারে যে,আমরা সমুদ্রতলে এক বিরাট ভূমিকম্পের মধ্যে পড়েছিলাম।'

'স্যার,ওখানকার জল কী করে অত গরম হল--সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস?'

'জানো তো,সমুদ্র এক অতিকায় ইঞ্জিনের মতো। নিরক্ষরেখার কাছ থেকে গরম জল আভ্যন্তরীণ স্রোতে চলে আসছে উত্তর মেরুর দিকে। তারই জায়গা ছেড়ে দিতে উত্তরের ঠান্ডা জল তলা থেকে ওপরে উঠে আসছে। তবে খুব সম্ভব ভূমিকম্পে পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে কিছু সুপারহিটেড জল এসে ওর সঙ্গে মিশেছে। তাই অত গরম হয়ে পড়েছিল।'

'এরকম জায়গা কি আরও থাকতে পারে,স্যার?'

'হয়তো খুব কমই আছে। সমুদ্রের গভীর অংশ সম্বন্ধে আমরা এত কম জানি যে,আছে কি নেই বলে দেবে কে!কোটি কোটি বছর আগে সমুদ্রের ওপরতলার যেসব বাসিন্দা ধ্বংস হয়ে গেছে তার সামান্য দু-একটি হয়তো এখনও সমুদ্রের নিচে টিকে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।'

আমাদের গল্পের প্রবাহে হঠাৎ বাধা পড়ল। ডেস্ক ক্লার্ক এসে সুশোভনবাবুকে খবর দিল যে,আমেরিকার সঙ্গে টেলিফোনে সংযোগ করা গেছে। উনি উঠে গেলেন।

হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে আরব সাগরের ওপার থেকে। আমাদের কারও মুখে আর কোনও কথা নেই। প্রত্যেকেই যেন এই নির্জন বিশ্রামের মুহূর্তগুলো তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছি।

'গুড নিউজ,অমরেশ। ম্যাসাচুসেটস থেকে প্রফেসর হ্যাগস্ট্রম পরশুর মধ্যেই এসে পড়ছেন। ওঁরা শিলাকান্থ সম্বন্ধে ভীষণ উত্তেজিত।এখন ওটাকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। ওটা পরীক্ষা করে যেসব তথ্য আমরা পাব তার দাম অনেক।

...অনেক রাত হয়ে গেছে সঞ্জয়, তোমাকে তো আবার ভোরে উঠে প্লেন ধরতে হবে। অল দ্য ক্রেডিট গোজ টু য়ু--ইয়েস মাই বয়।'

সুশোভনবাবু, অমরেশ সবাই করমর্দন করে বিদায় নিল। আমি চিত্রার্পিতের মতো বসে রইলাম। আজ রাতে আর কি ঘুম আসবে?

ছবি : দীপংকর

গল্প

আমাদের পাড়া

যশোধরা রায়চৌধুরী

আমাদের পাড়ায় আমি ছাড়া সবাই পাগল।তাই বলে কি তারা মন্দ লোক নাকি? সকলেই দিব্যি মোটাসোটা, গোলগাল,হাসিখুশি। সকলেই সকলের সঙ্গে মিলেমিশে বন্ধুত্ব পাকিয়ে দিব্যি থাকে। এ'রকম পাড়া আমার বড্ড ভাল্লাগে।তাই না আমি এ পাড়া ছেড়ে কোথাও যাইনা। শুধু মাঝে মাঝে কাজে বেরোন ছাড়া...কিন্তু-- হুঁ হুঁ বাবা, সবটা বলে শেষে বিপদে পড়ি আর কি!

আমাদের পাড়ার সবাই পাগল। পুরনো পুরনো বাড়ি,তার পুরনো পুরনো বারান্দাগুলো সব রাস্তার দিকে ঝোলানো। সে বারান্দার রেলিংগুলো ছ্যাঁতলা পড়ে সবুজ হয়ে গেছে,আর বাড়ির ছাত থেকে বারান্দা অব্দি নেমে এসেছে সবুজ রং করা কাঠের ছাউনি। এখন হাড় জিরজিরে,কিন্তু তবু, আঁকাবাঁকা ছাউনিগুলোতে গাছ গজায়,ফুটো হয়ে জল পড়ে...আহা,আমার বড্ড ভাল লাগে।

আমাদের পাড়ার একনম্বর পাগল কুবলয়বাবু। সারাদিন নিজের বাড়ির একতলার রকে বসে থাকেন। রাস্তা দিয়ে যারা যায় তাদের ডেকে ডেকে টাইম জিজ্ঞাসা করেন। 'দাদা,কটা বাজে? দাদা,কটা বাজে? ও ভাইটি, কটা বাজে বলতে পারো?'

কেউ উত্তর দেয়, কেউ দেয়না। সবাই কাজে যাচ্ছে, হনহনিয়ে যাচ্ছে। কার অত সময় আছে? কুবলয়বাবুর হাতে অনেক সময়, তাই অন্যকে সময় জিজ্ঞেস করাটাই ওনার হবি। ওনার দিকে দেখলেই সেকথা বোঝা যায়, কারণ ওনার মস্ত বড় ভুঁড়ি, ভুঁড়িতে কয়েকগাছা চুল, ভুঁড়ির উপরে উঠে যাওয়া ফুটোফাটা গেঞ্জি। তবে যেটা বোঝা যায়না সচরাচর,সেটা হল এই যে উনি পুরো পাগল।

কাজের তাড়ায় অনেকেই ওনার প্রশ্ন এড়িয়ে যায়, চলার ঝোঁকে অনেকেই কথার উত্তর দেয়না। সেদিন শুধু একটা ছেলে ওনার প্রশ্ন শুনে দাঁড়িয়ে গেল। কটা বাজে ভাই? বেশ মোলায়েম গদগদ স্বরে বলেছিলেন ভদ্রলোক। শুনেই,নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে

কিছু বলতে গিয়েও, একটা কেমন খটকা লেগে দাঁড়িয়ে গেল ছেলেটা। বড় বড় দাঁত বার করে হেসে বলল, 'কেন বলুন তো? আপনার কি বাড়িতে ঘড়ি নেই?'

কুবলয়বাবু প্রশ্ন করতেই অভ্যস্ত, প্রশ্ন শুনতে না। একটু থতমত খেয়ে গেলেন। থেমে থাকলেন ঘাড়টা বাঁকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ,আচে তো।' ছেলেটা বলল, 'তবে? তবে যে টাইম জানতে চাইছেন?'

এবার খেই পেয়ে চোখ গোল করে বললেন কুবলয়বাবু, 'থাকলেই বা! আহা! ইচ্ছে হয়না মানুষের? তাছাড়া, আমার বাড়ির ঘড়ির সঙ্গে তোমার ঘড়ির টাইমটা মিলিয়ে দেখে নিতে হবে না,কোনটা ফাস্ট, কোনটা স্লো?'

বা:,আজ তো বুদ্ধি খুলেছে কুবলয়বাবুর। শক্ত প্যাঁচে ফেলে দিয়েছিল ছেলেটা, তা থেকে উদ্ধার পেয়েছেন ভালোই! ছেলেটা তাও দমল না, খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে বলল, 'আচ্ছা বেশ,আমার ঘড়িতে বেজেছে দশটা পাঁচ। আপনার?'

রকের উপর হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে বসেই ঘরের দরজার দিকে চোখ রেখে পর্দার ফাঁক দিয়ে ঠাকুর্দার আমলের বড় দেওয়াল ঘড়িটা একবার দেখে নিলেন কুবলয়বাবু। তারপর বললেন, 'উ:হু! মিললনা। আমার ঘড়িতে দশটা দশ। হল না,হল না,কী মজা কী মজা।'

আনন্দে কুবলয়বাবুর ভুঁড়ি নাচতে লাগল। ভুঁড়ির ওপরের একগোছা চুলও।

দেখেশুনে ছেলেটা তাজজব। হাসি বন্ধ হয়ে গেল তার। বুঝল, ঘোর বিপদ। দেখতে শান্তশিষ্ট হলে কি হবে, এই ভদ্রলোক একেবারে বদ্ধ পাগল। সে এনার হাত থেকে মুক্তি পেতে চটপট এপাশ ওপাশ ঘাড় ঘোরাল। অন্য কাউকে পেলে তার ঘড়িতে কটা বাজে দেখে নিয়ে, তাকে কুবলয়বাবুর হাতে গছিয়ে দিয়ে সুট করে কেটে পড়ার তালে ছিল। কিন্তু এ মুহূর্তে কেউই আসছে রাস্তা দিয়ে। কী করা যায়? কুবলয়বাবু ততক্ষণে হাসি থানিয়ে চোখের জল মুছলেন। মুশকিল,হাসলেই আবার ওনার চোখে জল এসে যায়। একটু চোখ মুছে নিয়ে উনি ছেলেটাকে বললেন, 'হ্যাঁ ভাই, কে ঘড়ি ঠিক করবে? তুমি, না আমি?'

'আপনি করুন মশাই, আমার কাজ আছে,' তড়িঘড়ি যেতে চাইল ছেলেটি।

'কেন আমি করব কেন শুনি? তুমি এই সেদিনের ছোকরা, তোমার ঘড়িও তো এই সেদিনের, আমার ঘড়ি সেই নাইনটিন টোয়েন্টির। বলে কিনা আমার দাদু এই ঘড়ি কিনে কাঁধে করে আসতে গিয়ে গোরা সাহেবের পাল্লায়...'

কথা শুনতে শুনতে ছেলেটা দেখল এক অফিস বাবু আসছেন, বাঁহাতের কব্জিতে বড় একটা চৌকোমত রিস্ট ওয়াচ। 'ও দাদা শুনছেন,' বলে ওনাকে দাঁড় করাল ছেলেটি, 'আপনার ঘড়িতে কটা বাজে একটু বলুন না,' বলে কথা বলতে বলতেই ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে একেবারে হাওয়া হয়ে গেল। নতুন লোকটি ঘড়ি দেখে বলল, 'আমার ঘড়িতে দশটা পনেরো, আমার আবার আজকে একটা মিটিং...'

কথা শেষ হবার আগেই কুবলয়বাবু আর একবার পর্দার ফাঁক দিয়ে টাইম দেখলেন, এতক্ষণে সে ঘড়িতেও দশটা পনেরো। 'ইউরেকা!' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন কুবলয়, আর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে রক থেকে নেমে ভদ্রলোককে জড়িয়ে ধরে সে কি নাচ! অফিসবাবু তো হতবাক! তিনি কী করে জানবেন, এই প্রথম কুবলয়বাবুর টাইম মিলে গেছে, তাও আবার ঠিক ঠিক সোয়া দশটায়। টানতে টানতে কুবলয় ভদ্রলোককে নিয়ে গেলেন মোড়ের দোকানে, সিঙাড়া খাওয়াতে। বহুদিন ধরে সকাল সোয়া দশটায়

সিঙাড়া খাওয়ার কথা ভাবছেন কুবলয়, প্রথমবার যার ঘড়ির সঙ্গে নিজের ঘড়ি মিলবে তাকে নিয়ে। কিছুতেই মেলে না।

ভাগ্যিস তখন হরবিলাসী পিসিমার বাড়ির বারান্দায় বসে পিসিমা প্রথম উলের গোলাটা বালতির জলে চুবিয়ে সেটা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে চারদিকে একটু জলছড়া মত করে নিচ্ছিলেন। সেজন্যেই অফিসবাবু বেঁচে গেলেন। সে যাত্রায় মিটিং অ্যাটেন্ড করতে পারলেন। এক শালপাতা ভর্তি সিঙাড়ার ওপরে বলে হরবিলাসীর জলছড়া। কোন মানে হয়? ছ্যাড়াত করে জলটা এসে পড়তেই কুবলয় তাকালেন ওপরপানে, এক মুখ বিরক্তি নিয়ে। আর অমনি দেখলেন পিসিমাটিকে। সেই যে ঝগড়া লাগল, ফাঁক গলে অফিসবাবু চৌপাট হলেন।কিন্তু পিসিমার কি দোষ কিছু আছে? গরমের দিনে উল বুনতে বড্ড গরম লাগে যে, যে জন্যে পিসি রোজ উলটা ভিজিয়ে নিয়ে বোনেন, দরকার মত ভেজা উল দিয়ে মাথা-কপাল মুছেও নেন। আসলে উল না বুনে তো আর উনি পারবেন না, ওটাই একমাত্র ওনার ভালোবাসার জিনিস। সেই কবে থেকে বুনছেন।

বলেছিলাম না, আমাদের পাড়ার সবাই পাগল। পাশের বাড়ির সৈকত হাজরা সারাদিন অঙ্ক কষেন, কানে একটা, পকেটে একটা হাতে একটা কলম থাকা সত্ত্বেও সারাক্ষণ কলম,কলম করে অস্থির।আবার আমাদের কোণাকুণি বাড়িটার ওই সুরজিত রায় পা চুলকোতে চুলকোতে বিছানা মশারি সব চুলকোন, শেষমেশ রাস্তায় বেরিয়ে ল্যামপপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে ল্যামপপোস্টও চুলকোতে গিয়ে একদিন একটা ইলেকট্রিক তারে টান পড়ে কী শক কী শক খেলেন! এই পাড়ায় আমি, মানে অনন্ত পাল ছাড়া, আর সবাই পাগল।

অবশ্য কেউ বলতে পারে যে, যে লোক সারাদিন বাড়ির থেকে বেরোয় না, পড়ে পড়ে ঘুমোয়, রাত্তিরে কালো জামা পরে ইতিউতি চাইতে চাইতে ফাঁকা বাসে উঠে পড়ে, আর যার বাড়িতে বউ বাচ্চা মাসি পিসি নেই, রান্নার ঘর, হাতা খুন্তি কিচ্ছু নেই সে আবার কেমন স্বাভাবিক মানুষ! সেও একরমের পাগলই। কিন্তু আমি তাতে কিচ্ছু মনে করিনা। সকালে মোড়ের দোকানটায় এক পেট কচুরি আলুর

তরকারি জিলিপি জিবেগজা সাঁটাই, সারাদিন মানুষের মুখ দেখিনা, শুধু পাগলগুলোর কান্ড মাঝে মাঝে নিজের ঘরের জানালা দিয়ে লক্ষ্য রাখি। এতে আমার সুবিধেই হয়েছে।

আমি হলাম গে চোর, এক নম্বরের পাকা চোর। আগে বেলুনের গায়ে কাপড় সেঁটে ব্লেড দিয়ে কাটা প্র্যাকটিস করতাম, এই করে করে প্রচুর বেলুন ফাটিয়েছিলাম, ফট ফট দুম দাম আওয়াজে পাশের বাড়ির লোক ঘুমুতে পারত না বলে কর্পোরেশনে কমপ্লেন দিল।তখন গাঁটকাটা হবার আশা ত্যাগ করে রাত বিরেতে চুরি করতে বেরোলাম। সে কাজে খুব সাফল্য পেইচি। আমার গায়ের রং-টা আলকাতরা-কালো হওয়াতে একটু বিশেষ সুবিধে আছে। তার ওপরে কালো জামা কালো প্যান্ট কালো রুমাল।

তবে পাগলদের পাড়ায় অবশ্য আমি চুরি করিনি কখনো, কী থেকে কী হয়ে যায় বলা তো যায়না। আমি চুরি করেছি বেপাড়ায়, বাসে চেপে খেটেখুটে অনেক দূরে দূরে গিয়েই। একবার চুরি করতে বনহুগলীর দিকে একটা হ্যাচারিতে গিয়ে অবিশ্যি মুরগি পালন করাটা বেশ ভাল লেগে গেছিল। ভেবেছিলাম চাকরি পালটাব। কয়েকটা ছোট্ট ছোট্ট মুরগির ছানা চুরি করে এনেও ছিলাম বাড়িতেই মুরগি পালন করব বলে, কিন্তু পথেই ওগুলো এদিক ওদিক পালিয়ে গেল। সেইজন্য আর হল না। একবার বিখ্যাত এক বড়লোকের বাড়ির মিউজিয়ামে গিয়ে দারুণ দারুণ সব জিনিস চুরি করেছিলাম, বাজারে সেগুলো বিক্রি করে মোটা টাকাও পেয়েছিলাম, কিন্তু শেষমেশ পরেরদিন আবার সে মিউজিয়ামে ফিরে গেলাম ওদের একটা বড়সড় সাইজের ট্রেনগাড়ি দম দিয়ে চালিয়ে দেখব বলে। ওটা তো এতোবড়, সাহেবদের তৈরি, সারাঘর জুড়ে পাতা গোল লাইনের উপর চলা কু ঝিক ঝিক ইঞ্জিন, বড্ড লোভের। অত বড় জিনিস, চুরি তো আর করা যায়না! তো সেটার টানেই গেলাম, গিয়ে চালাতে বসলাম যেই, খটরমটর আওয়াজে রাত্তিরবেলা লোকজন ছুটে এল, আগের দিনই অমন বড় চুরি হয়ে গেছে বাড়িতে, দরজাগুলোতে পাহারাও বেশিই ছিল।নেহাত পুরনো জমিদারবাড়ির জানালাগুলোকে দরজার মত বড় বড় বানিয়েছিল বলেই আমি বেঁচে গেলাম, একটা জানালা দিয়ে বেরিয়ে সোজা বড়োরাস্তায় এসে হাঁপাতে হাঁপাতে আর বাঁচি না।

যাকগে, সেসব বেপাড়ার কথা। আমার ওসবে ঘেন্না এসে গেল শেষে, ভাবলাম হোক পাগল, হোক ছাগল, আমি এদিকেই দেখি, পাড়াতেই কিছু করা যায় নাকি। ভেবে ভেবে বারও করে ফেললাম কয়েকটা চুরি করার জিনিস। এক, কুবলয়বাবুর ওই গ্রান্ডফাদার ক্লকটা। ওটা তো দিব্যি চুরি করা যায়। দুই, হরবিলাসী পিসিমার বাড়িতে ঢুকলে নিশ্চয় অনেক উলের জামা পাওয়া যাবে। সেগুলো চুরি করে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ভুটিয়াদের দোকানে বেচে দিলেই হবে। তাছাড়া সৈকত মাস্টারের একগোছা পেন, তার মধ্যে কয়েকটার নিব তো সোনার হবেই, যা পুরনো! ঐ দিয়ে উনি সারাদিন অঙ্ক করেন। আর সুরজিতবাবুর একটা হাতির দাঁতের, একটা মোষের শিং-এর, একটা পেতলের আর একটা দামি আবলুশকাঠের পিঠচুলকুনি আছে জানি।হাতের মতন আকৃতি। ওগুলোকে নিয়ে যাব পার্ক স্ট্রিটের অ্যান্টিকের দোকানে। কেমন হবে?

যেমন ভাবা, তেমন কাজ। প্রথমেই কুবলয়বাবুর বাড়ির প্ল্যানটা বানিয়ে ফেললাম, কারণ একতলা বাড়ি। অর্ধেকদিন রাতে দরজা বন্ধ করতেও ভুলে যায় জানি, কারণ ওদের বাড়ির ভুলো কুকুরটা প্রায়ই বেরিয়ে এদিক ওদিকে ঘুরে বেড়ায় সেই সাত সক্কাল বেলায়।আমি মাঝে মাঝে জিলিপি খেতে দিই, কুঁ কুঁ করে লেজ নাড়ে।

রাত বারোটার সময় ওর গ্র্যান্ডফাদার ক্লকের ঘন্টিতে ঢং ঢং বারোটা বাজল, আমিও কালো শার্ট কালো প্যান্ট পরে তৈরি। আমার নাম অনন্ত পাল। সোজা কথা নাকি? সাড়ে বারোটা নাগাদ পা

টিপে টিপে গেলাম ওদের দরজার সামনে।ঘরের ভেতর থেকে ঘোঁ ঘোঁ ঘোঁওয়াও আওয়াজ আসছে নাক ডেকে ঘুমনোর। বুড়ো কুবলয়বাবুর সাইনাস আছে নির্ঘাত। দরজাটা আস্তে ঠেললাম। ক্যাঁ-অ্যাঁ-চ। কুবলয়বাবুর নাক ডাকার শব্দের তালে এমন ভাবে আওয়াজটা পড়ল, যে কস্মিনকালে কেউ টের পাবে না কোন শব্দটা কিসের...।

ঢুকেই দেখলাম, সোজা সামনের দেওয়ালের ওপরেই মস্ত ক্লকটা দাঁড়িয়ে।সরু লম্বা মানুষসমান ক্লকটাকে হাতাতে পারব তো? মনে হচ্ছে ভারি হবে। শুধু পেতলের পেন্ডুলামটা নিয়ে যেতে পারলেই হত। তাছাড়া আগে ভেবে দেখিনি, এটাকে হাতিয়ে ত নিজের বাড়িতে রাখতে পারব না। ঢং ঢং আওয়াজে তো সবাই বুঝতে পেরে যাবে আমিই চুরি করেছি জিনিসটা। তাহলে উপায়? ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়েই, চাঁদের আলোয় জিনিসটা চোখে পড়ে গেল।

খাটের উপরে হাঁ করে ঘুমোচ্ছেন কুবলয়বাবু। আর তাঁর পাশে একটা ছোট্ট টেবিলের ওপরে রাখা রয়েছে জিনিসটা। জানালা দিয়ে এসে পড়া চাঁদের আলোয় একেবারে চকচক করছে। একটা সোনার কলমদানি, তার ভেতরে একটা সোনার কলম। এক্কেবারে নতুন। ব্যাপার কী! কুবলয়বাবুর আবার ঘড়ি ছেড়ে কলমের শখ চাপল নাকি? কী আশ্চয্য ! চট করে পকেটে পুরলাম জিনিসদুটো। আর কিছু চকচক করছে কিনা দেখতে যাব, এমনসময় দেখি পায়ের তলায় কি একটা জিনিস নড়েচড়ে উঠল। হায় ভগবান, তাকিয়ে দেখি ওই ভুলো কুকুরটা ন্যাতা হয়ে শুয়ে আছে পা পেট ছড়িয়ে, আমি ওটাকে পাপোশ ভেবে ওর উপরেই পা রেখেছি!কী সব্বনাশ, কুকুরটা সুড়সুড়ি লেগে আরামে নড়েচড়ে

উঠল বলে বাঁচোয়া, বেশি চেপে দিলে জেগে উঠে চেঁচিয়ে মেচিয়ে তো আমার দফা গয়া করে দিত। অবশ্য আমার গন্ধ ওর অচেনা নয়, আমার হাত থেকে জিবেগজা খেয়েছে আজ সকালেই।

খুব একচোট বেঁচে গেছি, ভেবে পালালাম।পরদিন দিনের আলোয় দেখি জিনিসটা বেড়ে। দিব্যি ঝেড়েছি যাহোক। সোনা নয় অবিশ্যি, গিল্টি করা, আর পেন দানির পরীটা কেমন হোঁৎ কা প্যাটার্নের। এটা বিক্কিরি করে লাভ হবে না, নিজের টেবিলেই রেখে দিলাম। পরদিন হরবিলাসী পিসিমার বাড়ি চুরি করতে গিয়ে আবার সোয়েটার, মাফলার কোনটা কি কিছুই অন্ধকারে খুঁজে না পেয়ে একটা রূপোর ঘড়া তুলে আনলাম। পরদিন দেখলাম সেটা চমৎ কার রূপোলী রং করা একটা গাড়ু, এখন ওইটে দিয়েই আমার জল তোলার কাজ চলেছে। খবর নিয়ে জেনেছি হরবিলাসী পিসির একটি বদ অভ্যেস হচ্ছে উল বুনে আবার খুলে ফেলে আবার বোনা। তাই ওনার বাড়িতে নাকি একটিও আস্ত সোয়েটার, বা আস্ত মাফলার পাওয়া যাবে না। সেই যে উনিশশো সাতচল্লিশ সালে এক দেড় খানা উলের গোলা নিয়ে শুরু করে ছিলেন সেগুলোই এখনো চলছে পিসিমার। সে সময়ে গোলাটা ছিলে হালকা গোলাপি রঙের। তফাৎ এই যে খুলতে খলতে আর বুনতে বুনতে রংটা হয়ে গেছে গাঢ় বাদামি।

সৈকত মাস্টারের বাড়ি গিয়েও আমি কলম খুঁজে পাইনি, তবে একটি দারুণ টেবিল ঘড়ি পেয়েছিলাম, যেটা বেচে সাড়ে পঁয়ত্রিশ টাকা পাওয়া গেল। সৈকত মাস্টারের অংকরোগ ধীরে ধীরে ঘড়িরোগে রূপান্তরিত হচ্ছে, কুবলয়বাবুর ঘড়িরোগ যেমন কলম রোগের দিকে যাচ্ছে। একজন আর একজনের উল্টোদিকের বাড়িতে থেকে সারাক্ষণ এ-ওকে দেখার ফল বোধ হয়।

বাকি রইল সুরজিত বাবুর পিঠচুলকোনোর সেট। ওইটা চুরি করতে গিয়েই আমার বিপদ ঘনিয়ে এল। সে কথা আর না বলাই ভাল।কিন্তু গল্পটা শেষ করতে হলে ওটা বলতেই হবে।

আমার প্রথম ভুল ছিল অমাবস্যার রাতে ও বাড়িতে ঢোকা। বাড়িটাকে চুলকে চুলকে কিছুই রাখেননি, চুনগুলো খসে ইঁট বেরিয়ে গেছে। সুতরাং অন্ধকার দেওয়ালে অন্ধকার আমি অমাবস্যার অন্ধকারে পথ হারালাম। নিজের হাত পা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সুতরাং আর ফিরতেই পারিনা। দরজা জানালা কিছুই আলাদা করতে পারিনা। পরদিন সকালে বুঝলাম, ওনার বাড়িটাই একটা ভুলভুলাইয়া। সেখানে একবার ঢোকার পর আর বেরোন যায় না। মানে, প্রায় যায়ই না বলা চলে। আমার ধারনা ওনারা কোনদিনই নিজেদের বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন ভেবে বেরোতে পারেননি। শোবার ঘরে যাবেন ভেবে মাঝে মাঝে রাস্তায় গিয়ে পাশের বাড়ির দেওয়ালে চুলকিয়ে আসেন। দুর্ঘটনাক্রমে কখনো সখনো বাথরুম যাবেন ভেবে বাজারে চলে গিয়ে দুটো রুই মাছ কিনে আনেন।

তিনদিন আমি পথ খুঁজে না পেয়ে সুরজিত বাবুর বাড়ির ছাতে ওঠার সিঁড়ি আর চিলেকোঠার ঘর এই দুইয়ের মাঝামাঝি একটা ছোট্ট ঘরে বসে রইলাম। সারাদিন লুকিয়ে বা ঘুমিয়ে থাকলাম, আর রাত্তিরবেলা বাইরে বেরনোর রাস্তা খুঁজতে বেরোলাম।

প্রথম রাতেই একটা ব্যাপার ঘটে গেল। পথ হারিয়ে শুধু গন্ধে গন্ধে আমি রান্নাঘরে পৌঁছে গেলাম। তাকের ওপর চাপা দিয়ে রাখা এক বাটি ছানার ডালনার খোঁজ পেয়ে গেলাম।আহা, কী তার স্বাদ! আমার বাড়িতে তো আবার রাঁধাবাড়ার পাট নেই। এমন ঘরে বানান সুখাদ্য তো ভাবাই যায়না। তার পরের দিন রাতে পেঁপের তরকারি। তার পরদিন কাঁচকলার কোপ্তা। সেদিন ভেটকি মাছের মুড়োর তরকারি খেয়েই রাতটা কাটিয়ে দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু ঘুমোতে গিয়ে দেখি সেই কোনাঘুপচিগুলো সব পালটে গেছে। আরে, আমি কোথায়?

অন্ধকারে চোখ বড় বড় করে দেখি, আমি আবার আমাদের পাড়ার ঠিক মাঝমধ্যিখানে, কুবলয়বাবুদের পাশের বাড়ির রকে বসে আছি। ভোর হব হব করছে, এই তো গলা খাঁকারি দিয়ে কুবলয়বাবু বেরিয়ে এল। এই তো, এক গেলাস জল কুলকুচি করে পুচ করে ফেলল রাস্তায়। আর ভুলোটাও ওমনি বেরিয়ে এসে আমার পায়ের কাছে বসে টিকটিক করে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

খানিক পরেই হঠাত আমার মাথায় পড়ল ছিড়িক ছিড়িক জলছড়া। বারন্দায় বসে গেছে হরবিলাসী পিসিমা। উল বোনা চালু। খর জষ্টি মাসের তাপ মাথার উপর চড়ছে। আমার মাথা বিজবিজ করছে। আমার নিজের বাড়িটা কোথায়? খুঁজেই পাচ্ছি না। ওই ডানদিকের সবুজ রেলিং-টা তো অংকবিদ সৈকতমাস্টারের। উনি এখন মস্ত একটা হাতঘড়িতে দম দিচ্ছেন। তার পাশের বাড়িতে...

উফ, মাথা ঘুরছে। এখনো আমি ঠিক জানি না, কিন্তু এরপর থেকে আমি বোধহয় আর নিজের বাড়ির রাস্তা খুঁজেই পাবনা। অথবা, এই তো, এই তো, আমার সামনে একটা জানালা, আমি বোধ হয় আমার নিজের বাড়িতে? নাকি এখনো সুরজিতবাবুর বাড়ির চিলেকোঠার ঘরেই? নিজের বাড়িই যদি হবে, তাহলে চারদিকে এত ঘড়ি কেন? কিন্তু ঘড়ি তো থাকার কথা কুবলয়বাবুর ঘরে... না না, সৈকতমাস্টারের ঘরে...

বলেছিলাম না, পাগলদের পাড়ায় চুরি করায় বিপদ আছে! আগেই আমার এটা একবার মনে হয়েছিল, কী থেকে কী হয়ে যায় বলা তো যায়না!

যে জিনিসটা কখনো ঘুণাক্ষরেও জানতাম না, সেইটে হল, বেরোলেই নাক আমাকে টেনে নিয়ে যাবে ভাল ভাল খাবারের কাছে। আমার আর একটা ধারণা, সত্যিই মনে হয়। এত ভাল ভাল খাবার ভরা রান্নাঘর পাই কি করে একটু হাঁটলেই, রাত্তিরে, গন্ধে গন্ধে?

ছবি : সৌভিক

গল্প

মিলামের খেলাঘর

রাজকুমার রায়চৌধুরী

(১)

মিলাম পুজোর ছুটিতে বাবা মা আর বাবার এক বন্ধুর পরিবারের সঙ্গে কেরালা বেড়াতে গিয়েছিল।সকাল বেলায় প্লেনে করে চেন্নাই, চেন্নাই থেকে ট্রেনে কোচি। তারপর কেরালার বিভিন্ন জায়গা ঘুরে লাক্ষাদ্বীপ। এই ছিল ট্যুর প্রোগ্রাম।

সকাল আটটায় চেন্নাইএর প্লেন, তাই মিলামরা ভোর পাঁচটায় বাড়ি থেকে রওনা হয়েছিল। মিলামরা থাকে টালিগঞ্জে।বাড়ির সামনে কয়েকটা খাবারের দোকান। খুব সকালে দোকানগুলো খোলে। অনেক লোক ওখানে খায়। তারপর, হয়ত তারা সারাদিন দোকানেটোকানে কাজ করে, তারপর আবার সন্ধেবেলায় তাদের খাবার সময় হয়।

বাড়ি থেকে বেড়িয়েই মিলাম দেখতে পেল ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডের কাছে একটা দোকানে উনুন ধরানো হচ্ছে। এখনো ওরা কয়লার উনুন ব্যবহার করে। একটা সাত-আট বছর বয়সের মেয়ে উনুন ধরাচ্ছে। ওকে সাহায্য করছে একটি ছোট্ট ছেলে,বয়স হয়ত বড়্জোর পাঁচ-ছয় হবে।

মিলাম কলকাতার ছেলে। শিশু ভিখারি দেখেছে, শিশু শ্রমিক দেখেছে চায়ের দোকানে। ওখানে বারো-চোদ্দ বয়সের ছেলেরা বয়ের কাজ করে।কিন্তু এত ছোটো ছেলেমেয়েদের দোকানে কাজ করতে ও দেখেনি,তাও এত ভোরে!

মেয়েটির পরণে একটা বিবর্ণ ফ্রক, ছেলেটির পরণে একটা বারমুডা। মোটা সাইজ, বেশ বড়। হয়ত ফেলে দেওয়া কাপড়।খালি গা।

মিলাম বাবাকে জিজ্ঞাসা করল,'এত ছোট বয়সে ওরা কাজ করে, স্কুলে যায়না?'বাবা বললেন,'যাবার তো কথা, কিন্তু এরকম অনেক ছেলেমেয়ে আছে যারা দোকানে,বাজারে, এমনকি কারখানায় বিপজ্জনক কাজ করে।এদের বাবা-মারা এত গরিব যে স্কুলে পাঠানো দূরের কথা দুবেলা ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে পারেনা, তাই খুব ছোট বয়সে কাজ করতে পাঠায়।তবে এত বাচ্চা ছেলেকে কাজ করতে আমিও দেখিনি।' মিলাম বলল,' বাবা আমি কিন্তু সেদিন টি-ভিতে দেখছিলাম চোদ্দ বছরের নীচে ছেলেমেয়েদের শ্রমিক হিসেবে কাজ করানো অন্যায়।'বাবা বললেন,'ঠিক, কিন্তু ওদের বাবা-মার কাছে ফেরৎ পাঠালে তারা আবার অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেবে। অনেকে আবার ছেলেমেয়ে বিক্রিও করে দেয়।'

'এদের বাবা মারা এদের খেতেই দিতে পারেনা, স্কুলে পাঠাবে কী করে?' বাবার এই কথাটা মিলামের মনে একটা ধাক্কা দিল। বাবা যাই বলুন মিলামের খুব খারাপ লাগল। ও একটা বইতে পড়েছে এই সব বাচ্চারা দিনে প্রায় বারো-চো ঘন্টা অমানুষিক পরিশ্রম করে কোন রকমে দুবেলা খেতে পায়। কিন্তু ওই বাচ্চা ছেলেটার তো এখন খেলাধুলা করার কথা। কিন্তু খাবারই জোটেনা তো খেলনা দেবে কে?

মিলাম বাবাকে সব কথা বলতে পারলনা।

মিলামের বাবা খুব ভাল ছাত্র ছিলেন। আই আই টি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে কমপিউটার সায়েন্সে মাস্টার ডিগ্রি করেন আমেরিকার এক নামকরা ইউনিভার্সিটি থেকে।এখন একটা খুব বড় প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। মিলাম এসব মার কাছে শুনেছে।কোম্পানি থেকে গাড়ি ও দামি ফ্ল্যাট কেনার লোন দিয়েছে বিনা সুদে। মিলামের ঠাকুর্দা খুব বড়লোক ছিলেন না। কিন্তু দুই ছেলেমেয়ের পড়াশুনার ব্যাপারে কোন কার্পণ্য করেননি।

(২)

সমস্ত কেরালা ট্যুর মিলাম খুব ভাল উপভোগ করতে পারলনা। মিলাম ক্লাস এইটে পড়ে। সামনের মাসে নাইনে উঠবে। ভাল ছাত্র বলে স্কুলে সুনাম আছে। কিন্তু সমস্ত কেরালা ট্যুরে ঐ বাচ্চা ছেলে আর মেয়েটার ছবি মিলামের গলায় কাঁটা বেঁধার মতনই খচ্-খচ্ করতে লাগল। এমনকি লাক্ষাদ্বীপের মত সুন্দর জায়গাও মিলাম প্রাণভরে উপভোগ করতে পারলনা। মিলামের বাবা এটা লক্ষ্য না করলেও ওর মা এটা আঁচ করতে পেরেছিলেন যে ছেলে কিছু একটা ব্যাপারে অসুখী। মিলাম মার কাছে কিছু গোপন রাখেনা। কিন্তু এ ব্যাপারে খুব খোলসা করে কিছু বলল না।ও ঠিক করল কোলকাতায় ফিরে গিয়ে মার সাথে এ বিষয়ে কথা বলবে।

(৩)

কোলকাতায় ফেরার পরদিনই মা ওকে চেপে ধরেন,'তোর কী হয়েছে বল তো? এমন সুন্দর জায়গা কেরালা, সেখানে গিয়ে কেবল ছটফট করছিলি। শরীর খারাপ লাগছিল?'

মিলাম এরপর মাকে সব কথা খুলে বলল। মা বললেন,'কী করবি বল? হতভাগা দেশ। এইসব ছেলেমেয়েগুলো খেতেই পায়না ভাল করে, পড়াশুনা তো দূরের কথা। শুনেছি আমাদের দেশে একজন ব্যবসায়ী চার হাজার কোটি টাকায় একটা প্রাসাদ বানিয়েছেন। ঐ টাকায় এরকম দশলক্ষ ছেলেমেয়ের লেখাপড়া, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হতে পারত।

'কিন্তু মা, ঐ-টুকু বাচ্চাছেলে খেলবে না? আমার তো কত খেলনা আছে। ওর তো একটাও নেই। আমি ওকে কয়েকটা খেলনা দেব।'

মিলামের কথা শুনে মার চোখ ছলছল করে উঠল, 'মিলাম তুই সত্যিই খুব ভাল রে। মনে রাখবি তোরা কত সুযোগ সুবিধা পেয়েছিস। ওরা ওর এক শতাংশ পেলেও বর্তে যাবে।'

মায়ের কথা শুনে মাকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ কাঁদল মিলাম। তারপর চোখের জল মুছে নিজের ঘর থেকে একটা স্যুটকেস এনে কয়েকটা খেলনা বার করল। আগে তো স্যুটকেস ভর্তি খেলনা ছিল। কয়েকদিন আগে ওর মাসতুতো ভাই বেশ কিছু খেলনা নিয়ে গেছে।

(৪)

কোলকাতায় ফেরার দুদিন পরেই খুব সকালে মিলাম ওই খাবারের দোকানটার কাছে গিয়ে

দেখে মেয়েটা উনুন ধরাচ্ছে আর ছেলেটা একটা কাঠের টুকরোতে দড়ি বেঁধে টানাটানি করছে। ছেলেটা নিজেই একটা খেলনা আবিষ্কার করেছে। মিলাম বাড়ি থেকে কিছু খেলনা পকেটে নিয়ে এসেছিল। এরকম অজস্র খেলনা মিলামদের বাড়িতে বাক্সবন্দি আছে। খেলবার বাচ্চা নেই।

মিলাম পকেট থেকে দুটো খেলনার গাড়ি বার করে ছেলেটাকে বলল,'শোনো। তুমি এই দুটো গাড়ি নিয়ে খেলো।' ছেলেটা খেলনা দুটো হাতে নিয়ে দিদির দিকে তাকিয়ে রইল সম্মতির আশায়।

মেয়েটা বলল,'বাবু, ওকে খেলনা দিলে ও রাতদিন খেলবে, কাজ করবেনা। কাজ না করলে মালিক বড় বকবে বাবু।'

মিলাম বলল,'তুমিই দেখবে ও যাতে সবসময় না খেলে।' তারপর পকেট থেকে একটা পুতুল বার করে বলল,'জানি তোমার সময় নেই খেলার, তবু, এই পুতুলটা সামনে রেখে তুমি কাজ কোরো আর সময় পেলে খেলো।'

মিলাম আর দাঁড়াল না। ভয় পেয়ে যদি মেয়েটা সব খেলনা ফেরৎ দেয়! বাড়িতে এসে মিলাম প্রতিজ্ঞা করল ও বড় হয়ে বাচ্চাদের জন্য স্কুল বা অন্য কিছু করবে না। শুধু একটা খেলাঘর করে দেবে, যেখানে সমস্ত বাচ্চারা যাদের কোন খেলনা নেই, তারা এসে প্রাণ ভরে খেলতে পারে। পরে ওর এই প্ল্যান বলতে মা খুব খুশি ,'মিলাম, আমি ওর নাম দিলাম মিলামের খেলাঘর।'

মার কাছে শুনে মিলামের ববার চোখে জল এসে গেল।

ছবি: সোমা

যে ঘটনাটা আমি বলতে যাচ্ছি সেটা ঘটেছিল কানাডার একটা লেকের একটা নির্জন দ্বীপে। গরমকালে মন্ট্রিল আর টরন্টো থেকে লোকজন সেখানে প্রায়ই যেতো লেকের ঠান্ডা জলে চান করতে আর বিশ্রাম নিতে। দু:খের বিষয়, এই আশ্চর্য, আর বলতে গেলে অলৌকিক ঘটনাগুলো যে কারো কাছে যাচাই করব, তার কোনো উপায় নেই।

যাই হোক ঘটনাটা বলি।

আমরা যে ক'জন ছাত্র, প্রায় জনা কুড়ি, দল বেঁধে ওখানে গেছিলাম, তার মধ্যে সবাই মন্ট্রিলে ফিরে এসেছিল, শুধু একজনই থেকে গেছিল সেই দ্বীপে, সে হল আমি। আমি সেই বিজন দ্বীপে কিছুদিনের জন্য একা থেকে গেছিলাম, কারণ গ্রীষ্মের ছুটিতে আইন বিষয়টাকে আমি একবারে ছুঁয়েও দেখিনি, কাজেই মন দিয়ে পড়াটাকে ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য ওরকম একটা জায়গাই ছিল একদম ঠিক।

সময়টা ছিল সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি। লেকের জলের নীচ থেকে বড় বড় ট্রাউট মাছেরা উঠে আসছিল জলের ওপরে, কারণ উত্তরে হাওয়া আর ঝুরো বরফে জলের তাপমাত্রা কমে আসছিল। মেপল গাছের পাতায় লাল সোনালি রঙ ধরছিল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল হাহাকারের ধ্বনি তুলে, সে আওয়াজ গ্রীষ্মকালে এ এলাকায় অচেনা।

তবে কিনা, যখন একটা গোটা দ্বীপ কারো নিজস্ব হয়ে যায়, যেখানে থাকে একটা দোতলা কুটির, একটা ক্যানো, একমাত্র সঙ্গী একটা কাঠবেড়ালি, যেখানে সপ্তাহান্তে একটি মাত্র লোক আসে আমাকে বিরক্ত করতে ডিম আর রুটি নিয়ে তখন সেই পরিবেশ কতটা পড়ার উপযোগী থাকে সন্দেহ আছে। তবে সবকিছুই পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।

আমার বন্ধুরা চলে যাওয়ার আগে আমাকে পইপই করে বলে গেছিল সাবধানে থাকতে, বিশেষ করে রেড ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে, এবং বেশিদিন না থাকতে, কারণ শীত পড়তে আর বেশি দেরি

নেই, তখন তাপমাত্রা শূন্যের চল্লিশ ডিগ্রি নীচে নেমে যাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। এবং ওরা চলে যাওয়ার পরই আমি বুঝতে পারলাম, ফাঁকা জায়গা বলতে কী বোঝায়! ছ সাত মাইলের মধ্যে আর কোন দ্বীপ নেই। এবং ডাঙায় আমার পেছনে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত নিবিড় অরণ্য, যেখানে কোন মনুষ্য বসবাসের চিহ্ন নেই। এবং যে দ্বীপ গত দুমাস ধরে মানুষের হাসি আর কলরবে মুখরিত ছিল, সে দ্বীপে এখন আমি ছাড়া আর কেউ না থাকলেও তার পাথরে পাথরে ধ্বনিত হচ্ছিল সেই হাসি আর চিৎকার। আমি নিজেই পাথরের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াবার সময় সেইসব হাসি আর কথাবার্তা শুনতে পেতাম, এমনকি একাধিকবার আমার মনে হয়েছিল কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে।

কুটিরে পাইন কাঠ দিয়ে আলাদা ছ'টা ছোটো ছোটো শোওয়ার ঘর ছিল। প্রতিটি ঘরে ছিল একটা ছোটো খাট, একটা গদি, একটা চেয়ার। কিন্তু আয়না ছিল মাত্র দুটো যার একটা আবার ভাঙা। হাঁটলে তলার পাটাতনগুলো মচমচ করত এমনভাবে যে আমার পরিষ্কার মনে হতো এখানে আমি একা নই আরও কেউ হাঁটছে। একটা ঘরের দরজা ছিল শক্ত, একেবারে খুলত না, আর যখনই পাল্লাটা ঠেলতাম, মনে হতো যেন ভেতর থেকে হাতলটা কেউ ধরে রেখেছে, দরজাটা খুললেই দেখতে পাব একজন লোক স্থির চোখে চেয়ে আছে আমারই দিকে।

ভাল করে দেখে টেখে আমি শোওয়ার জন্য এমন একটা ঘর ঠিক করলাম, যেটাতে বারান্দার দিকটায় একটা ব্যালকনি আছে। ঘরটা খুবই ছোট, কিন্তু খাটটা বড়ো আর গদিটা চমৎকার। এ ঘরটা ছিল বসার ঘরের পাশেই, আর বসার ঘরেই আমি সারাক্ষণ থাকতাম এবং পড়তাম। ছোট্ট জানালা দিয়ে সকালের সূর্যটা দেখা যেত। দরজার সামনে থেকে একটা সরু পথ সোজা চলে গেছিল ডিঙি রাখার ঘাটে। এটুকু ফাঁকা জায়গা ছাড়া পুরো দ্বীপটা ঢাকা ছিল মেপল, সিডার আর হেমলক গাছের জঙ্গলে। গাছগুলো কুটির ঘিরে এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল যে সামান্যতম হাওয়াতেও গাছের ডাল আর পাতা কুটিরের চাল আর কাঠের দেওয়ালে ধাক্কা খেত। আওয়াজ তুলত বিচিত্র রকমের। সূর্য ডোবার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই চারদিক অন্ধকার হয়ে যেত। কি গাঢ় সেই অন্ধকার! মাত্র দশ গজ দূরে বসার ঘরে আলো জ্বলত, সে ঘরে চারটে জানলাও ছিল, কিন্তু সে আলোর জোর এতই কম ছিল যে নাকের ডগায় কী আছে সেটা পর্যন্ত দেখা যেত না। গাছে ধাক্কা না খেয়ে এক পা চলার উপায় ছিল না।

সে দিনের বাকি সময়টায় আমি আমার জিনিসপত্র তাঁবু থেকে ঘরে নিয়ে এলাম, ভাঁড়ার ঘরে খাবারদাবার মজুত করলাম আর প্রচুর কাঠ কাটলাম জ্বালানির জন্য, আগামি এক সপ্তাহ কাটাতে হবে তো! এ'সব করার পর, সূর্যাস্তের ঠিক আগে আমি ক্যানোটা নিয়ে দ্বীপের চারপাশটা বেশ কয়েকবার ঘুরে এলাম সাবধানতা অবলম্বনের জন্য। কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি এরকম করতে হবে, কিন্তু মানুষ কত কিছুই তো করে, যেটা সে আগে চিন্তা করে না।

আবার যখন আমি দ্বীপে ক্যানোটা ভেড়ালাম, কী নির্জন যে লাগল, বলে বোঝানো যাবে না। সূর্য পাটে বসেছে, আর এসব উত্তুরে জায়গার গোধূলি বলে কিছু হয় না, ঝপ করে একবারেই সন্ধ্যা নেমে আসে। ক্যানোটা ঠিকঠাকমতো রেখে সেই শুঁড়িপথ দিয়ে আমি উঠে এলাম বারান্দায়। সামনের ঘরে ছ'টা বাতি জালিয়ে দিলাম, কিন্তু রান্নাঘরে, যেখানে আমি খাওয়াদাওয়া করব, সেখানে ছায়ারা এত নিবিড় এবং আলো এত কম যে ছাদের কড়িবরগার ফাঁক দিয়ে তারা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল।

সে রাতে আমি তাড়াতাড়িই শুতে গেলাম। যদিও সে রাতের আবহাওয়া ছিল শান্ত, হাওয়া ছিল না একফোঁটাও, তবুও খাটের ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ আর বাইরে দূরে পাথরের ওপর বয়ে চলা জলস্রোতের কলকল ধ্বনি প্রবেশ করছিল আমার কানে। যতক্ষণ জেগে ছিলাম বাড়ির অদ্ভুত শূন্যতা

গ্রাস করছিল আমার মননকে। করিডোর আর ফাঁকা ঘরগুলোতে যেন অসংখ্য পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম, নড়াচড়ার আওয়াজ, মেয়েদের স্কার্টের খসখস শব্দ আর একটানা নিচুগ্রামের স্বর, যেন কারা ফিসফিস করে কথা কইছে। তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম আমি, সেইসব অদ্ভূত শ্বাসপ্রশ্বাস আর শব্দ মিশে গেল আমার স্বপ্নের মধ্যে।

এভাবেই কেটে গেল একটা সপ্তাহ। পড়াশোনা চলছিল ভালই। দশম দিনের মাথায় একটা ঘটনা ঘটল। রাত্তিরে দিব্যি ঘুমিয়েছিলাম, আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল। বিচ্ছিরি একটা অনুভূতি। ঘরের আবহাওয়াটা কেমন দমচাপা লাগছে। কিন্তু কিছুতেই এর কারণ খুঁজে পেলাম না। ঘরে কি কোন কিছু আছে যা আমাকে শঙ্কিত করে তুলেছে? যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক, বেশ কয়েকবার আমি কেঁপে উঠলাম, মনে হতে লাগল, এখনি এ ঘর থেকে কেটে পড়তে পারলে ভাল হয়। যতই ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলাম, ততই সেই মনে হওয়াটা এত জোরদার হতে লাগল যে শেষ অবধি জামাকাপড় পরে ঘর থেকে বেড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা রান্নাঘরে চলে গেলাম; যেন ভয়ংকর কোন সংক্রামক রোগির সান্নিধ্য থেকে মুক্তি পেলাম।

পরদিন ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে করতে ভাবতে লাগলাম গত কয়েকদিনে এমন কিছু ঘটেছে কিনা যাতে আমার এই অনুভূতি হয়। কিন্তু মনে পড়ল, আর একদিনের এক ঝড়ের রাতের অভিজ্ঞতার কথা, যখন আমি রাত্তিরে আচমকা জেগে উঠেছিলাম ঝড়ের দাপটে, কাঠের পাটাতনে এমন আওয়াজ হচ্ছিল মনে হচ্ছিল যেন বাইরের করিডোরে অনেক লোক জড়ো হয়েছে কিছু করার জন্য । সেদিন ধারনাটা এত তীব্র হয়েছিল যে আমি উঠে পড়েছিলাম। বন্দুক হাতে নিচে নেমে এসে দেখেছিলাম দরজা জানালাগুলো শক্ত করে আটকানো, মেঝের দখল নিয়েছে ইঁদুর আর কালো কালো গুবরে পোকারা। ভয় পাওয়ার মতো কিছু নয়।

সেদিন সারা সকালটা পড়লাম, একেবারে দুপুর পর্যন্ত, তারপর ভাবলাম এবার ওঠা যাক, খানিকটা সাঁতার কেটে খাওয়াটা সেরে নিই, কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার আবিষ্কার করলাম, ঘরে ঢুকতে আমার একইরকম অনীহা, সেই অনীহা বরং আরো বেড়েছে। একটা বই আনার জন্য ওপরে যাওয়ার দরকার ছিল, ওপরে গেলামও বটে কিন্তু কিছুতেই ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করছিল না, এবং ঘরে ঢুকেও আমি সারাক্ষণ সতর্ক হয়ে রইলাম যেন যে কোন মুহূর্তে কিছু একটা ঘটে যাবে। এর ফলে মনটা বেজায় গুমসে গেল। মনের সেই গুমোট ভাবটা কাটাবার জন্যই সারাটা বিকেল আমি লেকের জলে নৌকাবিহার করলাম এবং সূর্যাস্তের সময় খানছয়েক চমৎকার মাছ ধরে ঘরে ফিরলাম, যার কিছুটা রাত্তিরে খাওয়া যাবে, বাকিগুলো থাকবে ভাঁড়ারে।

পড়াশোনা মন দিয়ে করার জন্য ঘুমটা খুব দরকার। কিন্তু ওই ঘরে কিছুতেই থাকতে ইচ্ছে করছে না দেখে ভাবলাম তাহলে আমার শোওয়ার ব্যবস্থাটা নিয়ে নিচে চলে যাই। স্বীকার করছি আমার এরকম ভয় পাওয়ার কোন যুক্তি নেই, তবুও স্রেফ পরের দিনের পড়াটা মন দিয়ে করার জন্যই এ ব্যবস্থাটা করতে হলো। রাত্তিরের ঘুমটা মাটি হলে পরের দিনের পড়াটাও পণ্ড হবে, যেটা এ অবস্থায় একেবারেই কাম্য নয়।

কাজেকাজেই সেইমতো সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেললাম, খাটটা নামিয়ে আনলাম বসার ঘরের এক কোনায় দরজার মুখোমুখি। যখন কাজটা শেষ করে আগের ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম, একটা অদ্ভূত আনন্দ হলো। এবার থাক ওই ঘরটা তার যত ছায়া, নৈ:শব্দ আর ভয় নিয়ে।

আটটার ঘন্টা বেজে উঠল রান্নাঘরের ঘড়িতে। সামান্য কয়েকটা খাওয়ার বাসন ছিল, সেগুলো ধুয়ে রান্নাঘরের দরজাটা বন্ধ করে সামনের ঘরে চলে এলাম। সবকটা বাতিই জ্বলছিল। দিনের বেলা সেগুলো পরিষ্কার করেছিলাম বলে সেগুলো বেশ ভালোই আলো দিচ্ছিল।

বাইরে নিথর রাত্রি। একফোঁটা হাওয়া দিচ্ছিল না, জলে ঢেউ উঠছিল না, গাছের পাতা নড়ছিল না, আকাশ ঢাকা ছিল ঘন মেঘে। এত নিকষ কালো রাত্রি সাধারণত দেখা যায় না। এমনকি সূর্য ডোবার পরেও আকাশে বিন্দুমাত্র রঙের চিহ্ন ছিল না। চারিদিক ছিল আশ্চর্য রকমের শান্ত, প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের আগে চারদিক যেমন থাকে।

বেশ একটা খুশি খুশি ভাব নিয়ে আমি বই নিয়ে বসেছিলাম, মনে মনে ভাবছিলাম পাঁচ-পাঁচখানা কালো মাছের কথা, যেগুলো রান্নাঘরের বরফ বাক্সে রাখা আছে, আর কাল সকালেই আসবে সেই চাষী লোকটা ডিম আর রুটি নিয়ে, তারপরেই চমৎকার ব্রেকফাস্ট। অচিরেই আমি ডুবে গেলাম পড়ার মধ্যে।

রাত যত বাড়তে লাগল, নৈ:শব্দ তত গভীর হতে লাগল। কাঠবিড়লিদের খচমচ আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল না। এমনকি মেঝের পাটাতন আর দেয়ালের অদ্ভূত আওয়াজগুলোও বন্ধ হয়ে গেছিল। আমি একমনে পড়ছিলাম, আচমকা পড়া বন্ধ হয়ে গেল, কারণ রান্নাঘরের ঘড়িটায় কর্কশ স্বরে নটার ঘন্টা বাজছে। এত জোর শব্দ! মনে হচ্ছিল কেউ যেন দারুণ জোরে হাতুড়ি পেটচ্ছে! আমি অন্য আরেকটা বই নিলাম পড়ব বলে।

কিন্তু একটু বাদেই আবিষ্কার করলাম, আমি আসলে কিছুই পড়ছি না। মানে বইটার সেইসব জায়গাগুলোই বারবার করে পড়ে যাচ্ছি যেগুলো আমার কোন কাজেই লাগবে না। বুঝতে পারলাম অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি এবং অনেক চেষ্টা করেও মনসংযোগ করা ক্রমশ কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। খেয়াল করলাম একটার জায়গায় আমি একেকবারে দুতিনটে করে পাতা উল্টে যচ্ছি এবং সেটা ধরতেও পারছি না। আশ্চর্য! এমন হওয়ার কারণ কী?

শরীর তো ঠিকই আছে। মনটাও। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করলাম পড়ায় মন দেওয়ার। কিছুক্ষণ পারলামও, কিন্তু তারপরেই দেখলাম আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তকিয়ে আছি সামনের দিকেই।

তার মানে আমার অবচেতনে কিছু একটা কাজ করছে। এমন কিছু একটা যার জন্য আমার মনটা খচখচ করছে, আর অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। রান্নাঘরের দরজা জানালাগুলো বন্ধ করেছি কি? উঠে গিয়ে দেখলাম, না, ওগুলো বন্ধই করা রয়েছে। আগুনে ঠিকঠাক কাঠ দেওয়া হয়েছে তো? না:, সে'সবও তো ঠিকঠাকই আছে দেখছি। বাতি নিয়ে সারা বাড়িটা একবার ঘুরে দেখলাম, শোওয়ার ঘরগুলো দেখলাম, এমনকি ভাঁড়ার ঘরটাও। কোথাও কিচ্ছু নেই। কিন্তু তবুও মনে হচ্ছে একটা কিছু গণ্ডগোল ঘটছে! ধারনাটা আমার ক্রমশই জোরদার হয়ে উঠছিল।

শেষপর্যন্ত আমি যখন আবার বইপত্র খুলে বসলাম পড়ায় মন দেব বলে, ঠিক তখনই আমার সারা গা শিরশির করে উঠল। এই প্রথমবারের জন্য। ঘরটা ক্রমেই ঠান্ডা হয়ে আসছে না? আজ সারাদিনই খুব গুমোট ছিল, বিকেলেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি।ঘরের বড় বড় ছখানা বাতি আলোর সাথে সাথে উত্তাপও ছড়াচ্ছিল যথেষ্ট। কিন্তু ক্রমে ক্রমেই ঘরের কনকনে ভাবটা এত প্রবল হয়ে উঠল (সেটা অবশ্য লেকের জল থেকেও আসতে পারে) যে আমি উঠে গিয়ে বারান্দার দিকের কাচের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

কয়েকমুহূর্তের জন্য আমি বাইরে তাকিয়েছিলাম। জানলা দিয়ে হালকা আলোর ঝলক গিয়ে পড়েছিল বাইরে, শুঁড়িপথটা পেড়িয়ে সেই আলোতে জলের কয়েক ফুট পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। আমি তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে একটা দৃশ্য দেখতে পেলাম। একটা ক্যানো আলোর মধ্য দিয়ে মসৃণভাবে ভেসে অন্ধকারে মিশে গেল। দেখে মনে হলো ক্যানোটা পারের একশো ফুটের মধ্যেই রয়েছে। অবাক হয়ে গেলাম। এই রাত্তিরে দ্বীপের কাছাকাছি ক্যানো এল কোত্থেকে? লেকের ওপারে যেসব লোকজন বেড়াতে এসেছিল, তারা তো সপ্তাহখানেক আগেই এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছে। আর এই দ্বীপের কাছাকাছি কোনো জলপথ পরিবহনও নেই যে তাদের ক্যানো আসবে। পড়ায় আর মনই বসল না। বারবার চোখে ভেসে উঠতে লাগল আলোর মধ্যে কালো জলের ওপর দিয়ে সেই ক্যানোটার মসৃণভাবে ভেসে যাওয়া। যতবার মনে পড়তে লাগল, তত নিখুঁতভাবে সেই ছবিটাই যেন দেখতে পেলাম। ক্যানোর আকারটা বেশ বড়ো, এত বড়ো ক্যানো আমি গ্রীষ্মের সময়েও এই লেকে দেখিনি। রেড ইন্ডিয়ানদের যুদ্ধের ক্যানো এইরকম হয়। চেষ্টা করেও যখন কিছুতেই আর এক পাতাও পড়তে পারলাম না, তখন বইপত্র বন্ধ করে উঠে পড়লাম। বারান্দায় একটু হাঁটাহাঁটি করে গা-টা গরম করে নেওয়া দরকার। ঠান্ডায় হাড় পর্যন্ত কাঁপছিল আমার।

বাইরে তখন নিথর রাত্রি, নিকষ অন্ধকার। আমি অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে ঘাটের কাছে গিয়ে পৌঁছোলাম। ঘাটের কাঠে লেগে জল তখন ক্ষীণস্বরে কুলকুল আওয়াজ করছিল। লেকের ওপারে দূরের জঙ্গলে কোথায় যেন একটা বড়ো গাছ ভেঙে পড়ল। সেই আওয়াজে কেঁপে উঠল রাতের ভারি বাতাস। যেন অন্ধকারে অতর্কিতে কেউ কামান দাগল। এছাড়া কোথাও আর কোন শব্দ নেই।

জানালা থেকে ভেসে আসা আলোকরশ্মির মধ্যে আমি যখন ঘাটের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম, দেখতে পেলাম সামনের ক্ষীণ আলোকরশ্মির মধ্যে আরেকটা ক্যানো ভেসে এসে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। এবার ক্যানোটা আরো পরিষ্কার দেখা গেল। এটাও সেই আগের মতোই বেশ বড়ো একটা ক্যানো। চালাচ্ছে দুজন রেড ইন্ডিয়ান। আর এদের মধ্যে যে হাল ধরে আছে - তাকে দেখে মনে হলো বিশাল চেহারার। এত পরিষ্কার দেখতে পেলাম কারণ এই ক্যানোটা প্রথমটার চেয়ে দ্বীপের আরো কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। মনে হলো, সরকার এদের জন্য যে আবাস বানিয়ে দিয়েছে এরা সেখানেই যচ্ছে। সেটা এখান থেকে মাইল পনেরো দূরে।

যখন আমি ভাবছিলাম এত রাতে রেড ইন্ডিয়ানরা এখানে কী করছে, ঠিক সেই সময়েই আরেকটা ক্যানো, একই রকম আকারের, ঘাটের কাছ দিয়ে ঘুরে গেল। এটাও চালাচ্ছে দুজন রেড ইন্ডিয়ান। এবারে ক্যানোটা পাড়ের একেবারে কাছে চলে এসেছিল এবং ঠিক তখনই আমার মনে হলো ক্যানো আসলে তিনটে নয়, একটাই, এবং ওই একটা ক্যানোই দ্বীপের চারিদিকে ঘুরে বেড়চ্ছে।

গতিক সুবিধের ঠেকল না আমার। যদি আমার ধারনা সঠিক হয়, যে তিনটে নয়, ক্যানো একটাই, তাহলে এটাই ধরে নিতে হবে যে ওই দুজন রেড ইন্ডিয়ান আমার সঙ্গে মোলাকাত করতে চাইছে। আমি আগে অবশ্য কখনো শুনিনি যে রেড ইন্ডিয়ানরা কাউকে আক্রমণ করেছে, তবুও সমভাবনা তো একটা থেকেই যায়। যদিও তখন আমি এসব কিছুই ভাবছিলাম না, ভাবছিলাম এটা যদি সমস্যা হয়, তাহলে এর সমাধান কীভাবে হবে।

এর মধ্যে আমি নিজে থেকেই আলো থেকে সরে গিয়ে একট পাথরের আড়ালে লুকিয়েছিলাম, যেখানে ঘন অন্ধকার, যেখান থেকে আমাকে দেখা যাবে না, কিন্তু ক্যানোটা যদি আবার আসে, তাহলে আমি দেখতে পাব। সিদ্ধান্তটা সঠিক ছিল।

যেরকম ভেবেছিলাম, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ক্যানোটা চতুর্থবারের জন্য দেখা গেল। এবার ঘাট থেকে কুড়ি গজের মধ্যেই। দেখে মনে হলো ক্যানোটা ঘাটে ভিড়তে চাইছে। ক্যানোর লোকদুটোকেও চিনতে পারলাম, এর মধ্যে হালে বসা লোকটা তো বিশাল চেহারার। নি:সন্দেহে এটা সেই ক্যানোটাই। তার মানে বিশেষ কোন উদদেশ্য নিয়েই এই দুটো লোক ক্যানোটা নিয়ে দ্বীপের চারপাশে ঘুরছে, সুযোগ খুঁজছে নামার জন্য। এই অন্ধকারে আমার চোখ সয়ে গেলেও রাত্রিটা এতই নিকষ যে ক্যানোটা অন্ধকারে একেবারে মিশে গেছিল, আর লোকদুটো জোরসে দাঁড় টানলেও সেই আওয়াজও আমার কানে পৌঁছোচ্ছিল না। ক্যানোটা যেকোন মুহূর্তে আবার ঘুরে আসবে এবং এবারে হয়তো সত্যিই ওরা দ্বীপে নামবে। তাদের উদ্দেশ্য কী আমি জনি না, তবে এত রাত্তিরে এই দুই বিশাল চেহারার রেড ইন্ডিয়ানের সঙ্গে আমার মতো একজনের মোলাকাত খুব সুখকর অভিজ্ঞতা হবে বলে মনে হচ্ছে না।

বসার ঘরের এককোনে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড় করানো আছে আমার মার্লিন রাইফেলটা, যার ম্যাগজিনে আছে দশটা কার্তুজ। চট করে বাড়িতে ঢুকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। এক মুহূর্ত দেরি না করে আমি বাড়ির দিকে যেতে লাগলাম, গাছপালার মধ্যে দিয়ে নিজেকে আড়াল করে, যাতে আমাকে দেখা না যায়। ঘরে ঢুকেই আমি বারান্দার দিকের জানালাটা বন্ধ করে দিলাম এবং যত তাড়াতাড়ি সমভব ঘরের সবকটা বাতিই নিভিয়ে দিলাম, কারণ ঘর থেকে বাইরের কিছু দেখা না গেলেও বাইরে থেকে ঘরের ভেতরটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। আর এরকম ঘরে থাকার অর্থই হলো শত্রুর কাজটা এগিয়ে দেওয়া। আর এই শত্রুরা, যদি ওরা অবশ্য সত্যিই শত্রু হয়, যখন যথেষ্ট বিপজজনক।

আমি ঘরের একটা কোণ বেছে নিয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ালাম, হাত রইল ঠান্ডা রাইফেলের ব্যারেলে। আমার আর দরজার মাঝখানে রইল আমার বইখাতা ভর্তি পড়ার টেবিলটা। প্রথম কয়েক মিনিট কিছুই দেখতে পেলাম না, কারণ ঘরের আলো নিভিয়ে দেবার পরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে গেছিল সবকিছু, তারপর একটু একটু করে নজরে আসছিল, জানলাটাও দেখতে পাচ্ছিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দরজা (এর ওপরের দিকটা কাচের) এবং বারান্দার দিকের জানালাগুলো আরো পরিষ্কার বোঝা গেল, কারণ তক্ষুণি শুনতে পেলাম একটা অদ্ভূত ফাঁকা আওয়াজ। বোঝা গেল ক্যানোটা ঘাটে এসে ভিড়েছে। তারপর সেটাকে টেনে নিয়ে আসা হল পাথরের ওপর দিয়ে, দাঁড়গুলোকে রেখে দেওয়া হল নিচে, তারপর সব নি:শব্দ। বোঝা গেল ওরা চুপিসারে আসছে বাড়ির দিকেই ।

পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল আকার নিচ্ছে। আর খুব বেশিক্ষণ আমি মানসিকভাবে স্বাভাবিক থাকতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। বুঝতে পারছিলাম, অচিরেই যে ভয়, যে আতঙ্কের মুখোমুখি হতে হবে আমাকে, তাতে এই রাইফেলও আমাকে কোনরকম ভরসা দিতে পারবে না। মনে হচ্ছিল, আমি যেন বাস্তব জগতে নেই, আমি যেন অদ্ভূত এক আধিভৌতিক পরিস্থিতির দর্শক। সে রাতে আসলে যে ঠিক কী কী ঘটেছিল, তা বলা আর আমার পক্ষে সমভব নয়, তবে যেটা সারাজীবন মনে থাকবে তা হল ভয় আর আতঙ্কের এক শিহরণ, মনে হচ্ছিল এই চাপ যদি আমাকে আর বেশিক্ষণ সহ্য করতে হয়, তাহলে বোধহয় আমি পাগল হয়ে যাব।

এসবের মাঝেই আমি চুপ করে অপেক্ষা করছিলাম ঘরের এক কোনায়, যাই আসুক না কেন, তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য। বাড়ির ভেতর বিরাজ করছিল গোরস্থানের স্তব্ধতা, আর সেই রাত্তিরের ভয়ংকর নৈ:শব্দের মধ্যে আমি যেন আমার রক্ত চলাচল আর নাড়ির শব্দও শুনতে পাচ্ছিলাম।

যদি রেড ইন্ডিয়ানরা বাড়ির পেছন দিক দিয়ে আসে, তবে ওরা ঢোকার চেষ্টা করবে রান্নাঘরের দরজা আর জানলা দিয়ে, কিন্তু সেগুলো বন্ধ। ওরা সেদিক দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করলে আওয়াজ হবেই, আমি সে আওয়াজ শুনতে পাব। এছাড়া ওরা ঢোকার চেষ্টা করতে পারে আমার সামনের দরজা দিয়ে, সে চেষ্টা করলে সেকেন্ডের ভগ্নাংশে আমার বন্দুকের গুলি ওদের পেড়ে ফেলবে।

অন্ধকারের মধ্যেও আমি এখন ভালোই দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখতে পাচ্ছিলাম টেবিলটা প্রায় গোটা ঘর জুড়ে রয়েছে, দুপাশে সামান্য পথ রেখে। দেখতে পাচ্ছিলাম কাঠের চেয়ারটা, সাদা অয়েল ক্লথের ওপর রাখা কাগজপত্র আর কালির দোয়াতটাকেও। তখন আমি প্রতীক্ষা করছিলাম রাতের অন্ধকার কেটে গিয়ে কখন সূর্য উঠবে। এমনভাবে আমি কখনোই সূর্যালোকের প্রতীক্ষা করিনি।

আমার ফুট তিনেক দূরে একট সরু প্যাসেজ চলে গেছে রান্নাঘরে, আর বেডরুমে যাওয়ার সিঁড়িটা উঠে গেছে প্যাসেজ থেকে, বলতে গেলে এই বসার ঘর থেকেই। জানলা দিয়ে আবছা দেখতে পাচ্ছিলাম বাইরে স্থির হয়ে থাকা গাছগুলোকে, যার একটি পাতাও নড়ছে না।

এই অপার্থিব নৈ:শব্দের মধ্যেই কয়েক মুহূর্ত পরে খেয়াল করলাম বারান্দায় একটা ক্ষীণ আওয়াজ, এত ক্ষীণ সেই আওয়াজ; যেন সেটা কানের বদলে মস্তিষ্কে অনুভূত হলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় একটা কালো ছায়া দেখা গেল, মনে হলো যেন একটা মুখ দরজার কাচ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। আমার পিঠে একটা শিহরণ জাগল, মনে হলো আমার মাথার সব চুল খাড়া হয়ে গেছে। এটা হলো সেই রেড ইন্ডিয়ানের চেহারা। সার্কাসের বাইরে এরকম বিশাল চেহারা আমি আর দেখিনি। কাচের ওপর দিয়ে দেখতে পেলাম তার ঈগলের মতো বাঁকানো নাক আর ছুঁচলো থুতনি। সে কোনদিকে তাকাচ্ছিল বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু সেই অতি ক্ষীণ আলোতেও তার চাহনি দেখে বুঝতে পারছিলাম, ঘরের একটি কোণাও তার নজর এড়িয়ে যাবে না।

পুরো পাঁচ মিনিট ধরে সেই বিশাল চেহারা সেখানে দাঁড়িয়ে রইল, ঝুঁকে পড়ল তার কাঁধ এদিক ওদিক, মাথা ঘুরতে লাগল চতুর্দিকে, এবং ততক্ষণই তার পেছনে দাঁড়িয়ে রইল আরেকজন। চেহারা অত বড়োসড়ো নয়, সেও নজর করছিল চতুর্দিকে, হাওয়ায় দোলা গাছের মতো তার ঝুঁকে পড়া চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তা। এ সময় সাংঘাতিক উৎকন্ঠা আর আতঙ্কে আমার শিরদাঁড়া দিয়ে বরফ ঠান্ডা স্রোত ওঠানামা করছিল, বুকের ধুকপুকুনি একবার থেমে যাচ্ছিল, পরক্ষণেই দারুণ বেগে চলতে শুরু করছিল। আর প্রবল রক্তস্রোতে আমার মাথা এমন ঝাঁ ঝাঁ করছিল যে মনে হচ্ছিল ওরা না এই আওয়াজ শুনে ফেলে! সারা মুখে জমা হচ্ছিল ঠান্ডা ঘামের ফোঁটা, আর মনে হচ্ছিল এই অসহ্য উৎকন্ঠা থেকে মুক্তি পেতে গেলে আমায় চেঁচিয়ে উঠতে হবে প্রাণপণে, ধাক্কা মারতে হবে দেয়ালে, যেভাবেই হোক, শব্দ করতে হবে প্রবলভাবে, তবেই এই দৃশ্যের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

ঠিক এ সময়েই আমি খেয়াল করলাম, আমার পেছন থেকে রাইফেলটা টেনে নিয়ে দরজার দিকে তাক করার ইচ্ছে থাকলেও আমি পারছি না, কারণ আমার নড়াচড়ার শক্তি নেই। ভয়ে আমার সমস্ত পেশিগুলো অসাড় হয়ে গেছে। এরকম পরিস্থিতিতে পড.তে হবে, আমি কখনো ভাবিনি।

তারপর একটা ক্ষীণ শব্দ হলো পেতলের নবটা ঘোরানোর, এবং দরজাটা ইঞ্চিখানেক ফাঁক হয়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পর দরজাটা আরো খুলে গেল। কোন পায়ের শব্দ হলো না, অন্তত আমি পেলাম না, কিন্তু দেখলাম সেই দুই মূর্তি যেন হাওয়ায় ভেসে ঢুকে পড়ল ঘরে, এবং পেছনের লোকটা আস্তে করে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

চার দেয়ালের মধ্যে ওরা দুজন, আর আমি একা। আমি দাঁড়িয়ে আছি ঘরের এক কোণায় পাথরের মূর্তির মতো। ওরা কি আমাকে দেখতে পেয়ে গেছে? মনে হচ্ছিল যেন আমার বুকে কেউ ড্রাম পেটাচ্ছে, এবং যত চেষ্টা করছিলাম দম চেপে রাখার, শ্বাসের শব্দটা যেন টিউব থেকে হাওয়া বেরোনোর মতো শোনাচ্ছিল।

তারপর যে ঘটানাটা ঘটল, তাতে পুরো ব্যাপারটা অন্যদিকে মোড় নিল। লোকদুটো যদিও কোন কথা বলছিল না, তবুও মনে হচ্ছিল ওরা ঘরটা পেরিয়ে যেতে চাইছে। যদিও যেদিক দিয়েই যাক ওদের যেতে হবে টেবিলের পাশ কাটিয়েই। ওরা যদি আমার দিকে আসে, তাহলে ওদের সঙ্গে আমার তফাৎ থাকবে মাত্র ইঞ্চি ছয়েকের। পরিস্থিতি বিবেচনা করে যখন আমি ভাবছিলাম কী করা যায়, তখনই দেখলাম, যে লোকটা ছোটোখাটো (আসলে সেও বিশাল চেহারার) সে হাত তুলে সিলিং-এর দিকে দেখাল। অন্য লোকটিও মাথা তুলে সেদিকটা দেখল। এবার আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। ওরা ওপরের ঠিক সেই ঘরটাতেই যেতে চাইছে, যেটা আজ রাত পর্যন্ত আমার শোওয়ার ঘর ছিল। সেই ঘর যেখানে আজ সকালে আমি একটা ভয়ের আবহ টের পেয়েছিলাম, তারপরেই ঘরটা আমি পাল্টে নিয়েছিলাম।

সেই রেড ইন্ডিয়ান দুজন নি:শব্দে ঘরের ভেতর দিয়ে সিঁড়ির দিকে গেল, আমার পাশ দিয়ে ঘুরেই। এত নি:শব্দ তাদের পদচারণা যে একফোঁটা আওয়াজও শুনতে না পাওয়াই উচিৎ ছিল। কিন্তু তাদের পায়ের আওয়াজ আমি পরিষ্কার শুনতে পেলাম।

দুটো বিশাল দৈত্যাকৃতি কালো বেড়লের মতোই যখন তারা টেবিলের পাশ দিয়ে ঘুরে যাচ্ছিল, তখনই আমি প্রথম খেয়াল করলাম, দুজনের মধ্যে যে তুলনায় ছোটোখাটো, সে কী যেন একটা টেনে নিয়ে আসছে। যখন এটা মেঝের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে আসার সড় সড় আওয়াজ হচ্ছিল, তখন আমার মনে হলো, এটা বোধহয় কোন বড়োসড়ো মৃত বস্তু, ডানা বা হাত ছড়নো, অথবা কোন বড়ো ছড়ানো সিডার গাছের ডাল। এটা যে কী আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, এবং আমি এত ভয় পেয়েছিলাম যে ঘাড় ঘুরিয়ে জিনিসটা দেখার মতো শক্তিও আমার ছিল না।

তারা ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। সামনের লোকটা তার বিশাল একটা হাত রাখল টেবিলের ওপরে। ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। নাক দিয়ে বইছিল গরম নি:শ্বাসের হলকা। চেষ্টা করছিলাম চোখ বন্ধ করে ফেলার, যাতে এই দৃশ্য আমাকে দেখতে না হয়, কিন্তু অবাধ্য চোখদুটো কিছুতেই বশ মানছিল না। এমনকি পায়েরও সমস্ত সাড় চলে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন আমার পা দুটো পাথর বা কাঠ দিয়ে তৈরি। তার চেয়েও খারাপ হলো, আমি বুঝতে পারছিলাম, যেকোন মুহূর্তে ভারসাম্য হারিয়ে আমি পড়ে যাব। কী এক শক্তি আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, আবার একইসঙ্গে মনে হচ্ছিল ভয়ের চোটে আমি পড়েই যাবো ওদের গায়ের ওপর, ঠিক যখন ওরা আমার সামনে দিয়ে যাবে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমি কিছু বোঝার আগেই ওরা আমার পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরের শোওয়ার ঘরের দিকে যেতে লাগল। ওদের সঙ্গে আমার এখন ইঞ্চি ছয়েকেরও তফাৎ নেই। মনে হল, ওদের সঙ্গে যেন একটা হিমেল হাওয়ার স্রোত বয়ে চলেছে। ওরা আমাকে স্পর্শ করেনি, আর এটাও আমি বুঝতে পারছিলাম যে ওরা আমাকে দেখতেও পায়নি। এমনকি যে জিনিসটা ওরা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল সেটা পর্যন্ত আমার পায়ে লাগল না, যদিও আমি আশঙ্কা করছিলাম সেটাই, কিন্তু শেষ অবধি লাগল না যে সেটা ঈশ্বরের অশেষ করুণা।

আমার কাছাকাছি যে ওরা নেই, এতে আমি অনেকটা স্বস্তি পেলাম। যদিও তখনও আমি ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিলাম। তবুও এখন একটু স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নেওয়া যচ্ছিল। আর একটা জিনিস খেয়াল করছিলাম, একটা অদ্ভূত আলো, সেটা যে কোত্থেকে আসছিল আমি জানি না। কিন্তু সেই আলোয় ওদের সমস্ত চলাফেরা এবং নড়াচড়া বোঝা যাচ্ছিল। ওরা ঘর থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার পর কিন্তু সেই আলোটা মিলিয়ে গেল। আচমকা ঘরে ঘনিয়ে এল এমন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার যে আমি দরজা জানালাগুলো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম না।

এরমধ্যেই কিন্তু সেই রেড ইন্ডিয়ানরা পৌঁছে গেছিল ওপরে, কয়েকমুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছিল সেখানে। এরপর ওরা কী করবে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ওরা যেন কিছু শুনছিল। তারপর শুনতে পেলাম, পায়ের আওয়াজ শুনে মনে হলো দৈত্যাকার মূর্তিটা, সরু করিডোরটা পেরিয়ে সরাসরি মাথার ওপরের ঘরটায় ঢুকে গেল, যেটা আমার শোওয়ার ঘর ছিল। আজ সকালে ওই ঘরে মারাত্মক ভয় না পেলে ওই ঘরেই আমার এখন শুয়ে থাকার কথা ছিল, যে বিছানার পাশে এখন ওই দৈত্যটা দাঁড়িয়ে আছে।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ কিছু ঘটল না, চারিদিকে বিরাজ করছিল এক অপার্থিব নৈ:শব্দ। এবং তারপর শোনা গেল এক ভয়ংকর, তীব্র আতঙ্কের চিৎকার, রাত্রির নীরবতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল সেই চিৎকারে, তারপর আচমকাই থেমে গেল তা, মনে হলো কেউ যেন কারো গলা টিপে ধরে আওয়াজটা থামিয়ে দিল। একই সময়ে অন্য রেড ইন্ডিয়ানটাও ঘরে ঢুকে তার সঙ্গীর সঙ্গে যোগ দিল। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম মেঝের সেই জিনিসটার টেনে নিয়ে যাওয়ার শব্দ, তারপর ধপ করে একটা আওয়াজ হলো, যেন ভারী কিছু মেঝেতে পড়ল। তারপর আবার সবকিছু শান্ত, নিস্তব্ধ হয়ে গেল আগের মতোই।

আচমকাই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এক অতি উজ্জ্বল আলো এবং প্রায় পরক্ষণেই শোনা গেল এক প্রলয়ঙ্কর বাজ পড়ার শব্দ। সারা দিন অসহ্য গরমের পর ওই ঝড় উঠছে বুঝি! সেই আলোয় পাঁচ সেকেন্ড ধরে আমি সমস্ত কিছু পরিষ্কার দেখতে পেলাম, এমনকি জানালার বাইরে গাছের সারিগুলোও। বজ্রপাতের আওয়াজ লেকের জলে এবং দূরে দূরে দ্বীপভূমিতে প্রতিধ্বনিত হলো।বৃষ্টি নামল প্রবল বেগে।

ঝমাঝম শব্দে বড়ো বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগল লেকের শান্ত জলে, বাড়ির চালে, মেপল গাছের পাতায়। পরক্ষণেই আরেকবার দেখা গেল তীব্র ঝলক, আগের চেয়েও তীব্র, আগের চেয়েও বেশি সময় ধরে, আকাশ থেকে উৎ সরিত দিগন্ত বিস্তৃত সেই আলোয় মুহূর্তের জন্য সারা ঘর সাদা

আলোয় ভরে গেল। সেই আলোয় দেখতে পেলাম বাইরের গাছপালা বৃষ্টির জলে চকচক করছে। তারপর উঠল ঝড় এবং এক মিনিটের মধ্যেই সেই ঝড় ভয়াবহ আকার ধারণ করল।

বাইরের এই তান্ডবলীলা চলার মধ্যেই কিন্তু আমি ওপরের ঘরের সামান্যতম আওয়াজও শুনতে পাচ্ছিলাম এবং ওপরের ঘরের সেই তীব্র আতঙ্ক এবং যন্ত্রণার আওয়াজের একটু পরেই আমি কিন্তু বুঝতে পারলাম সেখানে আবার নড়াচড়া শুরু হয়েছে। লোকদুটো ঘর ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছে

সিঁড়ির মাথায়। একটু পরেই তারা নামতে শুরু করল। তাদের পেছন পেছনই সেই জিনিসটাও নামছিল, সিঁড়িতে থপথপ আওয়াজ শুনেই বোঝা যাচ্ছিল তা। আশ্চর্য, কী জিনিস ওটা?

আমি শান্তভাবে দেখছিলাম এই অদ্ভূত দৃশ্য। ওরা আসছে, ওরা যত কাছে আসছে, সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামছে, সেই জিনিসটার টেনে নামানোর থপথপ আওয়াজও তত জোরালো হচ্ছিল।

ওরা যখন অর্ধেকটা নেমেছে, তখন হঠাৎ একটা চিন্তা আমার মাথায় এল এবং আবার আতঙ্কে শিহরিত হলাম আমি। ওরা যখন এই ঘরের মধ্যে দিয়ে যাবে তখন যদি আবার বিদ্যুৎ চমকায়, তাহলে তো ওরা আমাকে পরিষ্কার দেখে ফেলবে! দম চেপে রইলাম আমি। প্রতিটি মুহূর্ত মনে হতে লাগল একেকেটা ঘন্টার মতো, আর মনে হতে লাগল ওরা যেন হঠাৎই অত্যন্ত আস্তে হাঁটছে।

দুই রেড ইন্ডিয়ান নেমে এল সিঁড়ির শেষ ধাপে, প্যাসেজের দরজার সামনে দেখা গেল দলপতির বিশাল ভয়াবহ চেহারাটা, তারপর একটা দমাস শব্দের সঙ্গে সেই জিনিসটা সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল সে, ঘুরে তাকাল তার সঙ্গীর দিকে, তারপর আবার চলতে শুরু করল তারা, বাঁদিক দিয়ে ঘরে ঢুকল, ধীরে ধীরে যেতে লাগল টেবিল ঘুরে আমার পাশ দিয়েই। দলপতি এখন আমার কাছাকাছি চলে এসেছে, আর তার সঙ্গী, যে সেই জিনিসটা টেনে আনছিল, যার অবয়ব আমি ভাল বুঝতে পারছিলাম না, সে যখন একেবারে আমার সামনে চলে এসেছে, সেই সময়েই তারা দুজনেই থমকে দাঁড়াল। এবং ঠিক তখনই আচমকাই বজ্রপাত থেমে গেল, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল, এবং ঝোড়ো বাতাস শান্ত হয়ে গেল।

পরের কয়েক মুহূর্ত যেন আমার হৃৎপিন্ড স্তব্ধ হয়ে গেছিল। ঠিক তারপরেই দুবার বিদ্যুৎ চমকাল, সারা ঘর ভরে গেল সেই আলোর ঝলকানিতে, ঘরের সমস্ত দৃশ্যই দেখা গেল পরিষ্কারভাবে।

বিশাল চেহারার লোকটার একটা পা সামনের দিকে বাড়ানো, সে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে তার সঙ্গীর দিকে, পরিষ্কার দেখতে পেলাম। সে সরাসরি তাকিয়ে রয়েছে তার সঙ্গী যে জিনিসটা টেনে আনছিল সেটার দিকে। তার ঈগলসদৃশ বাঁকানো নাক, গালের উঁচু হাড়, কালো সোজা চুল আর উদ্ধত থুতনিতে যে হিংস্রতা, তা আমি সারাজীবনেও ভুলব না।

তার সঙ্গী তখন আমার থেকে ফুটখানেক দূরে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে দেখছিল সেই জিনিসটাকে। একট সিডার গাছের পাতা সমেত কাণ্ডের ওপর শোওয়ানো ছিল জিনিসটা। সেটা একটা মৃতদেহ - একজন সাদা মানুষের মৃতদেহ। মাথাটা একটু উঁচু করা এবং সেখান থেকে রক্তের ধারা নেমে এসেছে কপাল থেকে থুতনি পর্যন্ত।

আর তখনই, সেই আতঙ্কের রাতে এই প্রথমবারের জন্য আমি আমার হারানো শক্তি ফিরে পেলাম। একটা বিকট চিৎকার করে দুহাত ছুঁড়ে সেই বিশাল রেড ইন্ডিয়ানের গলা চেপে ধরতে গেলাম, পেলাম শুধু একমুঠো হাওয়া, মুখ থুবড়ে ছিটকে পড়লাম মেঝেয় অচেতন অবস্থায়।

আমি চিনতে পেরেছিলাম মৃতদেহট কার। সেটা আমার, আমার মৃতদেহ, ওই মুখটা আমার, আমার মড়াকেই টেনে আনছিল ওরা।

আমার চেতনা ফিরল ঝকঝকে দিনের আলোয়, কারো গলা শুনে। তাকিয়ে দেখলাম, আমি যেখানে পড়েছিলাম, সেখানেই শুয়ে আছি, চাষী দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে, তার হাতে পাঁউরুটির ঝুড়ি। সেই আমাকে ধরে তুলল, পাশে পড়েছিল আমর রাইফেলটা , তুলে দিল সেটাও। গত রাতের আতঙ্ক তখনও আমি ভুলতে পারিনি, কাজেই তার প্রশ্নের উত্তরে আমি যা বললাম, সেটা নিজের কানেই অসংলগ্ন ঠেকল।

সেই দিনটায় সারা বাড়িতে বহুক্ষণ ধরে বিফল খোঁজাখুঁজির পর আমি ওই দ্বীপ ছেড়ে লম্বা দিলাম। বাকি দশদিন কাটালাম চাষীর বাড়িতে। যখন আমার যাওয়ার সময় হল, তখন আমার পড়া সুন্দর তৈরি হয়ে গেছে, আর আমি দেহে মনে আবার আগের মতোই সতেজ হয়ে গেছি।

যেদিন আমি ফিরব, সেদিন চাষীটি একটু আগেই রওনা হয়ে গেল তার বড়ো নৌকাতে আমার জিনিসপত্র নিয়ে। সে যাবে এখান থেকে বারো মাইল দূরের একটা জায়গায়, যেখান থেকে সপ্তাহে দুদিন শিকারিদের নিয়ে স্টিমার যায়। শেষ বিকেলে, আমি আমার ক্যানোটা নিয়ে একটু অন্যদিকে রওনা দিলাম, সেই দ্বীপের দিকে, ইচ্ছে দ্বীপটাকে আরেকবার দেখব।

ঠিকঠাকই পৌঁছে গেলাম সেখানে, ঘাটে ক্যানোটা ভিড়িয়ে দ্বীপটা ঘুরে দেখলাম, বাড়িটা দেখলাম এবং

দোতলার সেই ঘরটাতেও গেলাম। কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করলাম না।

যখন আবার আমি ক্যানোতে করে রওনা হয়েছি, তখনই খেয়াল করলাম দ্বীপের বাঁক ঘুরে আমার সামনের দিক দিয়ে একটা ক্যানো ভেসে আসছে। বছরের এই সময়টায় এখানে ক্যানো দেখাটা অস্বাভাবিক এবং এটা যেন মনে হলো হাওয়ায় ভেসে এল। আমি আমার গতিপথটা একটু সরাতেই দেখলাম সেটা একটা পাথরের আড়ালে চলে গেল। এটা একটা বিরাট বড়ো ক্যানো, আর তাতে বসে আছে দুজন রেড ইন্ডিয়ান। ভেতরে ভেতরে একটু উত্তেজনা হচ্ছিল। ভাবছিলাম ক্যানোটা আবার ঘুরে আসবে কিনা। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সেটা আবার দেখা গেল। এখন আমাদের মধ্যে দূরত্ব দুশো গজেরও কম, এবং সেই রেড ইন্ডিয়ান দুজন দাঁড় টেনে তীব্র গতিতে ধেয়ে আসছিল আমার দিকেই।

পরের কয়েক মিনিট আমি যে গতিতে দাঁড় টেনেছিলাম, তত জোরে আমি জীবনেও কোনদিন দাঁড় টেনেছি কিনা সন্দেহ। একটু পরে আমি ঘাড় ঘোরাতেই দেখলাম ওরা আবার গতিপথ পালতে দ্বীপের চারদিকে ঘুরছে।

তীরভূমির জঙ্গলের ওপাশে সূর্য অস্ত গেল, আকাশের মেঘেরা টকটকে লাল রঙ মেখে তাদের প্রতিচ্ছবি ছড়াতে লাগল লেকের শান্ত জলে। শেষবারের মতো যখন আমি তাকালাম, দেখলাম সেই বিরাটা ক্যানো এবং তার দুই ছায়ামূর্তি চালক লেকের চারদিকে পাক দিয়েই চলেছে। তারপর ছায়া ঘনিয়ে এল দ্রুত, কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল সেই লেক, বাঁক ঘুরতেই রাত্রের বাতাসের মৃদুমন্দ ঝাপটা এসে লাগল আমার চোখেমুখে, তারপর একটা উঁচু হয়ে থাকা পাথর আমার চোখের সামনে থেকে মুছে দিল সেই দ্বীপ আর ক্যানোটাকে।

অ্যালগারনন ব্ল্যাকউড রচিত ‘এ হন্টেড আইল্যান্ড’ অবলম্বনে।

ছবি: দীপংকর

গল্প

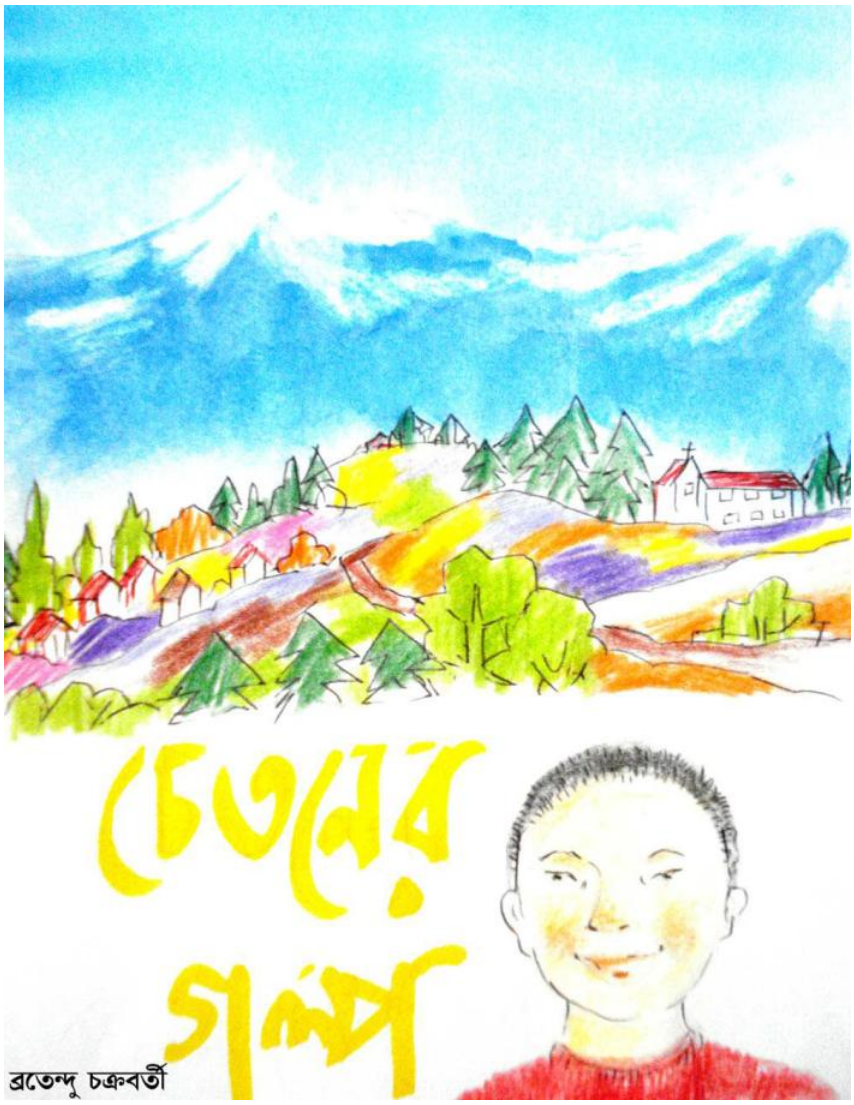

জীবনের শুরুটা ভালোই চলছিল চেতনের। মায়ের কাছে,বাবার কাছে অনেক গল্প শুনত চেতন,প্রতিদিন স্কুলের ছুটির ঘন্টা পড়লেই মায়ের হাত ধরে চা বাগানের ছায়া ছায়া আর অদ্ভুত গন্ধে ভরা পথটা ধরে ওরা বাড়ি ফিরত। পাহাড়ের কোলে একটা ছোট্ট গ্রামে চেতন থাকতো, থেকে থেকেই মেঘ এসে ঘিরে ফেলত সমস্ত গ্রামটা, তখন গোটা গ্রামটাই যেন একটা কুয়াশা মাখা অন্য জগৎ হয়ে যেত। শীতে প্রচন্ড ঠান্ডা থেকে বাঁচতে ওরা কাঠের আগুন জ্বালত আর সেই আগুনের পাশে বসে বাবার কাছে গল্প শুনতো চেতন, কোন ছেলেবেলায় দাদু পাহাড়ে কাঠ কাটতে গিয়ে বড় কালো ভালুকের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল, কিম্বা দুরের ওই নীল নীল আবছায়া ঘেরা পাহাড়ের চূড়ায় মাঝে মাঝে কেমন একটা আলো দেখা যেত! দাদুর বিশ্বাস ছিল যারা মারা যায় তারাই ওখানে চলে যায়। চেতনও তাই মনে করে।

এসব গল্প ছোট চেতন কত শুনেছে,বারবার শুনেছে। তারপর হাড় কাঁপানো শীত পড়তে শুরু করত, সাথে বরফও পড়ত মাঝে মাঝে। গোটা দার্জিলিং এর বেশিরভাগটাই সাদা বরফে ঢাকা পড়ে যেত। টয়ট্রেনের কাজ বন্ধ থাকত সে সময়। তাই বাবাও সে সময় বাড়িতেই থাকতো। চেতনের ভারি মজা হত।

তবে ট্রেন চালু থাকলে শিলিগুড়ি থেকে ওর বাবা প্রায়ই নানারকম খাবার আর গল্পের বই নিয়ে আসতো যা চেতনের ভীষণ প্রিয় ছিলো। মায়ের হাতে তৈরি গরম গরম মোমোর প্লেট হাতে আগুনের ধারে বসে চেতন খুলে বসত ওর গল্পের বই গুলো। ঠান্ডার জন্য সে সময় ওদের স্কুলও ছুটি থাকত। মা বাবা সবাইকে একসাথে কাছে পেয়ে যেত চেতন।

চেতনের মা ওদের গ্রামের কাছের চা বাগান ঘেরা একটা নার্সারি স্কুলে বাচ্চাদের দেখাশোনার কাজ করতেন। ঐ স্কুলেই পড়তো চেতন। যে মহিলা শ্রমিকেরা চা বাগানে চা পাতা তুলতে আসতেন তাঁদের বাচ্চাদের পড়াশোনা ও খেলাধুলার জায়গা ছিল ঐ স্কুল। চেতনের মায়ের মত আরো দুয়েকজন মহিলা সব বাচ্চাদের দেখাশোনা করতেন, বিকেলে চা পাতা তোলার কাজ শেষ হলে বাচ্চাদের নিয়ে মায়েরা ফিরে যেতেন একে একে। চেতনও ফিরতো মায়ের হাত ধরে, ফেরার পথে মা-ছেলে মিলে চেতনের সারাদিনের শেখা ছড়া আর গানগুলো গাইতে গাইতে ফিরে আসতো। দূরের পাহাড়ে পাহাড়ে গ্রামগুলোতে তখন আলো জলে উঠত অসংখ্য প্রদীপের মত। বাড়ি ফেরার পথে পাহাড়ি বাঁকের মুখে সেন্ট নিকোলাস স্কুলের বিশাল পাঁচিল ঘেরা কম্পাউন্ড চোখে পড়ত। মা বলত ঐ স্কুলে তোকে ভর্তি হতে হবে চেতন। ছোট্ট চেতন কী ভাবত কে জানে! অবাক চোখে চেয়ে থাকতো স্কুলের গেটের দিকে, যার মাথায় বসানো প্রভূ যিশুর এক হাতে বাইবেল আর এক হাতে সুদুরের হাতছানি।

মাঝে মাঝে বাবার সাথে টয়ট্রেনে চড়ার কথা মনে পড়ত চেতনের। ঘুরে ঘুরে ও দেখত কীভাবে ইঞ্জিনগুলো ধোয়ামোছা চলছে, কয়লা দেওয়া হচ্ছে, ভস ভস করে বেরিয়ে আসছে স্টিম, সকালের কুয়াশা কেটে যাওয়া রোদ্দুরে কেমন চকচক করছে ইঞ্জিনগুলো! সব থেকে ভালো লাগত যখন পাহাড় আর ঘন গাছপালার মাঝ দিয়ে আকাবাঁকা রাস্তাকে পাশে রেখে বা কখনও রাস্তাকে চিরে ছুটে চলত টয়ট্রেন, মাঝে মাঝেই কুউউউ করে বাঁশি বেজে উঠতো...

------তারপর বাবা হঠাৎ একদিন পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে দুরের ঐ নীল পাহাড়ে চলে গেল। তখন থেকেই বাড়ীতে শুধু মা আর চেতন। সংসারের ধকল সামলাতে গিয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রমে আর ঠান্ডা লাগিয়ে মা কঠিন রোগ বাঁধিয়ে ফেললো। ডাক্তার দেখে বললেন, সারতে অনেক সময় লাগবে আর সাথে বিশ্রামও দরকার। মা'কে বাঁচাতে চেতন স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিনরাত মায়ের সেবা করেতে লাগল। সম্বল বলতে বাবার পেনসনের কটা টাকা, ছোট একটা ঘর আর চারদিক থেকে হাঁ করে গিলতে আসা দারিদ্র। অভাবের সাথে ছোট্ট চেতনের অসম লড়াই-এর শুরু তখন থেকেই।

ছোট হলে কি হবে, চেতন ছিল বেশ চটপটে। রোজ সকালে উঠেই ঘরের অনেক কাজ সেরে ফেলত। গ্রামের পাশের পাহাড়ি ঝোরা থেকে জল নিয়ে আসত। মায়ের জন্য যা হোক রান্নাও সেরে ফেলত। তারপর বেলা বাড়লে পাশের ঘরের রাজুর সাথে চলত ম্যালের দিকে। রাজুর একটা টগবগে টাট্টু ঘোড়া আছে, এদিক ওদিক ঘুরে টুরিস্টদের আর তাদের বাচ্চাদের অনুরোধ করে আবদার করে ঘোড়ায় চাপতে রাজি করানোই ছিল চেতনের কাজ। দিনের শেষে রাজুর কাছ থেকে এ জন্য কিছু টাকাও পাওয়া যেত যা দিয়ে মায়ের জন্য ওষুধ অথবা কিছু খাবারদাবার কিনে নিয়ে আসত চেতন। পাশাপাশি পাহাড় থেকে কাঠ কেটে এনে বিক্রি করাও ছিল অন্য একটা কাজ। পাহাড়ি বনের অনেক জায়গা এইভাবেই চেনা হয়ে গিয়েছিল চেতনের।

দিনের শেষে মায়ের পাশে বসে বিশ্রাম নেবার সময় মা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলত, 'এভাবে আর কতদিন কষ্ট করবি চেতন? তোর লেখাপড়ার কী হবে?'

চেতন মাকে বুঝিয়ে বলত, 'সব ঠিক হয়ে যাবে মা।' কিন্তু চেতনের ভীষণ কষ্ট লাগত যখন ও দেখত ওর পুরনো বইখাতাগুলো একপাশে পড়ে আছে। ওর মধ্যে আছে ওর প্রিয় গল্পের বইগুলো। সময়ের অভাবে আর সারাদিনের পরিশ্রমে ওগুলো আর ধরাই হয়ে ওঠে না চেতনের। ভীষণ কষ্টে ওর চোখে জল চলে আসত।

তাই মাঝে মাঝে চেতন চলে যায় ছোট্ট পাহাড়ি ঝরনার পাশের একটা জায়গায়। যেখানে বিছানো ছোটখাট পাথরে বসে ঝরনা আর পাহাড়ের সাথে চেতন এক হয়ে যায়। বন থেকে কেটে আনা জ্বালানি কাঠের বোঝাটা নামিয়ে রেখে চোখ বুঁজে আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে চেতন। ঝরনার জলধারার অস্পষ্ট কলকল শব্দ ছাড়া আর কিছুই কানে আসে না ওর।

শুধু, এখনো নতুন করে লেখাপড়া শুরু করার একটা ইচ্ছা ওর মধ্যে রয়েই গেছে,তাই এখনো নিকোলাস স্কুলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওর মনটা ভারী হয়ে আসে।

প্রায় আকস্মিক ভাবেই ঘটনাটা সেদিন ঘটে গেল। অন্যান্যদিনের মত কাঠের বোঝা নিয়ে পাহাড়ি পথ ধরে নেমে আসছিল চেতন। এই নেমে আসার কাজটা একটু কষ্টকর। কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে নামার সময় একটা নির্দিষ্ট ছন্দে দুই পা ফেলে এগোতে হয়। অন্য দিকে মন দেওয়া চলেনা। ওরই মধ্যে মাঝে মাঝেই দ্রুত বাঁক ঘুরতেও হয়। কিন্তু আজ কি কারণে যেন একটু অন্যমনস্ক ছিল চেতন, আর তাতেই অঘটন হয়ে গেল। একটা বড়ো পাথরে গুঁতো লাগতেই পা হড়কে পড়ল চেতন। বোঝাটা ছিটকে গেল, আর সে নিজেও কোথায় গিয়ে ছিটকে পড়ত কে জানে--। কিন্তু ঠিক সময়ে ওকে তুলে ধরলেন কেউ একজন। নয়তো কী হত কে জানে! কোনরকমে তাকিয়ে যাকে দেখলো তাকে স্বপ্নেও আশা করেনি চেতন---নিকোলাস স্কুলের ফাদার জোসেফ নিজে!

‘তোমার কি খুব লেগেছে সন?’

ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে ভীষণ ব্যথা অনুভব করলেও চেতন মুখে কিছু বললোনা। শুধু মাথা নেড়ে না জানাল।

কিন্তু ফাদার তাকে ছাড়লেন না। বললেন, ‘স্কুলের পাশেই আমার কোয়ার্টার। তুমি চলো আমার সাথে। একটু বিশ্রাম নেবে,’ বলে চেতনকে একরকম জোর করেই নিয়ে গেলেন, নিজে হাতে দারুণ চা করে খাওয়ালেন, পায়ের আঙুলে কী একটা ঠান্ডা ঠান্ডা মলম লাগিয়ে দিলেন।

সব মিলিয়ে চেতন তো বাক্যহারা! একটু পরে ফাদার নিজে চেতনকে ওর মার কাছে পৌছে দিয়ে গেলেন। বললেন,'ছেলেটাকে প্রায়ই দেখি ঝরনার ধারে বসে অনেকক্ষণ কী যেন ভাবে। জিজ্ঞাসা করব বলে আজকে যাচ্ছিলাম,হঠাৎ দেখি ও হোঁচট খেল---'

তারপর ফাদার অনেকক্ষণ ধরে চেতনের বিষয়ে ওর মার সাথে কথা বললেন। বললেন নিকোলাস স্কুলে চেতন যাতে বিনা পয়সায় পড়াশুনা করতে পারে তার ব্যবস্থা করবেন,তবে চেতনকে ভর্তির জন্য পরীক্ষায় বসতে হবে। তাই এখন থেকেই চেতনকে পড়াশুনা শুরু করতে হবে,আর যদি ও লেখাপড়ায় ভালো হয় আর পাশাপাশি ভদ্র ব্যবহারের পরিচয় দিতে পারে তাহলে ওর জন্য থাকবে স্কলারশিপের ব্যবস্থা।

ফাদারের কথাগুলো কেমন যেন স্বপ্নের মত শোনাচ্ছিল চেতনের কানে।

এরপর থেকে চেতন নতুন করে পড়াশুনা শুরু করলো। ফাদার মাঝে মাঝে এসে বিভিন্ন বইপত্র দিয়ে যেতে লাগলেন। নানান দরকারি পরামর্শ দিলেন। কিছু কিছু ভুল শুধরেও দিয়ে গেলেন। মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করার জন্য চেতন মাঝে মাঝে ওর প্রিয় পাহাড়ি ঝরনার ধারে চলে যেত আবার রাতেও অনেকক্ষণ পড়তো।

কিছুদিন বাদে একদিন সকালে ফাদার এসে বলে গেলেন, সামনের মাসেই ভর্তির পরীক্ষার তারিখ পড়েছে। চেতনের একটু ভয় ভয় করতে লাগল। আরো কত ছেলেমেয়েরা আসবে পরীক্ষা দিতে! যদি চেতনের পরীক্ষা ভালো না হয়,যদি কোন ভুল হয়ে যায়?

এইসব সময় ওর মা যেন কীভাবে ঠিক বুঝতে পারতেন! চেতনকে কাছে ডেকে বলতেন, 'কিছু ভাবিস না রে! তুই তোর পড়াটা চালিয়ে যা আর ভগবানকে ডাক, দেখবি তুই পারবিই।সত্যিই তো চেতনকে পারতে হবেই। মায়ের আশা ঠিকঠাক পড়া চালিয়ে যেতে পারলে সে হয়ত দার্জিলিঙ রেলে ওর বাবার থেকেও বড় কোন চাকরি পেয়ে যাবে। তবে চেতনের ইচ্ছে একজন ভালো শিক্ষক হওয়ার,ফাদার জোসেফের মত।

এসবের মধ্যেই এসে গেল দিনটা। এক রবিবারের ঝকঝকে সকালে দুরুদুরু বক্ষে চেতন হাজির হল নিকোলাস স্কুলের দরজায়। বড় উঁচু কড়িবরগার ছাদ দেওয়া বিশাল একটা হলঘরের দুপাশে বেঞ্চের সার। ঘরটা দেখতে অনেকটা চেতনের গ্রামের চার্চের মত, তবে তার চেয়ে অনেক বড়। একেবারে সামনের সারির একটা বেঞ্চে চেতনকে বসিয়ে দিয়ে গেলেন ফাদার জোসেফ। আশেপাশে চেতনের মত আরো অনেক ছেলেমেয়েরা বসে আছে। ঘরের দুপাশের দেওয়ালে প্রভু যিশুর অনেক ছবি রয়েছে। চেতনের মনে ভেসে উঠল ওর মায়ের মুখ। একটু পরেই একজন শিক্ষক এসে প্রত্যেকের হাতে একটা করে খাতা দিয়ে গেলেন আর বললেন, 'ঘন্টা পড়লেই উত্তর লেখা শুরু করবে তোমরা। তার আগে তোমাদের নাম,মা বাবার নাম আর ঠিকানা লিখে ফেলো সকলে।' চেতন লিখে ফেললো ওর নাম--চেতন থাপা। একটু পরে ঘন্টা পড়লো। ,চেতন লিখে চললো একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তর। দুনিয়ার আর সব কিছু ওর মন থেকে মুছে গেছে তখন। সব শেষের প্রশ্নটায় এসে চেতনকে থামতে হল একটু। প্রশ্নটা ছিলো, 'তোমার চোখে দেখা আদর্শ ব্যাক্তির নাম লেখ।'

একটু ভেবে নিয়ে চেতন লিখল, 'আমার মা আর ফাদার জোসেফ।'

এই প্রশ্নটার উত্তর লেখা শেষ হবার সাথে সাথে আবার ঘন্টা পড়লো আর আরো দুজন শিক্ষক এসে প্রত্যেকের খাতা জমা নিতে শুরু করলেন। খাতা জমা দিয়ে চেতন বাড়ি ফিরে গেল। পরের দিন

জানা যাবে পরীক্ষার ফলাফল। সেদিনের বাকি সময়টা চেতনের কাজ কর্ম মাথায় উঠলো। সে শুধু মায়ের পাশে বসে ভাবতে লাগলো কী হবে কালকে? কে জানে!

পরদিন সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। কাছে-দূরের সব পাহাড়ের গায়ে মাথায় জমে আছে মেঘ আর কুয়াশা। আর, সাথে সাথে আছে বৃষ্টিও। চেতনের মনটা খারাপ হয়ে গেল। এমনিতেই ওর আজকে কোথাও বেরোতে ইচ্ছা করছিল না, কিন্তু জ্বালানি কাঠ প্রায় নেই আর ঠান্ডাটাও বেশ লাগছে। তার ওপর আজকেই তো নিকোলাস স্কুলের রেজাল্ট! ইসস কী যে হবে কে জানে? কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে বসে এসব সাতসতেরো ভাবছিলো চেতন, ভাবতে ভাবতে---সামনে ওর বাবার ছবি--সেই ছবিটার দিকেই তাকিয়ে ছিল চেতন। পাশে বসে মা কী যেন একটা কথা বলছিল ওকে। ঠিক কানে ঢুকছিল না চেতনের। ঠিক সেই সময়েই বাইরে একটা ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। সেইসঙ্গে চিৎকার-- চে--তন , এ চে-ত-অ-ন--' একটু বাদেই রাজু এসে ছুটে ঢুকলো ঘরের ভেতরে। লাফ মেরে কম্বলটা ফেলে উঠল চেতন - রাজুদা কী হয়েছে! খবর কী? রাজু ছুটে এসে চেতনকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'চেতন তুই পেরেছিস,তুই পেরেছিস,নিকোলাস স্কুলে তুই ঢুকে গেছিস,এখন থেকে তুই নিকোলাস স্কুলের ছাত্র...'

রাজুর চেঁচামেচিতে আরো লোকজন এসে জড়ো হলো। সবাই শুনতে চায় কী হয়েছে। রাজু নিজেই যেন পরীক্ষায় পাশ করেছে এমনিভাবে সে চিৎকার করে সকলকে বলতে লাগল, 'আমাদের চেতন নিকোলাস স্কুলে যাবে এখন থেকে। শুধু তাই নয়, পরীক্ষায় ও খুব ভালো ফল করেছে বলে ওর কোন বেতন লাগবে না। পরে হয়ত ও বৃত্তিও পাবে। একমাত্র চেতনই চুপচাপ বসে ছিল ওর মায়ের হাতটা ধরে। মায়ের চোখে জল। জল চেতনের চোখেও।

হঠাৎ বাইরে আর একটা পরিচিত গলার স্বর পাওয়া গেল, 'কোথায়? চেতন কোথায়?' বলতে বলতেই ভিড় সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন ফাদার জোসেফ। চেতন ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই তিনি চেতনকে জড়িয়ে ধরলেন। অশ্রুপূর্ণ চোখে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি পেরেছ মাই চাইল্ড, তুমি পেরেছ। তোমাকে অনেক বড় হতে হবে,আমি জানি তুমি পারবে।'

ফাদারের কথার ফাঁকেই দূরের নীল পাহাড়ের কুয়াশা ধীরে ধীরে কেটে গিয়ে দেখা দিল এক চিলতে সূর্যালোকের রেখা। চেতনের মনে হল ওর বাবা আর দাদু যেন ওই আলোর মধ্যে দিয়ে ওকে আশীর্বাদ করছেন দুহাত তুলে।

ছবিঃ মৌসুমী

গল্প

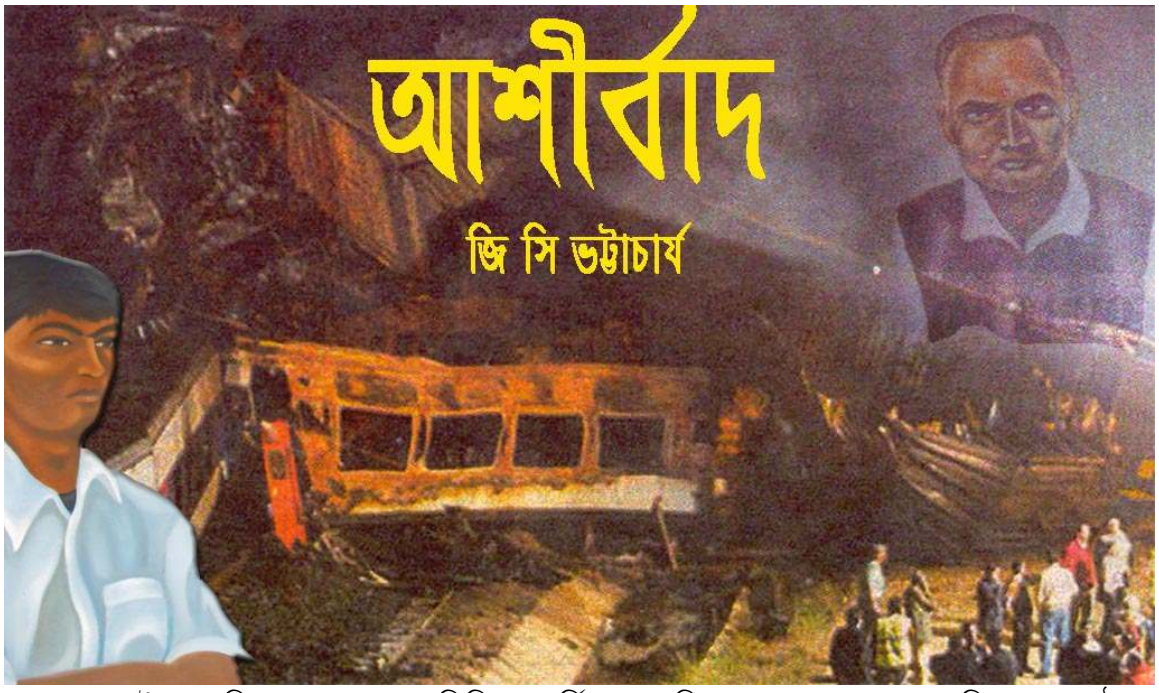

গল্পটা বলেছিল আমার এক সিভিল সার্ভিসের অফিসার বন্ধু। তার নাম বিমলেন্দু পাঠক। হিন্দুস্তানি ব্রাহ্মণ, কি সরযূপারিণ না কি যেন বংশ, তবে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। ছেলেবেলায় ওর সাথে আমি পড়েছিলাম বটে তবে আমার খুব একটা মনেও ছিল না বিমলের কথা, সত্যি বলছি। ওর কিন্তু দিব্যি মনে ছিল। এমনকি লুকিয়ে অন্য লোকের বাগানে গিয়ে একসাথে কুল চুরি করে খাবার এবং ধরা পড়ে আমাদের প্রহরেণ ধনঞ্জয় হবার ঘটনাটি পর্যন্ত ও ভুলে যায়নি। প্রায় বছর বিশেক পরে দেখা হতে ও ঠিক চিনতে পেরেছিল আমাকে ।

দিল্লিতে একট কাজে রেল মন্ত্রালয়ের সেক্রেটারিয়েটে গিয়েছিলাম, তা সামান্য মাস্টারকে সেখানে দেখি কেউ পাত্তাই দিতে চায় না। কর্তার ঘরে স্লিপ পাঠিয়েও লাভ হল না। সব দেখে শুনে হতাশ হয়েই ফিরে আসছিলুম আমি। কিন্তু লিফটে ঢোকবার আগেই শুনি কে যেন ডাকছে, 'স্যর স্যর একমিনিট দাঁড়ান স্যর প্লিজ।'

মনে ভাবলুম কে রে বাবা, এখানে আমাকে স্যর বলে ডাকছে হঠাৎ ! ও হরি, এ তো দেখি সেই কর্তার ঘরের চাপরাশি, হনুমান সিংহ বা তেমনিধারা কী যেন নাম, ঠিক মনে নেই এখন আমার। এই লোকটাই তো আমার কোন কথাই যেন এতক্ষণ শুনতেই পাচ্ছিল না! তা হঠাৎ হলটা কী? ভাবলাম, জয়গুরু! দেখাই যাক, যখন নিজে থেকে এত করে ডাকছে, একেবারে ছুটে এসে----

'কী বলছ?' জিজ্ঞাসা করলুম আমি।

'আপনাকে আমাদের স্যর মানে সেক্রেটারি সাহেব ডাকছেন। একটু শুনে যান, স্যর নইলে রাগ করে আমাকে সাসপেন্ড করে ছাড়বেন। ভীষণ কড়া লোক, স্যর। রেলমন্ত্রীকেও ভয় করেন না উনি স্যর।'

সে যাই বলুক তখন, সেসবে কান দিলুম না। তবে আজকালকার যুগে এহেন আমলাটিকে একবার চাক্ষুষ দেখতে ইচ্ছে হল আমার, যে তার কর্তাকেও পরোয়া না করে চাকরি করে খাচ্ছে। বললুম, 'বেশ চল, যাচ্ছি।'

তখনি সে শশব্যস্ত হয়ে আমাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করল এক এসি করা বিরাটা কার্পেট পাতা ঘরে। দরজাতে নক করে বলল, 'স্যর, ডাক্টরসাহেব এসে গেছেন।'

কাচে ঢাকা, অর্ধচন্দ্রাকার বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে চশমা চোখে গোটাতিনেক নানারঙের ফোন, রঙিন মনিটর ও ডেস্কটপ কমপিউটার নিয়ে গম্ভীর প্রকৃতির এক ভদ্রলোক বসে কাজ করছিলেন। তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানিয়ে বিনা ভূমিকায় জিজ্ঞেস করলেন, 'চিনতে পারছেন আমাকে?' আমিও তক্ষুণি সেইভাবেই উত্তর দিলাম, 'মোটেই না।' স্যারও বললুম না। শুনেই তিনি বলে উঠলেন, 'তবু ভালো যে সত্যি বলতে সময় লাগেনি আপনার, স্যর স্যার করেও অস্থির করেননি। স্লিপটা একটু দেরিতে চোখে পড়ল; আপনার নামটা দেখেই অনুমান করেছিলাম। এখন চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হল। চিনেছি আপনাকে, অধীনের নাম বিমলেন্দু পাঠক। ক্লাস ফাইভেতে আপনার সাথে পড়বার সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের গ্রামের স্কুলে। আপনার বাবা আমাদের সেই গ্রামে পোস্টমাস্টার হয়ে গিয়েছিলেন বদলি নিয়ে। কি? মনে পড়ছে?

বলেই সে এক লাফ মেরে টেবিল ঘুরে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরতেই আমার সব কথা একে একে মনে পড়ে যেতে লাগল। বললুম, ' হ্যাঁ, মনে থাকবে না আবার! যে অপদার্থ বিমুর হোমটাস্কের সমস্ত অঙ্ক করে দিতে হত আমাকে, নইলেই দেবেন স্যারের বেতের ঘা বাঁধা ছিল তার জন্য। কি ভাগ্য, সে আজ এতো বড় অফিসার আর আমি সামান্য মাস্টার। ভগবানের কি বিচার!'

হা: হা: করে হেসে উঠে সে বলল, 'কেন, বিচার খারাপ কিসের হল? আমি যতই সরকারি অফিসার হই না কেন, গুরুজি বলে কেউ আমাকে প্রণাম করে না এসে তা জানিস? বড়জোর ঘুষ দিয়ে যেতে পারে ব্রিফকেস ভর্তি হাজার টাকার নোট এনে। আমি তা-ও নিই না, ফলে না ঘরকা না ঘাটকা অবস্থা। তুই তখনও আমার গুরু ছিলিস এখন তো তুই প্রফেসর ডক্টর মানুষ, মানুষ গড়ার টেকনোলজিস্ট, বা হিউম্যান ইঞ্জিনিয়ার। যেমন চাইবি তেমন দেশ তৈরি হবে। কে চ্যালেঞ্জ করবে তোকে?

' আ: খালি কথাতেই গাছে চড়বি, বসতেও বলবি না?'

'তা এখানে বসবি কেন? বাড়ি চল। তা তোর কাজটা কী ছিল এখানে বল তো?'

বললুম। শুনে বলল, 'দে, কাগজপত্র সব দেখি।' বলেই বেল বাজাল বিমল।

একটা লোক ভেতরের দিকের একটা কাচের দরজা খুলে এসে বলল, 'ইয়েস স্যার।'

'এই কাগজগুলো সব দেখে আমার বন্ধুর কাজটা করে চেকটা বাড়িতে এনে দিও। আর জোসেফকে বলে দাও রিং করে গাড়ি বার করতে। লাঞ্চ আওয়ারে আজ আমার বন্ধুকে নিয়ে বাড়ি যাব, ও কে?'

'ও শিওর স্যর।'

তারপর আর কি। সেক্রেটরি সাহেবের সাথে এসি করা দামি গাড়িতে চড়ে তার বাংলোতে গিয়ে লাঞ্চ সারা হল। বিমলের পরিবারের সকলের সাথে পরিচয়াদিও হল। তারপর তার বেডরুমে গিয়ে নরম গদিমোড়া খাটে উঠে শুয়ে একটু বিশ্রামও করে নিলুম চেকের অপেক্ষাতে।

বিকেলে বিমল অফিস থেকে ফিরে ঘুম ভাঙাল। বেডরুমের খাটের ঠিক সামনের দেওয়ালে একটা বাঁধানো ফটো দেখে অনেকক্ষণ থেকেই বেশ চেনা মতন লাগলেও ঠিক চিনে উঠতে পারছিলাম না। বিমলকে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে ফেললুম, 'বিমল, ওই ফটোটা কার রে?'

‘কেন? চিনতে পারছিস না? দেবেন স্যরের। আজ আমি যা কিছু হয়েছি, সব স্যারের কৃপাতেই তো। সব গুরুজির আশীর্বাদের ফল। নইলে আমি তো ছিলুম গবেট নম্বর ওয়ান। তুই তা জানিস সবচেয়ে ভালো করে। স্যর আমার প্রাণরক্ষাও করেছেন তা হয়তো এখনো জানিস না।’

‘অসম্ভব! স্যর তোর প্রাণ বাঁচালেন কখন আর কী করে? তুই গিয়েছিলিস নাকি গ্রামেতে?’

‘বললে বিশ্বাস করবি না। আমি ট্রেনিং নিয়ে কাজে জয়েন করবার ঠিক আগে আমাদের গ্রামে গিয়েছিলাম মা বাবার আশীর্বাদ নিতে। সঙ্গে নীলম রায়ও ছিল। সেবার আমাদের স্টেট থেকে মাত্র আমরা দুজন সিলেক্ট হতে পেরেছিলাম।

‘মাত্র একদিন সময় ছিল হাতে। বাড়ির, জ্ঞাতি আর অন্যান্য নিকট আত্মীয়দের সবার সাথেই দেখা সাক্ষাৎ করা হয়ে উঠল না, তো পাড়াপড়শি তো দূরস্থান। অনেকে নেওতা পাঠিয়েছিলেন, সে’সবও বাদ পড়ল সময়াভাবে।

‘পরদিন সাতটা বাজতে না বাজতেই তৈরি হয়ে একেবারে জিনিসপত্র নিয়ে রায় এসে তাড়া দিতে শুরু করে দিল। চার ক্রোশ দূরে স্টেশন। গ্রামের পথে গরুর গাড়ি ভরসা বলে সময় লাগবে অনেক। আমি তাড়াতাড়ি করে তৈরি হয়ে নাশতা সেরে নিলুম বন্ধুর সাথে। দেরি হবার ভয়ে ও রাজি হচ্ছিল না। তখন আমার বাবুজি বললেন, ‘আরে বাবুয়া কর লে নাশতা বেটা বেফিকর হোকর, হামার অফসর বেটা কি বৈলগাড়ি সে জাই, এ রামুয়া, হামার কার নিকাল লে আও আভি জা কে, জলদিসে।’

‘আমি ট্রেনিং-এ চলে যাবার পরই যে বাবুজি মোটরগাড়িও কিনে ফেলেছেন আমি তাও জানতুম না। বাবুজির হেভি সম্মান তখনই গ্রামে।

‘বড়দের চরণ স্পর্শ করে ও ছোটোদের স্নেহ জানিয়ে শুভযাত্রার জন্য গ্রাম্য রীতি-রেওয়াজ মেনে কোনমতে জিনিসপত্র নিয়ে কার ছাড়তেই ন’টা হল প্রায়। দশটাতে তুফান মেল। মাত্র দু মিনিট থামে। ধুলোর ঝড় তুলে মাটির পথ ধরে কার ছোটাল রাম সিং।

প্রায় অর্ধেক পথ পার হয়েছি, হঠাৎ দেখি পথের ধার ঘেঁষে একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ লাঠি ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন। চেনা মনে হতে প্রথমে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলুম। সে গা করলো না দেখে রামচাচাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বললে, ‘আরে বেটা উনি তো দেব মাস্টারজি। রিটায়ার হয়ে গেছেন পাঠশালা থেকে পাঁচমাস আগে, সামান্যই পেনশন পাবার কথা, তাও পাননি এখনও অবধি। একমাত্র ছেলে রাজেশ শুকুল তো দিল্লিতে বড়ো স্কুলে পড়ায়। না আসে ঘরে, না দেখে বুড়ো বাপ মাকে। বিয়ে থা করে বৌ ছেলে মেয়ে নিয়েই সে ব্যাতিব্যস্ত , পয়সাকড়ি দিয়েও সহায়তা করে না, তাই তো উনাকে রোজ যেতে হয় স্টেশনের কাছে এক শেঠজির আড়তে হিসাব লিখবার কাজ করতে। তাও চারশোর বেশি দেয় না কঞ্জুষ শেঠজি। কোনমতে দিন চলে যায়। কী-ই বা করবেন এই বয়েসে?

শুনে বললুম, ‘গাড়ি থামাও চাচা, আমি একটা প্রণাম না করে, গুরুজির গায়ে ধুলো, ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে তাঁকে ডিঙিয়ে কখনো যাবো না। গুরুজিকে উল্লংঘন করে চলে যাওয়া পাপ।’

যেহেতু গাড়িটা আমার বাবুজির, কাজেই তৎক্ষণাৎ ব্রেক কষল ড্রাইভার। দারুণ রেগে গেল আমার বন্ধু তা দেখে। বলল, ‘তুই কি পাগল হয়েছিস বিমু, কে না কে এক বুড়ো পাঠশালার মাস্টার ছেলেবেলায় পড়িয়েছে, তো তাতে হয়েছেটা কী শুনি? অমন কত টিচারই তো পড়িয়েছে আমাদের, তবে সবাইকে গুরু মেনে পুজো করতে হয় রকে বসে বসে! ছি:, পড়িয়ে পয়সা নেয় যারা তারা তো চাকর, চাকরি করে খায়। তাও যদি বা হত কোন অফিসার, তাহলেও না হয় একটা কথা ছিল একটা। এ লোকটা তো একেবারে ভিখমাঙা। তার ওপর স্কুলটা তো তোর ঠাকুরদাদার পয়সাতেই তৈরি!’

‘তুই তর্ক রাখ। নাম, প্রণাম করেই ফিরব।’

‘কভি নেহি। সুটেড বুটেড অফিসার হয়ে আমি ওই ভিখমাঙার ধুলোভর্তি পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যাই আর কি এখন! আর ওই বুড়োকে চিনিস না। এখুনি এমন ছিঁচকাঁদুনি গাইতে শুরু করবে ছেলে বৌয়ের দোষ গেয়ে যে এক ঘন্টাতেও তুই পার পাবি না। আসলে যদি কিছু আদায় করতে পারে, সেই ধান্দা আর কি। নিতে হলে তুই তোর গুরুর পায়ের ধুলো নে গিয়ে। আমি নিজের জিনিসপত্র নিয়ে হেঁটে স্টেশন চলে যাচ্ছি। আমি ট্রেন ফেল করতে মোটেই রাজি নই। কাল আমাকে জয়েন করতেই হবে। নইলে সিনিয়রিটি নষ্ট হবে, ব্যাচের সবার জুনিয়র হয়ে যেতে হবে। তা অসম্ভব।’

উপায় নেই দেখে বললুম, ‘থাক, নামতে হবে না তোকে। ধুলোয় ভরা পথ। সুটবুট সব নষ্ট হয়ে যাবে তোর শেষে। হাঁটলে তো আর দেখতেই হবে না। তার চেয়ে এক কাজ করো তুমি চাচা, বন্ধুকে আগে ছেড়ে দিয়ে এসে, তারপর আমাকে নিয়ে যেও।’

আমি দরজা খুলে নেমে পড়লুম। গাড়ি চলে গেল।

ধীর গতিতে নিজের মনে হেঁটে চলেছেন স্যর। আমি গিয়ে নীচু হয়ে প্রণাম করলুম তাঁর চরণে। জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কে বাবা তুমি , ঠিক মনে করতে পারছি না, বুড়ো হয়ে পড়লে যা হয় আর কি!’

বললুম, ‘আমি বিমল, আপনার ছাত্র, প্রাইমারিতে পড়াতেন, অমনোযোগী ছিলুম বলে আমাকে আপনি নালায়েক বলতেন আর পড়া না করলেই ছিল বেত। অনেকদিনের কথা , আপনার মনে থাকবার মতন কথা ও নয়। কত কত ছাত্রকে পড়িয়েছেন আপনি সারা জীবনে স্যর।’

‘তুমি পাঠকদের বড়োছেলে নাকি?’

‘হ্যাঁ স্যর।’

‘ও। তা এখন কী করছ তুমি?

‘চাকরিতে জয়েন করতে যচ্ছি কাল, আমাকে একটু আশীর্বাদ করুন যেন লায়েক হয়ে উঠতে পারি। একটুমাত্র! আপনি বললেই হবে।’

‘কী আর হবে বাবা, আমি যে ভুল বলতুম তা তো তুমি প্রমাণ করেই দিয়েছ লায়েক হয়ে। তা কী চাকরি পেয়েছ বাবা?’

সব বললুম একে একে তখন। শুনে স্যর চুপ করে রইলেন একটুক্ষণ। তারপরে বললেন, ‘এসো, একটু সময় গ্রামের পথের ধারে বট গাছের নীচে ওই বেদিটতে বসে যাও। আসলে বয়স হয়ে আর এখন একটানা চার কোশ পথও হাঁটতে পারিনা, একটুতেই হাঁফিয়ে পড়ি। তা তুমি অনেকদিন পরে এলে বলে মনে হচ্ছে আমার। কবে এলে গ্রামে?’

‘কাল স্যর। আর আজই ফিরে যেতে হচ্ছে আবার। সময় দেয়নি বেশি।’

‘কোথায় জয়েন করতে হবে গিয়ে তোমাকে?’

‘দিল্লিতে স্যর, রেল দপ্তরে। ’

‘ও। তা দিল্লিতে আমার ছেলেও রয়েছে। লায়েক হয়েছে। পাক্কা কেরিয়ারিস্ট। মা বাপকেও ভুলে গেছে। তুমি তো তবু এতদিন মনে রেখেছে তুচ্ছ এক গ্রাম্য পাঠশালার মাস্টারকে। সে যাক গিয়ে। গামছা পেতে দিয়েছি, তুমি বসো বাবা।’

‘সেখানে বসে অনেক কথা হল। শেষে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমার দেরি হয়ে গেল না তো বাবা আমার জন্যে? তা যাবেই বা কী করে একন এই দুক্রোশ রাস্তা?’

‘গাড়ি আসছে আমার জন্য। ততক্ষণ যদি অনুমতি দেন তো একটা কথা বলতে চাই স্যর।’

‘বল বাবা।’

‘আপনি এই বয়েসে রোজ আটক্রোশ পথ আসা যাওয়া করে এই সামান্য কাজ করবেন এটা বড়ই খারাপ লাগে, বিশেষ করে আপনার এত উপার্জনক্ষম ছাত্র থাকতে। ভারতীয় পরম্পরা অনুযায়ী তো পুত্র আর ছাত্রে কোন ভেদই নেই। পুত্রের একটা অধিকার যদি চাই আমি তাহলে দেবেন স্যর?’

‘অবশ্য করে চাও, বাবা।’

‘আপনি কাল থেকে আর এই কাজে যাবেন না স্যর। আপনি মানুষ গড়বার কারিগর, এ কাজ তো আপনার জন্য নয় স্যর।’

তিনি হেসে বললেন, ‘ বাবা, তুমি আজ বড়ো হয়েছ, বিদ্বান ও বুদ্ধিমানও হয়েছ। তোমার বিনয়েই তার প্রমাণ। আমি আর কী বলব বল? তবে বাবা জানো তো, পেটের দায়ে যে কাজ যখন মেলে তাই করতে হয়। মানুষ চাকরি থেকে অবসর পায় বুড়ো হলে। কিন্তু পেট তো অবসর নেয় না, বাবা। আর সারাদিন ঘরে বসে থেকেই বা কী করব বল? জমিজমাও তো নেই কিছু আমার যে সে সব দেখব বসে বসে বসে।’

‘তার দরকারও কিছু নেই। স্যর, জানেন তো গ্রামে দেহাতে অল্পবয়েসেই বিয়েথা, ছেলেপুলে সব হয়ে যায়। বিশেষ করে আমাদের মত যাদের জমি জমা থাকে। আমারই তো দুটো ছেলে রয়েছে বাড়িতে। ভাতিজাও আছে। ওদের বিকেলবেলা রোজ ঘন্টা দুই পড়িয়ে দেবেন আপনি। সকালে একটু বেড়িয়ে নেবেন। ওদের শিক্ষার বুনিয়াদটা আপনি একটু মজবুত করে দিলেই মানুষ হতে পারবে পরে। কোথাও যেতে হলে কিষণের বৈল গাড়িতে করেই যাবেন, আমি বলে দেব। ওর যা প্রাপ্য হবে তা পেয়ে যবে। আপনাকে আমি মাসে এক হাজার টাকা করে গুরু দক্ষিণা আপাতত পাঠিয়ে দেব। আপনি যেন না করবেন না স্যর। ব্যস একটু আশীর্বাদ দিন আমাকে।’

তিনি বললেন, 'দীর্ঘজীবি হও তুমি বাবা, এই আশীর্বাদই করছি তোমাকে আবার।'

আমি বললুম, 'আপনি গাড়িতে উঠুন স্যর। ওই যে এসে গেছে। চাচা, গাড়ি ঘুরিয়ে নাও আগে, আর সন্ধেবেলায় এসে স্যরকে নিয়ে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসবে আজ। ইনি আমার কমল ও রাতুলকে পড়বেন কাল থেকে।'

'স্টেশনে গিয়ে হজির হলুম যখন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ট্রেনও চলে গেছে বন্ধুকে নিয়ে। আমার ফার্স্ট ক্লাস এসি কোচের টিকিট জলসই হল। সে যাক গিয়ে না হয়। তবে যেতে তো হবেই। কী করি, গিয়ে ধরলুম স্টেশনমাস্টার পান্ডেজিকে।

পরিচয় তো ছিলই, সব শুনে বললেন, ' তা তোমার ড্রাইভার কেমন লোক বল দেখি? আরে তোমার যে আসতে একটু সময় লাগবে সেটা এসে আমাকে বলে যেতে কী হয়েছিল শুনি? এমন দরকার জানলে কখনো সিগনাল দিই গাড়ির? টেকনিক্যাল ফল্ট দেখিয়ে দিতুম না! আরে রেল মন্ত্রালয়ে জয়েন করলে তো তুমিও মন্ত্রীর সাথে সেলুন পাবে।'

হেসে বললুম, 'না না সে'সব পায় চিফ সেক্রেটারি বা প্রিন্সিপাল সেক্রেটরি।'

তিনি মাথা নাড়লেন, 'ওই হল, ওই একই কথা। যার নাম চালভাজা তার নামই মুড়ি। আজ সেক্রেটরি তো কাল চিফ সেক্রেটরি। এখন আমার গ্রামের একটা ছেলে যদি জয়েন না করতে পেরে ব্যাচের মধ্যে জুনিয়র হয়ে যায় তাহলে তো বড়ো লজ্জার কথা হয়! বিশেষ করে আমি যেখানে সেই রেলেরই ও সেই গ্রামেরই স্টেশনমাস্টার। দাঁড়াও দেখি। একটা ইঞ্জিন যাবে পরের জংশন অবধি। একদম থ্রু, কেননা ওখানের শান্টিং ইঞ্জিনখানা অকেজো হয়ে পড়েছে। যত তাড়াতাড়ি পারে যেতে বলা হয়েছে। লাইন ক্লিয়ার দিয়ে যবে মাঝের সব স্টেশন একের পর এক। আমি বলে দেব ফুলস্পিডে যেতে। মনে হয় তোমার তুফান এক্সপ্রেসকে ধরিয়ে দিতে পারবেই।'

'তা তখন সেই ব্যবস্থাই হল। আমিও মা দুর্গার নাম করে উঠে পড়লুম ড্রাইভারের কেবিনে। ইঞ্জিন গতি নিলো এবং স্পিড ক্রমেই বাড়তে শুরু করল। যেন এখনকার দুরন্ত ট্রেন। দেখতে দেখতে গতিবেগ একশোর কোঠায় গিয়ে ঠেকল।

একঘন্টার পথ আধঘন্টারও কম সময়ে পার হতে সচেষ্ট হয়ে উঠল আমাদের ইঞ্জিনখানা। একের পর এক স্টেশন যেন উড়ে চলে যেতে লাগল। আরও দশ মিনিট পরে, গতিবেগ যখন আরও প্রবল হয়ে উঠেছে, তখন দারুণ ঝাঁকুনি লাগল একটা।

কী হয়েছে জানবার আগেই স্পিড কমতে শুরু করল ট্রেনের। এমার্জেন্সি ব্রেক কাজ করছে তখন ইঞ্জিনখানাকে প্রাণপণে থামাবার জন্যে। কেননা সামনে হঠাৎ করেই জেগেছে সিগনালের রক্তচক্ষু।'

নেমে খোঁজ নিয়ে যা জানা গেল, তা মর্মান্তিক। লাইন বন্ধ, কেননা দারুণ একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে সেখানে। একটা দাঁড়িয়ে থাকা লোকাল ট্রেনকে গিয়ে পেছন থেকে ধাক্কা মেরেছে দিল্লিগামী তুফান মেল। অনেক লোক মারা গেছে।

'দুর্ঘটনার স্থানকে কর্ডন করে ঘিরে রেখেছে রেল পুলিশ ও লোকাল পুলিশের দল। বাধ্য হয়ে ইঞ্জিন ব্যাক করে পেছনের বড়ো স্টেশনে এসে লাইন বদলে অনেক ঘুরপথে গন্তব্যে যখন হাজির হল আমাদের ইঞ্জিনখানা তখন সেখানে একটা দিল্লিগামী স্পেশাল এক্সপ্রেস ট্রেন পেয়ে তাইতে উঠে বসলুম টিকিট কেটে। একটা বার্থ খালি থাকার দরুণ টি টি ই সাহেব রিজার্ভেশনও পাইয়ে দিলেন। গাড়িতে

খাবার, ব্রেকফাস্ট, সবই পাওয়া গেল। আরাম করে শুয়ে ঘুমিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আমি দিল্লি গিয়ে পৌঁছে গেলাম, ও যথা সময়ে কাজে গিয়ে জয়েনও করলুম বিনা বাধায়।

তবে হ্যাঁ, তুফান মেল-এ চড়তে যাওয়া আমার সেই বন্ধুটি কিন্তু আর কোনদিনই আসেনি তার অত সাধের চাকরিতে জয়েন করতে।'

ছবি : সৌভিক

টিঙ্কি, টান্টু আর খেঁকুড়েরা

অনন্যা দাশ

টিঙ্কি আর টান্টু সেদিন সকাল থেকেই খুনসুটি আর ঝগড়াঝাঁটি করছিল। মা যতক্ষণ বাড়িতে ছিলেন ততক্ষণ বকেঝকে ওদের শান্ত করে রেখেছিলেন কিন্তু রবিবার দিন দুপুরবেলা মা পাশের বাড়ি মিনুমাসিদের বাড়িতে যেতেই দুজনে শুরু হয়ে গেল! টান্টু টিঙ্কির চুল ধরে টানতেই টিঙ্কি ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে কাঁদতে বাবার কাছে নালিশ করতে ছুটল। বাবা টান্টুকে এক ধমক দিলেন। তাতে সে বেদম খেপে গিয়ে রেগে মেগে টিঙ্কির আদরের পুতুল ঝুমার জামায় কালি মাখিয়ে দিল। টিঙ্কিও ছাড়বে না! টান্টুর প্রিয় খেলনা গাড়িটাকে তিনতোলার ব্যালকনি থেকে দিল নিচে ফেলে। ব্যাস, সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে ধুন্ধুমার লেগে গেল। রবিবার দুপুরবেলা বাবা খেয়ে দেয়ে একটু শুয়েছিলেন এমন সময় ওদের প্রবল ঝগড়াঝাঁটির শব্দে ওঁর ঘুম ভেঙে গেল।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করতে ওরা দুজনেই ক্রমাগত নালিশ করে চলল। বাবা বললেন, 'কতবার বলেছি এই রকম মারামারি করলে খেঁকুড়েরা এসে ধরে নিয়ে যাবে! তোমরা নিশ্চয়ই সেটা চাও না? যদি না চাও তাহলে চুপ করে যে যার নিজের মতো খেলা কর। আমাকে একটু ঘুমোতে দাও, বিরক্ত কোর না।' বলে বাবা পাশ ফিরে শুয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। মা তখনও মিনুমাসির বাড়ি থেকে ফেরেননি। টিঙ্কি আর টান্টু কিন্তু বাবার কথা শুনেও ক্ষান্ত হল না। আবার ঝগড়া শুরু করে দিল। টান্টু টিঙ্কিকে ঠেলে ফেলে দিল, টিঙ্কি ক্যাঁক করে ওর হাতে কামড় বসিয়ে দিল।

খামচা খামচি চুলোচুলি যখন পূরোদমে চলছে ঠিক তখনই লোকদুটোকে দেখতে পেল ওরা। বিশাল বড়ো চেহারা, ইয়া ইয়া গোঁফ, ঝাঁকড়া চুল আর ওদের দেখে খ্যাক খ্যাক করে হাসছে। টিঙ্কি

আর টান্টু কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওদের এমনভাবে তুলে নিল যেন ওরা পালকের মতো হালকা।

তারপরেই সাঁ সাঁ করে দৌড় দিল দুজনে। টিঙ্কি আর টান্টু চিৎকার করারও সময় পেল না। চোখের নিমেষে ওদের দুজনকে খেঁকুড়েদের দেশে নিয়ে গিয়ে ফেলল ওই দুজন। সেখানে চারিদিকে খেঁকুড়ে, মা খেঁকুড়ে, বাবা খেঁকুড়ে বাচ্চা খেঁকুড়ে। ওদের দেখে সবার জিভ লকলক, লালা টপটপ।

একজন তো বলেই ফেলল, ' যাক অনেকদিন বাদে দুটো ঝগরুটে নালিশকুটে বাচ্চা পাওয়া গেছে। আহা কত দিন খাইনি! শেষ যেবার খেয়েছিলাম তার স্বাদ এখনও মুখে লেগে রয়েছে।'

টিঙ্কি আর টান্টুতো ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ওরা একবারের জন্যেও যে ভাবেনি যে বাবা যেটা বলছেন সেটা ঘটে যেতে পারে! ওরা তো উল্টে ভাবছিল যে বাবা ওদের থামানোর জন্যে মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলছিলেন! ওরা তো বুঝতেই পারছিল না এবার কী হবে।

ওদের দুজনের হাত পা বেঁধে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসাল। সেখানে বিশাল আগুনের ওপর একটা হাঁড়িতে জল ফুটছে।

একজন বলল, 'এদেরকে কুচি কুচি করে কেটে বেশ টক ঝাল নুন মিষ্টি দিয়ে রান্না করে খেলে ভাল হবে দারুণ জমবে।'

আরেকজন মুখ ভেংচে বলল, 'অত ঝামেলার কী দরকার? কাটাকুটিতে সময় লাগবে, দিব্যি রুটিতে মুড়ে রোল করে খেয়ে নিলেই তো হয়। দরকার হলে স্বাদের জন্য একটু ডিম মাখিয়ে নিলেই হবে।'

কয়েকটা বাচ্চা দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'না না বড্ড গরম পড়েছে। ওদের ফ্রিজে রেখে দাও। আইসক্রিম হয়ে গেলে চুষে চুষে খাবো।'

সেটা শুনে আবার অন্য কয়েকজন লাফিয়ে উঠল, 'না না বাপু আমাদের ঠান্ডা সহ্য হয় না। দাঁত কনকন করে সর্দি লেগে যায়।

টিঙ্কি আর টান্টু মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। এদের গতিক তো ভাল ঠেকছে না। কী করা যায়?

টিঙ্কি টান্টুকে বলল, 'তোর গাড়িটা ব্যালকনি থেকে ফেলে দেওয়া আমার উচিত হয়নি। আমি সরি। জন্মদিনে যে টাকা পেয়েছি সেটা দিয়ে আমি তোকে ওই রকমই একটা গাড়ি কিনে দেব।'

টান্টুও নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে, ' না, সবটাই তোর দোষ নয়! আমিই তো তোর ঝুমা পুতুলকে কালি মাখিয়ে দিয়েছিলাম। আমি মাকে বলব ওর জামাটা কেচে দিতে, তাহলে মনে হয় কালিটা উঠে যাবে। না হলে তোয়ার দিদি ভালো জামা সেলাই করতে পারে, তাকে বলব ঝুমার জন্য একটা নতুন জামা বানিয়ে দিতে।'

'সত্যি বলবি তো?'

'হ্যাঁ নিশ্চই।'

এদিকে খেঁকুড়েরা তখনও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে চলেছে, 'একটু টক দিলে ভালো লাগবে।' ওদের একজন বলল।

আরেকজন খেঁকিয়ে উঠল, 'না না আমার আবার টক খেলে অম্বল হয়। একটু তেতো দিও বরং ভায়া আমার জন্যে।'

'ওয়াক! তেতো দিয়ে সমস্ত জিনিসটাই মাটি করা যাক আর কি! কি আক্কেল!'

ওরা কিছুতেই ঠিক করতে পারছে না, ডুমো ডুমো করে কেটে ডালনা হবে না কুচি কুচি করে কেটে চচ্চড়ি হবে। তুমুল গন্ডগোল বেঁধে গেল ওদের মধ্যে। বয়স্করা ঝগড়া করতে লাগল শুক্তো হবে না অম্বল হবে! কচিকাঁচারা কথা কাটাকাটি করে চলল আইসক্রিম হবে না বার্গার হবে না রোল হবে সেই নিয়ে। সেটা শুনে আবার বয়স্করা খেপে গেল, 'ওগুলো আবার খাবার নাকি?'

টিঙ্কি আর টান্টু এদিকে চুপ করে বসে আছে ভয়ে। ওরা সরি বলেছে একে অপরকে। আর কোনদিন ওইরকম ভাবে ঝগড়া করবে না সেই কথা দিয়েছে।

খেঁকুড়েরা প্রায় হাতাহাতিতে নেমে পড়েছিল এমনসময় ওদের একজন হঠাৎ বলল, 'আরে বাচ্চা দুটোকে দেখো। ওরা তো একদম কিচ্ছু করছে না। জ্ঞানী বুড়ো খেঁকুড়েরা তো বলেছিলেন যে ওড়া ঝগড়াঝাঁটি না করলে ওদের খাওয়া চলবে না।'

সবাই ঝগড়া থামিয়ে টিঙ্কি আর টান্টুর দিকে তাকিয়ে দেখল। ওরা সত্যি আর ঝগড়া করছে না। দুজনে হাত ধরাধরি করে চুপচাপ বসে রয়েছে। তখন সব খেঁকুড়েদের সে কী হাত কামড়ানি!

'ইস যেই না ওরা এসেছিল তখনই যদি আমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া না করে ওদের খেয়ে নিতাম তাহলে ওরা ভাল হয়ে যাওয়ার সুযোগ পেত না। আমরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়ুল মেরেছি।'

মনমরা হয়ে যে দুজন খেঁকুড়ে ওদের ধরে এনেছিল তারাই আবার ওদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলো। খুব মন দিয়ে ওদের দেখছিল অবশ্য ওরা ঝগড়া করছে কিনা বোঝার জন্যে। কিন্তু টিঙ্কি আর টান্টু আর ঝগড়া করেনি। খুব শিক্ষা হয়ে গেছে বাবা ওদের! ঝগড়া করার কী ফল সে আর ওদের বলে দিতে হবে না। ভাগ্যিস খেঁকুড়েগুলোও ঝগড়া করছিল, নাহলে ওদের আর বেঁচে ফিরে আসতে হত না।

বাবা ঘুম থেকে উঠে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে টিঙ্কি আর টান্টু দুজনে শান্ত হয়ে বসে বই পড়ছে। সেই দেখে বাবা খুশি হয়ে বললেন, 'বাহ। এই তো খেঁকুড়েদের ভয়ে কেমন ভাল ছেলেমেয়ে হয়ে গেছো দেখছি। চল তোমাদের আজকে আইসক্রিম খাওয়াতে নিয়ে যাবো!

ছবি: সোমা

চলে গেলেন ড: গঙ্গোপাধ্যায়

গত দশই আগস্ট'২০১১ তারিখে ড: ফাল্গুনিবিজয় গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন একষট্টি বছর বয়সে। চাকদার এই ছেলেটি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশানের পর ১৯৭৫ সালে ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসে যোগ দিয়ে মধ্যপ্রদেশের প্রধান মুখ্য বনপাল হয়েছিলেন। সুলোচনা নাইডু স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত ড: গঙ্গোপাধ্যায় বোরি স্যাংচুয়রির প্রতিষ্ঠার কাজটা করেছিলেন।

তবে এই সমস্ত কিছু ছাড়িয়ে জয়ঢাক ওঁর একটা নতুন পরিচয় খুঁজে বের করেছিল। সেটা হল গল্প বলিয়ে-র পরিচয়। জয়ঢাকের পাতায় গত বছরদুয়েক ধরে ক্রমাগত অসাধারণ সব ভ্রমণকাহিনী লিখে চলেছিলেন ড: গঙ্গোপাধ্যায়। এই মুহূর্তেও প্রকাশিত হয়ে চলেছে তাঁর কেরালা ভ্রমণকাহিনী 'ঈশ্বরের নিজের দেশে'। লিখতে লিখতেই ঈশ্বরের দেশে চলে গেলেন তিনি।

মৃত্যুর ঠিক আগে শেষবার টেলিফোনে কথা বলবার সময় জানিয়েছিলেন, আরও একটা বন ভ্রমণের গল্প লিখে রেখেছেন। আমরা চেষ্টা করবো, এই ধারাবাহিকটি প্রকাশ শেষ হবার পর সেটি জোগাড় করে ছাপতে।

জয়ঢাক তাঁকে বিদায় জানাবে না মোটেই। তিনি আমাদের সঙ্গেই আছেন। থাকবেন আরও অনেকদিন--জয়ঢাকের পাতায় ও আমাদের ভালোবাসাভরা স্মৃতিতে ।

এসো পড়া যাক তাঁর ধারাবাহিক ভ্রমণ কাহিনী, ঈশ্বরের নিজের দেশে।

বেলা দেড়টা নাগাদ দুপুরের খাওয়া সেরে বজাচ্চল থেকে রওনা হলাম। ডি এফ ও সাহেব এবং অন্য কর্মচারীরা আন্তরিকতার সঙ্গে বিদায় জানালেন। এবার যাত্রা মুন্নারের পথে। চারঘন্টা লাগে। জঙ্গলের মধ্যে প্রথমে দেখলাম অয়েল পাম-এর বিস্তীর্ণ প্ল্যান্টেশান। ফরেস্ট কর্পোরেশান এই প্ল্যান্টেশান করেছে। গাছগুলো দেখতে আমাদের পরিচিত খেজুর গাছের মতন, কিন্তু তার থেকে মোটা এবং খানিক বেঁটে। এদের ফলগুলো খেজুরের চেয়ে বড় এবং পাকলে লাল রঙ হয়। এই ফলগুলো কারখানায় নিয়ে গিয়ে তার থেকে পাম তেল বের করা হয়, যা খাদ্য তেল হিসেবে বেশ ভালো দামে বিক্রি হয়।

রাস্তায় আরো দেখলাম রাবার প্ল্যান্টেশান। সরকারি জঙ্গলের বাইরে কিছু ব্যাবসায়ী নিজেরা জমি কিনে অথবা নিজেদের মালিকানার জঙ্গল কেটে রবার গাছ লাগিয়েছেন। খেজুর রস কাটবার মতই রবার গাছের গায়ে নালী কেটে কৌটো বসিয়ে রবার সংগ্রহ করা হয়। বৃষ্টির জল যাতে গাছের গা বেয়ে রবারের কৌটোর মধ্যে না পড়ে তার জন্য একটা করে প্লাস্টিকের ছাতা বানিয়ে গাছের গুঁড়িতে লাগিয়ে দেয়া হয়। হাজার হাজার এই রঙিন ছাতার দৌলতে রবার প্ল্যান্টেশানের রূপ খুলে যায়। প্ল্যান্টেশান থেকে সংগ্রহ করা রবারের রস কারখানায় নিয়ে গিয়ে অ্যাসিড মিশিয়ে তার থেকে রবারের শিট তৈরি করা হয়।

পথে আদিগুরু শংকরাচার্যের জন্মস্থান দেখতে পেলাম। তাঁর স্মৃতিতে এখানে এক বিশাল স্তমভ তৈরি করা হয়েছে। এই আদিমঙ্গলমের পর থেকে মুন্নারের পাহাড়ি পথ শুরু হয়ে গেল। একটু ওপরে উঠতেই জঙ্গল, মেঘ আর রাস্তার লুকোচুরি খেলা শুরু হল। অপূর্ব সেই দৃশ্য! হয়ত এই শেষ হেমন্তে এসেছি বলেই এই দৃশ্য দেখার সুযোগ পাওয়া গেল। কারণ এর পরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলে মেঘের এই দৃশ্য আর হয়ত দেখা যাবে না।

রাস্তায় মশলার বাগানের অনেক বোর্ড দেখতে পেলাম। মুন্নার কেরালার ইদুক্কি জেলায় অবস্থিত। এ জেলা বিভিন্ন ধরণের মশলার জন্য বিখ্যাত। তবে, মুন্নারের বাজার থেকেই মশলা কেনা স্থির হওয়ায় বাগান দেখবার জন্য আর থামিনি।

সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মুন্নারে পৌঁছে কেরালা পর্যটন নিগমের 'হোটেল টি কাউন্টি'তে চেক ইন করলাম। নিগমের এম ডি শ্রী মোহনলাল, ফরেস্ট সার্ভিসে আমার ছোটভাই হন বলে তাঁর ব্যবস্থাপনায় তিনরাত্রির বুকিং করাই ছিল। মুন্নারের ডি এফ ও সুনীল বাবু হোটেলেই অপেক্ষা করছিলেন। উনি কেরালার স্থানীয় মানুষ। বেশ সপ্রতিভ। আগামি দু'দিনের ভ্রমণসূচি বানিয়ে রেখেছিলেন। তাঁদের বিদায় দিয়ে হোটেলের কামরায় পৌঁছে সারাদিনের ক্লান্তি দূর করা গেল।

২১/১১/২০১০

মুন্নার শহর থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে এরাভিকুলাম এন পি রাষ্ট্রীয় উদ্যান। বিপন্ন জীব নীলগিরি থর-এর (হেমিট্র্যাগাস হাইলোক্রিয়াস, বা নীলগিরি আইবেক্স। অপরিমিত শিকারের ফলে এই শতাব্দির শুরু নাগাদ এই নিরীহ তৃণভোজী জীবটির সংখ্যা কমে মাত্রই একশোতে নেমে এসেছিল গত শতাব্দির শুরুতে। তারপর তাদের যত্নে করে সংরক্ষণ শুরু হবার পর বর্তমানে এদের সংখ্যা বেড়ে প্রায় দু হাজারে দাঁড়িয়েছে।--সমপা:) সংরক্ষণের জন্য সাতানব্বই বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে এই বন। ১৯৭৫ সালে একে স্যাংচুয়ারির স্বীকৃতি দেয়া হয়। তারপর ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রীয় উদ্যানের মর্যাদা পায় এই অরণ্য। এই ন্যাশনাল পার্কের বৈশিষ্ট্য হল, এর মধ্যে যাবার জন্য কোন

গাড়ির রাস্তা নেই। পর্যটকরা গাড়িতে করে গেট পর্যন্ত আসতে পারেন। তারপর পায়ে হেঁটে ঘুরতে হয়। সেখানেই দেখা মেলের নীলগিরি থরের।

এটি পাহাড়ি ছাগলের একটি প্রজাতি। উচ্চতায় একশো সেন্টিমিটারের বেশি হয়না। পুরুষ ও মেয়ে সকলের মাথাতেই বাঁকানো শিং থাকে। পুরুষপ্রাণীদের পিঠের লোমগুলো একটু সাদা ঘোড়ার পিঠের জিন বা স্যাডল-এর মতন দেখায় বলে একে স্যাডলব্যাকও বলা হয়ে থাকে। দাক্ষিণাত্যের সর্বোচ্চ পর্বতচূড়া আনিমুদি (২৬৯৫ মিটার) এই উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত।

এরাভিকুলাম এন পি নামটির একটা কারণ আছে। এরাভি মানে হল শিকার আর কুলাম মানে জলের কুণ্ড। পাহাড়ের মাথায় ছোটবড় অনেক জলের কুণ্ড আছে বলে এই রাষ্ট্রীয় উদ্যানের নাম এরাভিকুলাম। নীলগিরি থর ছাড়াও এই উদ্যানে হাতি , বাইসন, প্যান্থার এমনকি বাঘও আছে। আর আছে নয়নাভিরাম এক দৃশ্য, প্রতি বারো বছরে যা একবারই দেখবার সুযোগ হয়। নীলাকুরুঞ্জি (ফেলোবোফাইলাম কুন্থিয়ানাম) নামের একপ্রকার জংলি ফুলের গাছ হয় এখানে। প্রতি বারো বছরে একবার করে, উঁচু পাহাড়ি ঢাল জুড়ে সেপ্টেম্বর মাসে তখন এর ফুল আসে। নীল এবং গোলাপি রঙের চাদরে প্রকৃতি নিজেকে সাজিয়ে নেয় যেন তখন।

এরাভিকুলামের আর এক সমপদ এখানকার মুথুভন আদিবাসী সমপ্রদায়, যাঁরা এই উপত্যকার বন এবং বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণের সঙ্গে প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত ঘনিষ্টভাবে জড়িত। ইকো-বিকাশ সমিতির মাধ্যমে বনবিভাগ এই আদিবাসীদের সংরক্ষণের কাজে ভাগীদার বানিয়ে এঁদের আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

এরাভিকুলামের অরণ্য দেখবার পর মারিয়ুর-এ চন্দনকাঠের ডিপো দেখতে গেলাম। প্রায় বাষট্টি বর্গকিলোমিটার বনক্ষেত্র জুড়ে আটান্ন হাজার চারশো চন্দনগাছের জঙ্গল আছে এখানে যার জন্য বনবিভাগের একটা চন্দনকাঠ ডিভিশন বানানো হয়েছে। চন্দনগাছ পরিপক্ক হবার পর যখন ঝড়বৃষ্টিতে

উপড়ে যায় তাকে বনবিবাগ সংগ্রহ করে ডিপোতে নিয়ে আসে। এছাড়া চুরি যাওয়া চন্দনকাঠকেও বনবিভাগ বাজেয়াপ্ত করে ডিপোতে রাখে। মারিয়ুর ডিপোতে বিশাল চন্দনকাঠের ভাণ্ডার দেখলাম। প্রতি মাসে নীলাম করে তা বিক্রি হয়।

এবারে ফের মুন্নারে ফেরা। এক ঘন্টায় পেরিয়ে এলাম ৩৮ কিলোমিটার পাহাড়ি পথ।

ছবি সংগৃহীত

ভূত সমপর্কিত সামান্য কথা

সমপাদকের ফোন - জয়ঢাকে আরও অনেক ভূতের গল্প চেয়ে অনুরোধ আসছে। ভূতের গল্প নয়, ভূতের সমপর্কে একটা লেখা চাই পূজো সংখ্যার জন্য। তথাস্তু বললেন অরিন্দম দেবনাথ।

বহু বছর আগে আমাকে একবার ভূতে ধরেছিল গঙ্গোত্রীতে। এক্কেবারে জীবন্ত ভূত। সেই ভূত আমাকে প্রায় গলা টিপে মেরেই ফেলেছিল। কিন্তু সময় মতো সাহসী হয়ে যাওয়ায় ভূতটা ঠিক আর কায়দা করতে পারে নি। পালিয়ে গেছিল ভূতটা অথবা ভূতের দল। আর একবার হিমালয়ের তপোবন

বলে একটা জায়গায় একাকি রাত কাটিয়েছিলাম এবং সারারাত ঘুমোতে পারি নি। ঠিক ভূতের ভয়ে নয়, অজানা আতঙ্কে। সারারাত ধরে ফরফর একটা শব্দ ঘুরে বেড়াচ্ছিল উপত্যকার কোণে কোণে। সকালে আবিষ্কার করেছিলাম ওটা ছিল একটা প্লাস্টিক প্যাকেট। সারারাত প্রচণ্ড জোরালো হাওয়ায় ওটা পাক খাচ্ছিল উপত্যকা জুড়ে। হিমালয়ে বসবাসকারী মানুষজন অবশ্য ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানো, অশুভ শক্তি এসবে একটু বেশিই বিশ্বাস করে। হিমালয়ের যেকোন প্রান্তে বেড়াতে গেলে, বিশেষত যেখানে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা থাকেন, দেখবে, ভূত তাড়ানোর জন্য তারা মন্ত্রলেখা পতাকা টাঙিয়ে রাখে বাসস্থানের চারপাশে। ঐ মন্ত্র লেখা পতাকার হাওয়ার স্পর্শ যতদূর যাবে, ততদূর পর্যন্ত ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানো এসব অশুভ শক্তি আসতে পারবে না।

শুধু হিমালয়ে কেন, সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই ভূত এবং ভূত তাড়াবার বিভিন্ন পদ্ধতির রেওয়াজ আছে। সে আফ্রিকার কোনো দেশ হোক কিংবা ইউরোপ বা আমেরিকার কোনো দেশই হোক। কোথাও ওঝা মন্ত্র পড়ে, ঝাঁটাপেটা করে ভূত তাড়ায়। কোথাও বা ভূত তাড়ানোর জন্য মুখোশ নৃত্য করা হয় আবার কোথাও বা পুরোহিত এসে মন্ত্রপূত জল ছেটান। মানে ভূত নামক অসুখের উপদ্রব হলে তা ঠিক করার জন্য ডাক্তারও আছেন। শুধু ওষুধটা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের।

ভূত নামক কিছু আদপেই আছে কিনা, কিংবা কেউ ভূতের দেখা পেয়েছেন কিনা এ নিয়ে তর্ক লেগেই আছে, সেই প্রাচীন কাল থেকেই। ভূত আসলে কী? চিরচারিত বিশ্বাস অনুযায়ী ভূত হলো মৃত মানুষ বা জন্তুর আত্মা, যা নাকি মৃত্যুর পরেও ফিরে আসে। কখনও শরীরি রূপ ধরে বা কখনও অন্য কোনো ভাবে তার উপস্থিতি জানান দেয়। এই উপস্থিতিও অনেক ভাবে হতে পারে। কখনও আবছা একটা আভাস, কখনও বা তার একটা ভাঙাচোরা বিকৃত রূপ, কখনও বা ঠিক যেন জীবন্ত প্রতিমূর্তি। এই মৃত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ নাকি তারাই করতে পারেন যারা ডাকিনীবিদ্যায় পারদর্শী। ইংরেজিতে যাকে বলে নেক্রমেন্সি। কোনো নির্দিষ্ট ভূত বা প্রেতাত্মা অনেক জায়গা জুড়ে ঘুরে বেড়ায় না বলেই বিশ্বাস। তারা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় থাকতে ভালোবাসে, যা নাকি বেঁচে থাকাকালীন তাদের সবচেয়ে প্রিয় ছিল। যারা এর সব চাইতে প্রিয় ছিল অথবা এদের কোনো না কোনোভাবে বিরক্ত করেছে তাদের উপরই ভূত হামলা চালায় বা ভর করে। তবে শুধু মৃত ব্যক্তি বা পশুই কেন, জাহাজ ভূত, ট্রেন ভূত, গাড়ি ভূত, এমনকি আস্ত ভৌতিক সৈন্যবাহিনীর কথাও বহুল প্রচলিত।

ভূত বা প্রেতাত্মা বহু বহু বছরের এক প্রচলিত বিশ্বাস। বলতে গেলে সেই মানুষের আদিযুগ থেকে। মানুষ প্রথম থেকেই মৃত্যুর পর পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম কিংবা মৃত্যুর পর তাঁর আত্মাকে পরলোকে অর্থাৎ যে অবস্থার কথা আমাদের জানা নেই কিংবা কায়াহীন দুনিয়ায় পাঠানোর জন্য ''ওঝা'' বা ভূত কিংবা আত্মা তাড়ানোয় পারদর্শী বলে কথিত ব্যক্তিদের সমাজে স্থান দিয়েছে।

আত্মা হলো দু'ধরণের - একটি হলো দুষ্ট আত্মা আর একটি হলো ভালো আত্মা। দুষ্ট আত্মাকে বলে ভূত, যা নাকি ক্ষতিকারক। আর ভালো আত্মা হলো দেবদূত, যা আমাদের ভালো করে। ইংরেজি শব্দে এরা হলো - যথাক্রমে 'গোস্ট' বা 'ডিমন' এবং 'এঞ্জেল' বা 'হোলিগোস্ট'। প্রাচীনকালে পুজোপাঠ মানেই ছিল একরকম ভূত বা প্রেতাত্মাকে সন্তুষ্ট করে তাকে অন্যলোকে পাঠিয়ে দেওয়া। আগেকার মানুষরা বিশ্বাস করত মৃত্যুর পর তার আত্মা না খেতে পেয়ে কষ্ট পাচ্ছে, ফলে সে অন্যলোকে যেতে চাইছে না। তাই তাদেরকে খাদ্য ও পানীয় উৎ-সর্গ করা হতো। এটা ভূত বিদায়ের একটা পন্থা। আর একটি হলো জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে প্রেতাত্মাকে জোর করে তাড়ানো। তান্ত্রিক বা ওঝা এসে নানা রকম মন্ত্র পড়ে নাচ করে, যাগযজ্ঞ, পূজাপাঠ করে ভূতেদের তাড়াতো। কিছু কিছু দেশে এখনও বিশেষ বিশেষ

দিনে আত্মাকে তৃপ্ত করার জন্য বিশেষ ক্রিয়াকর্ম এখনও নিয়মিত হয়। যেমন চীন দেশে পালিত হয় ‘চাইনিজ গোস্ট ফেস্টিভ্যাল’। পশ্চিমি দুনিয়ায় ‘অল সোলস ডে’ ইত্যাদি।

বহুল প্রচলিত বিশ্বাস যে ভূত রূপে আত্মা আসে অনেকটা হালকা ধোঁয়াশার একটা আকার নিয়ে। যেন ধোঁয়া বা কুয়াশা ঘনীভূত হয়ে একটা মানুষ বা জন্তুর আকৃতি নিয়েছে। অনেক সময় নাকি এদের শরীরে থাকে তার প্রিয় জামাকাপড় বা সবচাইতে বেশি ব্যবহৃত তার কোনো জিনিস এবং সেটাও অনেকটা দেখায় জলছাপের মতো; আছে অথচ নেই এরকম। ট্রেসিং পেপারের নিচে কোনো ছবিকে যেমন দেখায় অনেকটা সেরকম। অনেকে বিশ্বাস করেন ভূত হলো সেই আত্মা যারা তাদের খারাপ কৃতকর্মের ফলস্বরূপ ইহলোক থেকে পরলোকে যেতে পারছে না। ফলস্বরূপ অশরীরি হয়ে থেকে যায় ইহলোকে। চেষ্টা করে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করিয়ে নিতে, যা মৃত্যুর আগে আত্মাটির চরিত্রগত আকাঙ্খা বা স্বভাব ছিল। আবার মহিলাদের ক্ষেত্রে বলা হয়, বিশেষত: অপঘাতে বা অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে এদের আত্মা থেকে যায় তাদের বাসস্থানের আশেপাশে। তাঁরা চেষ্টা করেন ইহজীবনে যা করতেন সেসব কাজ করতে, যেমন সন্তানদের ভালোবাসতে, কখনও বা রান্না

করতে, কখনও বা অন্যান্য দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে। প্রচলিত বিশ্বাস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা মৃত্যুর পূর্বের রূপ ধরতে সক্ষম হয়, বিশেষত: যেসব মানুষ তাদের মৃত্যুর খবর জানে না তাদের সামনে। বাংলা সাহিত্যে এরকম অনেক মহিলা ভূত বা পেত্নির উল্লেখ আছে। যেমন অসময়ে অতিথি এসেছে, ঘরে লেবু নেই অথচ লেবুর শরবত বানাতে হবে; রান্না ঘর থেকে গৃহিণী হাত লম্বা করে গাছ থেকে লেবু ছিঁড়ে নিয়ে এলো। কিংবা রান্নার কাঠ নেই, রাঁধুনী তার পা দুটো গুঁজে দিল উনুনে কাঠের জায়গায়, পা দুটো কাঠের মতো দাউদাউ করে জলছে, আর তাতে ভাত রাঁধা হচ্ছে।

মানুষ ছাড়াও বিভিন্ন ভুতুড়ে উপস্থিতির কথা প্রচলিত। যেমন ১৮শ শতাব্দীর জাহাজ ভূত। বিখ্যাত লেখক কলরিজ তাঁর বিখ্যাত লেখা 'দি রাইম অফ দি অ্যানসিয়েন্ট মেরিনার' -এ এই জাহাজ ভুতকেই বিষয়বস্তু করেছিলেন।

ভূতেরা বা ভূত যে বাড়িতে বাস করে তাকে হানাবাড়ি বলে ইংরেজিতে হন্টেড হাউস। সাধারণত চালু বিশ্বাস এই যে বাড়ির মালিকের মালিকের আত্মা ঐ বাড়িতেই মৃত্যুর পরেও থেকে যায়। কখনো মৃত ব্যক্তির আত্মা সমপত্তির টানে বা আসক্তিতে ছেড়ে যেতে পারে না চার দেওয়ালের মায়া। দূর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বা আত্মহত্যা করা ব্যক্তির আত্মাই সাধারণত: থেকে যায় ইহলোকে তার সমপত্তির মায়া বন্ধনে। কেউ অযাচিতভাবে ঐ বাড়িতে প্রবেশ করলে বা কেনার চেষ্টা করলে এই আত্মারা হয়ে ওঠে হিংস্র, মেরে ফেলার চেষ্টা করে অনুপ্রবেশকারীকে বা তার অনিষ্ট করার ফন্দি করে। কিছুদিন আগে এরকম চরিত্র নিয়ে একটি সিনেমা তৈরি হয়েছিল। তার নাম ''ভূতনাথ''। কিন্তু এই সিনেমায় ভূতটি ছিল ভালো ভূত - দেবদূত বা এঞ্জেল, যে নাকি বাড়িতে ভাড়া নিয়ে থাকতে আসা একটি পরিবারকে খুব ভালোবেসে ফেলেছিল; শুধু

ফ্যান্টম আর্মির সত্যি গল্প

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালিন ইংল্যান্ডের ওয়েমাউথ-এর রিজওয়ে হিল এলাকায় মিসেস এফ কার্র্ফ নামের এক মহিলা একদিন সন্ধেবেলা তাঁর কুকুরকে নিয়ে হাঁটছিলেন। হঠাৎ তিনি শুনতে পান একদল সৈন্যের মার্চ করবার শব্দ। তারা ল্যাটিন ভাষায় যুদ্ধের গান গাইছিলো। সে এলাকায় কোন সৈন্যবাহিনীর আসবার কথা নয়। ভদ্রমহিলা ভয় পেয়ে লুকিয়ে পড়ে কান পেতে শুনতে থাকেন। খানিক বাদে শব্দটা আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে যায়। তিনি কাউকে দেখতে পাননি। সে অঞ্চলের এক দীর্ঘদিনের স্থানীয় বিশ্বাস আছে যে দেশের যখন কোন বিপদ ঘনিয়ে আসে তখনই রোমান সেনাদের এক ভৌতিক দল আবির্ভূত হয়। কয়েক বছর আগে ওই এলাকায় একটা রাস্তা বানাবার সময় একটা গণকবর আবিষ্কৃত হয় যাতে পঁয়তাল্লিশটা অতি প্রাচীন সৈন্যের কংকাল আবিষ্কৃত হয়েছে। শরীরগুলো রোমান যুগের নাকি লৌহযুগের সে ব্যাপারে এখনও বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত না হতে পারলেও সাধারণ মানুষের বিশ্বাস এ সেই ভৌতিক সেনাদেরই দেহাবশেষ।--সম্পা

তাই নয় বাড়ির ভাড়া ভাড়াটিয়াদের রক্ষা করত ও সাহায্য করত বিভিন্নভাবে। ভূতের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অমিতাভ বচ্চন।

প্রাচীন সভ্যতা যেমন সুমের, ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়া, মেসোপটেমিয়া - সব কালেই অশরীরির বিশ্বাস ছিল। মানুষ বিশ্বাস করতেন আত্মা হলো মৃত্যুর পরের অবস্থা এবং এখানেও আত্মার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠা বা পদ আছে, মৃত্যুর আগে যেমন ছিল। অর্থাৎ ভূত বা আত্মার আলাদা জগৎ আছে। মনে করা হতো আত্মাকে তৃপ্ত করার জন্য বা তাকে সুখে রাখার জন্য মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়ের অবশ্য কর্তব্য হলো তাকে খাদ্য ও পানীয় নিবেদন করা। আর তা না করলেই মৃত আত্মা জীবিত ব্যক্তিদের অসুস্থ করে তুলবে বা অথবা তাদের জীবনে কোনো না কোনো ভাবে অভিশাপ ডেকে আনবে। আমাদের হিন্দু সংস্কৃতিতেও আছে পিণ্ডদানের প্রচলন। পিণ্ড হলো খাবার মণ্ড যা মৃত ব্যক্তিকে উৎ-সর্গ করা হয়। এমনকি অপঘাত বা দূর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হলে মনে করা হয় তার আত্মাকে তৃপ্ত করতে বিশেষভাবে খাদ্য উৎ-সর্গ করতে হবে এবং তাও করতে হবে বিশেষ স্থানে যা গয়া নামে পরিচিত।

মিশরীয় সভ্যতার আদিকালে অথবা যখন তা উৎকর্ষের শীর্ষে ছিল তখন তাঁদের পরজীবনের চিন্তাভাবনার প্রতিফলন তাঁরা লিপিবদ্ধ করেছিলেন বিভিন্ন সমাধির চিত্রকলায়, পাথর খোদিত মূর্তিতে। তাঁদের মৃত্যু পরবর্তী জীবন সমপর্কিত সবচেয়ে বড় ভাবনার রূপ হচ্ছে 'মামি', পিরামিড। শুধু একজন মানুষের মৃতদেহ অবিকৃত রেখে দেওয়াই নয়, মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনের সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থাসহ মৃতদেহ সমাধি দেওয়া হত।

প্রাচীন গ্রিসে প্রায় ২৫০০ বছর আগে বিশ্বাস করা হত যে মৃত মানুষ, বিশেষত যাদের মৃত্যু হয়েছে অপঘাতে তারা মৃত্যুর সময়ের বেশ ধরে হানা দেবে যদি না তাদের আত্মাকে যথাযথভাবে তৃপ্ত করা হয় এবং তারা হানা দিত অধিকাংশ সময়েই রক্তাক্ত শরীরে। সবসময়ে যে মানুষের ক্ষতি করতে তা নয়, তবে সে সময় মানুষ কবরস্থানের আশপাশ এবং দূর্ঘটনাস্থল এড়িয়ে চলত। কারণ ধরেই নেওয়া হতো যে অশরীরিরা মানুষের ক্ষতিই করে। আর এর থেকে মুক্তি পাওয়ার একটাই উপায়, সমস্ত পরিচিত ব্যক্তিরা মিলে আত্মাকে খাদ্য-পানীয় নিবেদন করা।

রোমান সাহিত্য বা ইতিহাসেও অনেক ভৌতিক ঘটনা বা কাহিনীর উল্লেখ আছে। যেমন প্রথম শতাব্দীর একটি ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায় যে, এক ধনী ব্যক্তি খুন হওয়ার পর তাঁর আত্মা সেই শহরময় নিশীথরাতে প্রচণ্ড চীৎকার করে ঘুরে বেড়াত। অশরীরি সেই হুঙ্কারে শহরের লোক সন্ধে নামার আগে ঘরে ঢুকে দরজা জানলা বন্ধ করে আতঙ্কে রাত কাটাত। পুরোহিতরা নিদান দিল, ''ঐ আত্মাকে তুষ্ট করতে হবে, নাহলে ওর ইহলোক থেকে পরলোকে যাওয়া হবে না। ফলে রাতভর ও শহরময় চীৎ-কার করে দাপিয়ে বেড়াবে''। কাজেই শহরের সব লোক এক হয়ে ঐ অতৃপ্ত আত্মাকে খাদ্য-পানীয় নিবেদন করল ও আত্মার শান্তি কামনা করল। শহর মুক্তি পেল অশরীরির কবল থেকে।

খ্রীষ্ট জন্মের পঞ্চাশ বছর আগে প্লাইনি দি ইংগার এথেন্সের এক হানা বাড়ির কথা লিখেছেন। এক বাড়িতে নাকি এক চেনে বাঁধা কঙ্কাল ঘুরে বেড়াত। তারপর বাড়ির উঠোন থেকে এক চেনে বাঁধা কঙ্কাল উদ্ধার হল। পুরোহিতরা বললেন যে ঐ কঙ্কালকে আবার যথাযথ সম্মানের সাথে আবার সমাধি দিতে হবে। তাই করার পর আর নাকি ফিরে আসেনি অশরীরি।

ভূত সমপর্কিত মূল ধারনাটি সমস্ত পৃথিবীতেই প্রায় এক। মৃত্যুর পর কখনও কখনও তার আত্মা তার একটা টান থেকে যায় জীবন্ত পৃথিবীর প্রতি। তারই প্রতিফলন হলো ভূত বা ভৌতিক

অবস্থান, যা সাধারণত দেখা যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায় কোনো না কোনোভাবে। কখনও সেটা ভালো বা কল্যাণময় হয়, কখনও বা হয় সেটা হয় ভয়াবহ বা ক্ষতিকারক।

আসল সত্যটা হলো আমরা আত্মার রূপ বা মৃত্যুর পরের অবস্থা জানি না।

সমপাদকী য় সংযোজনঃ

এক অসাধারণ ভূতের গল্প হলো অস্কার ওয়াইল্ডের 'দ্য ক্যান্টারভিল গোস্ট'। এ গল্পের বেচারা ভূত তার মৃত্যুর জায়গার রক্তের দাগটাকে বড় ভালোবাসতো। বাড়ির নতুন বাসিন্দারা সেই রক্তের দাগ মুছে দিলে সে ফের সেখানে রক্তের নতুন দাগ বসাতো। কিন্তু ভূতের গায়ে রক্ত আসবে কোথা থেকে? কাজেই রক্ত না পেয়ে সে বেচারা বাড়ির বাচ্চাটির রঙের বাক্স থেকে লাল রঙ নিয়ে রক্তের দাগ বানাতো রোজ আর রোজ সেটা দিনের বেলায় মুছে দিত বাড়ির লোকেরা। অবশেষে একদিন দেখা গেল রক্তের রঙ বদলে গিয়ে নীল-সবুজ এইসব হয়ে যাচ্ছে। কারণটা সোজা। রঙের বাক্সের লাল রঙ ফুরিয়ে গেছে। কাজেই অন্যান্য রঙ নিয়েই--না না, আর বলবোনা। গল্পটা জোগাড় করে পড়ে ফেলো এক্ষুণি।

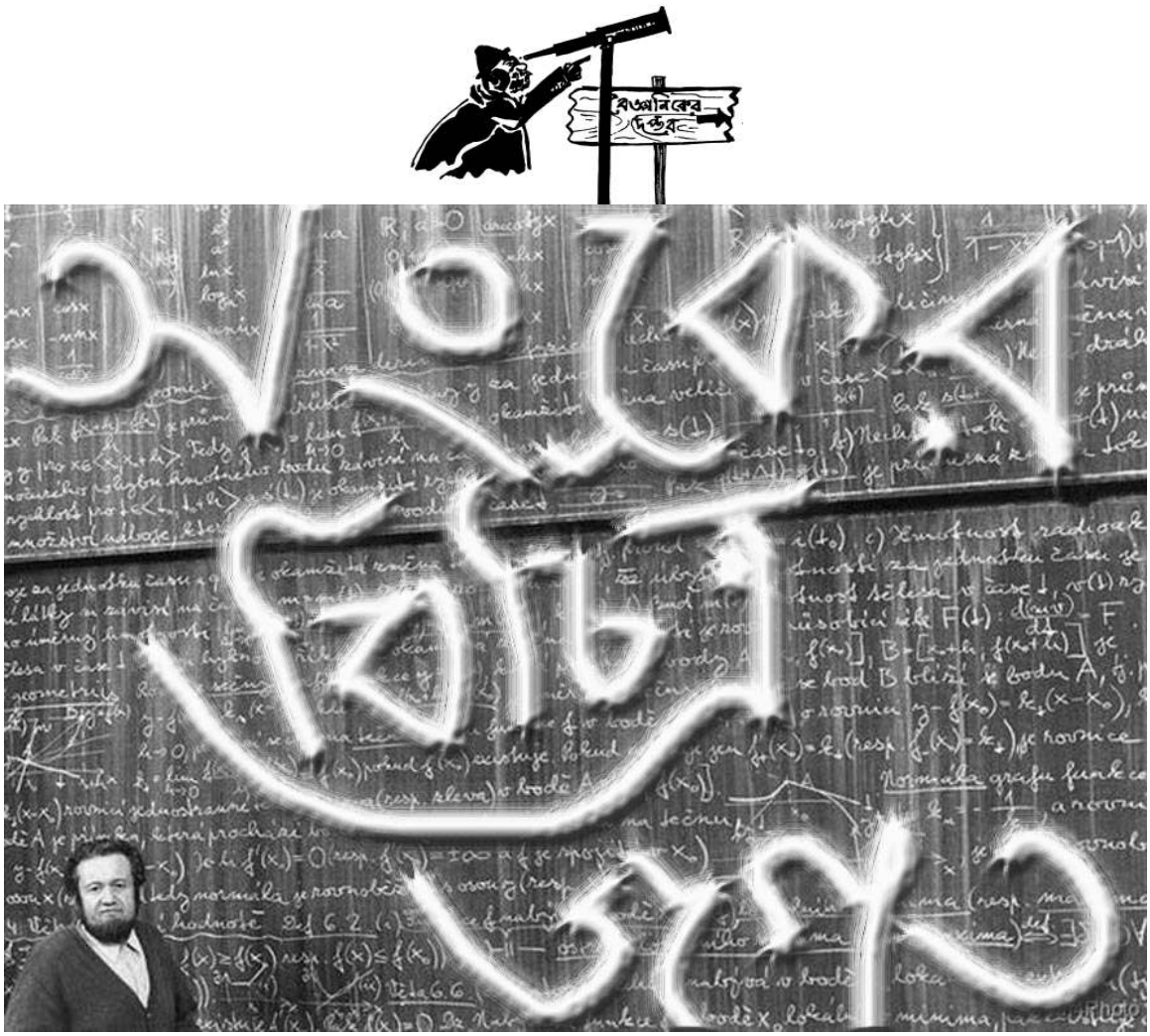

বৈজ্ঞানিক

এই সংখ্যা থেকে আমরা শুরু করছি নতুন ধারাবাহিক লেখা- অংকের বিচিত্র জগত। এখানে আমরা প্রতি সংখ্যায় একটু একটু করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অংক কেমন করে জন্ম নিল ও বড়ো হল তার গল্প শোনাবো। তার সাথে সাথে থাকবে প্রতি সংখ্যায় একটা করে অংকের তাক লাগানো খেলা-- ''মাথে মে ট্রিক্স ।'' শুরু করবো ভারতে অংকের জন্ম ও বড়ো হওয়ার গল্প দিয়ে।

ভারতে অংক

সমস্ত সভ্যতাতেই অংকের সূচনা হয়েছে গুণতে শেখার মাধ্যমে। বিভিন্ন প্রাচীন সমাজে সংখ্যাকে প্রকাশ করা হতো দাগের গুচ্ছ দিয়ে (এক বোঝাতে একটা দাগ, দুই বোঝাতে দুটো দাগ এইরকম)। তারপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন রাশির জন্য আলাদা আলাদা সংখ্যাচিহ্ন অথবা অক্ষর বা অক্ষরসমষ্টি ব্যবহার করা শুরু হলো। যেমন ধরো ভারতীয় গণিতে এক বোঝাতে '১', দুই বোঝাতে '২' এইরকম অথবা রোমান সংখ্যামালায় এক বোঝাতে আই, পাঁচ বোঝাতে ভি এইরকম আর কি।

আজকাল দশমিক পদ্ধতিতে অংক কষার কায়দা একটা ছোট বাচ্চাও জানে। এতে সংখ্যার গণনা করা হয় দশটি দশটি করে এক একটা দলে। যেমন ধরো, শূন্য থেকে নয় হল দশখানা আলাদা আলাদা চিহ্ন। তারপর ১০ থেকে ১৯ অবধি দশখানা সংখ্যা আবার সেই ০ থেকে ৯ কে ব্যবহার করে তৈরি একটা দল যাতে প্রত্যেকের শুরুতে রাখা থাকছে ১। তারপর ফের ২০ থে ২৯ অবধি দশখানা সংখ্যা আবার সেই ০ থেকে ৯ কে ব্যবহার করে তৈরি একটা দল যাতে প্রত্যেকের শুরুতে রাখা থাকছে ২। এর ফলে তুমি যতবড় সংখ্যাই ভাবতে চাওনা কেন, তার চিহ্নটা ঠিক কী হবে সেটা স্রেফ হিসেব করেই তুমি বলে ফেলতে পারবে। (ভেবে দেখো, এক লক্ষ কুড়ি হাজার আটশো বাইশ, এইটাকে সংখ্যা দিয়ে, মানে চিহ্ন দিয়ে লিখতে গেলে তোমাকে বিশেষ কিচ্ছু মাথায় রাখতেই হবে না। কেবল একক দশক শতকের দশ গুণ করে এগোন হিসেবের কায়দাটা মাথায় থাকলেই চলবে।) এই দশমিক পদ্ধতিতে আবার মাপজোকের এককদেরও দশের গুণিতক হিসেবে ঠিক করা হয়। যেমন ধরো কিলোমিটার , হেক্টোমিটার ইত্যাদি। এতে হিসেবনিকেশ অনেক সহজ হয়ে যায় । একটা দশমিক বিন্দুকে ডাইনে বাঁয়ে সরিয়ে কষে ফেলা যায় বিরাট বিরাট সব হিসেব। অতি ছোট মিলিমিটার থেকে অতিবড় কিলোমিটারের হিসেবে পৌঁছে যাওয়া যায় বিশেষ কোন হিসেব না কষেই, কেবল একটা দশমিককে বাঁ থেকে ডাইনে সরিয়ে।

তবে, পৃথিবীর সব সভ্যতাতে কিন্তু চিরকাল এই সহজ সরল দশভিত্তিক গণনাপদ্ধতি চালু ছিলো না। প্রাচীন ব্যাবিলনে যে গণনা পদ্ধতি চালু ছিল তা ছিল দশের বদলে ষাট ভিত্তিক। এই গণনা পদ্ধতির একটা প্রচলন আজও আছে। সেটা হল সময়ের হিসেব। ষাট মিনিটে এক ঘন্টা, ষাট সেকেণ্ডে এক মিনিট ইত্যাদি। এতে বড়ো বড়ো হিসেব কষা অনেক কঠিন হয়ে যায়। কেমন করে কঠিন হয় সেটা খুব সহজেই বোঝানো যায়। বলো দেখি একশো পঞ্চান্নটা দশ গুন করলে কতো হয়? একটুও না ভেবে উত্তর দেয়া যাবে, একের পিঠে একশো পঞ্চান্নটা শূন্য। কিন্তু একশো পঞ্চান্নটা ষাট গুণ করলে কতো হয়? পারবে অত সহজে বলতে? পারবে না।

আজ এইখানে থামি। এর পরের সংখ্যায় আমরা জানবো, চার হাজার বছর আগে ভারতের সিন্ধু উপত্যকায় প্রচলিত হরপ্পার দশমিক গণনা পদ্ধতির কথা।

ক্রমশ

মাথে মে ট্রিকস্

কোন তারিখে কোন বার হবে সেটা বের করবার কিছু সহজ কায়দা আছে। জানুয়ারি মাসে আছে ৩১ দিন। ২৮ দিনে চার সপ্তাহ হয়। জানুয়ারিতে আছে তার চেয়ে তিন দিন বেশি। কাজেই ফেব্রুয়ারির প্রত্যেকটা তারিখের বার হবে জানুয়ারির সেই তারিখে যে বার ছিলো তার চেয়ে তিনদিন পেছনে। এই যুক্তিতে প্রত্যেক মাসের বারগুলো জানুয়ারির তুলনায় কতদিন করে পেছোবে তার একটা ছক দিলাম নীচে--

ছক ১:

জানুয়ারি--০, ফেব্রুয়ারি--৩,মার্চ--৩, এপ্রিল--৬, মে--১, জুন--৪, জুলাই --৬, আগস্ট--২, সেপ্টেম্বর--৫, অক্টোবর--০, নভেম্বর--৩, ডিসেম্বর--৫

ছক ২:

সপ্তাহের প্রত্যেক দিনের একটা সংখ্যামান দেয়া হল এই ছকে: রবি-- ১, সোম---২, মঙ্গল---৩, বুধ-- ৪, বৃহস্পতি-- ৫, শুক্র-- ৬ শনি-- ৭।

এইবারে এসো বার বের করবার খেলা শুরু করা যাক--

প্রশ্ন: ২৩ জুন ১৯৮৬ কী বার ছিলো?

উত্তর:

প্রথম ধাপ: ওপরের এক নম্বর ছকে জুন-এর সংখ্যা দেয়া আছে--৪

দ্বিতীয় ধাপ: তারিখটা হলো ২৩

তৃতীয় ধাপ: বছরের শেষ দুটো সংখ্যা নাও--৮৬

চতুর্থ ধাপ: তাকে চার দিয়ে ভাগ করে ভাগফলটা নাও--২১

পঞ্চম ধাপ: এবারে ওপরের চারটে সংখ্যাকে (৪, ২৩, ৮৬, ২১) যোগ করো--১৩৪

ষষ্ঠ ধাপ: ১৩৪কে সাত দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষটা নাও। ভাগশেষ হলো ১।

এবার দ্বিতীয় ছকের থেকে মিলিয়ে দেখো ভাগশেষের সংখ্যা কোন বারের সঙ্গে মেলে। তোমার উত্তর হবে রবিবার।

যেকোন বছরে যে কোন দিন নিয়ে এই খেলা খেলে দেখতে পারো। সবসময় ঠিক উত্তর আসবে। বন্ধুদের করে দেখিও এই ম্যাজিক। তারা অবাক হয়ে যাবে।

ছবি: সংগৃহীত

টেকনো টুকটাক

ভ্যানিশ!!!!

হ্যারি পটারের অদৃশ্য হবার ক্লোকটা পাবার শখ কোন ছেলেমেয়েটার না আছে? মজার কথা হলো, শুধু ছোট ছেলেমেয়েরা নয়, বড়ো বড়ো বিজ্ঞানিরাও সে স্বপ্নটা দেখতে শুরু করেছেন। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি আর সিঙ্গাপুরের 'স্মার্ট' নামের একটা সংস্থা এ পথে অনেকদূর এগিয়েছে। এ বছরের গোড়ার দিকে তারা একটা বেজায় সাধারণ আর সস্তা উপায়ে খানিকটা হলেও অদৃশ্য হবার কায়দা একটা করে দেখিয়েছে। জিনিসটা কাজ করে জলের নিচে , সবুজ আলোয়। ক্যালসিয়াম কার্বোনেট, মানে চুণাপাথরের একটা বিশেষ রূপভেদ হলো ক্যালসাইট। দু টুকোরো ক্যালসাইটের স্ফটিক নিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে তার কাটাই করে একটা নির্দিষ্ট কোণে সেদুটোকে রেখে তার মধ্যে দিয়ে একটা কঠিন বস্তু ঢুকিয়ে দিলে বস্তুটার যে অংশটা তার মধ্যে থাকছে সেটা পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আসলে ওই বিশেষ ঢং-এ ক্যালসাইটের টুকোরোদুটো রাখলে তা করে কি , তার মধ্যে যে বস্তুটাকে রাখবে, তার পেছনের দিকের আলোটাকে প্রতিসরণের মাধ্যমে ঘুরিয়ে সামনে নিয়ে আসবে। ফলে বস্তুটার পেছনের দিকের জিনিসগুলোকে আমরা দেখতে পাবো, অর্থাৎ বস্তুটার সেই অংশটা অদৃশ্য হয়ে যাবে।

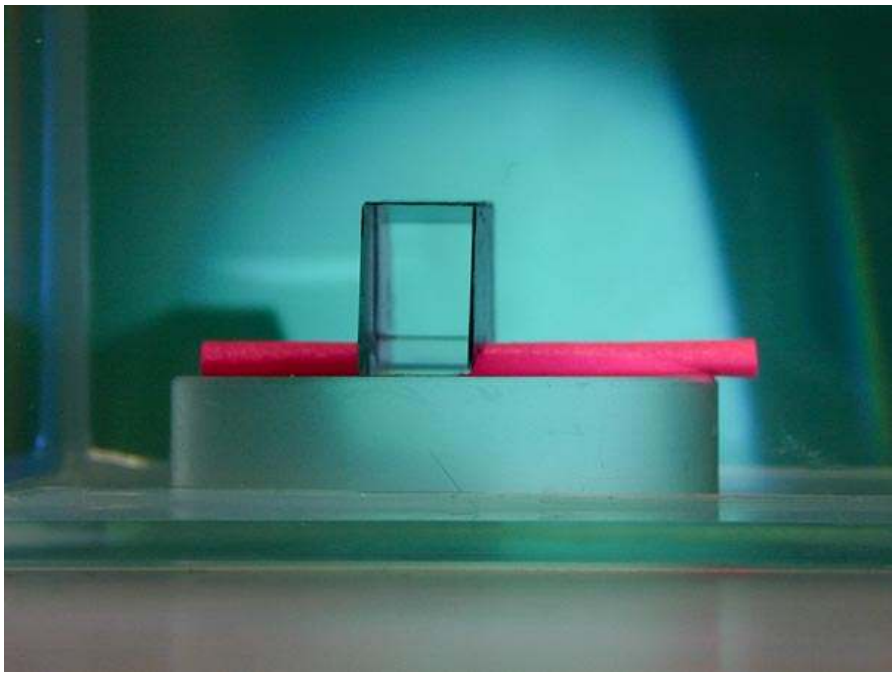

সঙ্গের ছবিটা দেখো। পিংক রঙের দণ্ডটার যে অংশটা ক্যালসাইটের মধ্যে ঢুকে আছে সেটা কেমন অদৃশ্য হয়ে গেছে! জিনিসটা এখনো ঠিক হ্যারির জামার মতো হয়ে ওঠেনি বটে, কিন্তু এ রাস্তায় আর কিছুদিন এগোলে সেটাও মনে হয় হয়ে যাবে। দারুণ ব্যাপার, তাই না?

বুদ্ধিমান হার

২০০২ সালে প্রজেক্ট সাইবর্গ-এর প্রধান কেভিন ওয়ারউইকের স্ত্রী ইরিনা একটা নেকলেস পরে দেখিয়েছেন। নেকলেসটার বিশেষত্ব হল, সেটা কেভিনের স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র দিয়ে সংযুক্ত।

কেভিনের স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নেকলেসটা রং বদলাতে থাকে। গলার হার-এর রং দেখে গিন্নি বুঝতে পারেন কর্তা রেগে আছেন নাকি খুশি আছেন।

ওয়ারউইক হলেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সংক্রান্ত গবেষণায় একজন পথিকৃৎ। ১৯৯৯ সালে তিনি এক বিচিত্র এক্সপেরিমেন্ট করেন। এতে ইংল্যাণ্ডের রিডিং নামে একটি জায়গাতে থাকা একটা বিশেষ ভাবে প্রোগ্রাম করা রোবোট প্রথমে তার যন্ত্রপাতিকে ব্যবহার করে নিজে চলে ফিরে বেড়াতে শেখে। তারপর ইন্টারনেটের মাধ্যমে সে আমেরিকায় থাকা অন্য একটা সেই জাতীয় রোবোটকে সে নিজের শেখা সেই বিদ্যেটা শিখিয়ে দিতে সক্ষম হয়। পৃথিবীর প্রথম রোবোটিক টিচিং ও লার্নিং-এর সফল পরীক্ষা হিসেবে পরীক্ষাটা গিনেস বুক-এ ঠাঁই পেয়েছে।

ভারতের বৈজ্ঞানিক

নাগার্জুন

টুপুর

অলবিরুনীর লেখা থেকে ভারতের বৈজ্ঞানিকদের অনেকের কথা জানা যায়। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন নাগার্জুন। ১১৩১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ অলবিরুণী প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানসাধকদের কথা লিখতে লিখতে নাগার্জুনের অবদানের কথা আলোচনা করেন।

নাগার্জুন মূলত রসায়ন এবং শারীরবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। এ থেকে আন্দাজ করা হয় তাঁর চর্চা ছিল চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ে। কিন্তু তিনি পেশায় তিনি চিকিৎসক ছিলেন কিনা সে কথা জানা যায় না।

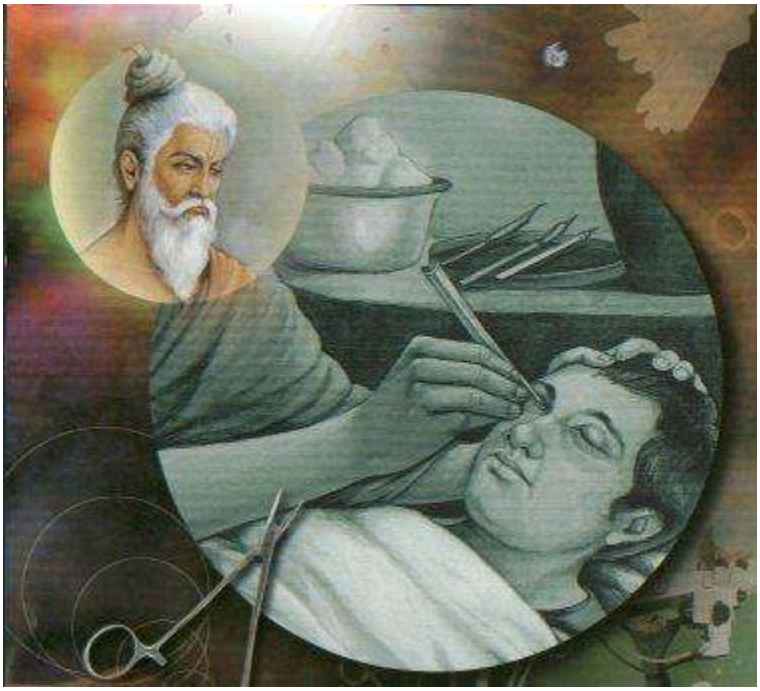

৮০০ কিংবা ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়েছিল আজকের গুজরাটে। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন।

মানুষের গর্ভযন্ত্রের সঠিক বিবরণ দিয়েছিলেন নাগার্জুন। এই অঙ্গটি কেমন দেখতে, কতটা লম্বা, কতটা চওড়া, কতটা এর বেধ তাও বলে ছিলেন তিনি।

কক্ষপুট তন্ত্র, আরোগ্যমঞ্জরী, যোগসার, যোগশতক নামের কয়েকটা বই লিখেছিলেন নাগার্জুন নিজে। তবে জোর তর্ক আছে রসরত্নাকর নামের বইটিকে ঘিরে যে এই বইটি নাগার্জুনেরই লেখা। এই বইতে মূলত বিভিন্ন ধাতুকে গলানোর প্রক্রিয়া বলা আছে। আরও বলা আছে যে কী ভাবে ধাতুর যৌগ বানাতে হয়। তবে গাছপালা থেকে বা জন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিংবা দেহাবশেষ থেকে সোনা তৈরির কথাও এই বইতে লেখা হয়েছিল। এর ফলে মনে হয় যে নাগার্জুন বজ্রযান বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী তন্ত্রসাধকও ছিলেন। এই ধারণা দৃঢ়তর করে, তাঁর বারো বছর যোগিনীর সাথে গাছের তলায় সাধনার কথা।

কিন্তু সাধনা যে তন্ত্রই করুন না কেন, যেটুকু বৈজ্ঞানিক তথ্য নাগার্জুন দিয়েছিলেন, তাই ঋদ্ধ করেছে সভ্যতাকে।

ছবি: সংগৃহীত

সত্যমঙ্গলম অভয়ারণ্য

সত্যমঙ্গলম অভয়ারণ্য তামিলনাড়ুর এরোড় জেলায়। এই জঙ্গল নীলগিরি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু সারা ভারতে এই জঙ্গলের পরিচিতির কারণ সেটা নয়। বরং সত্যমঙ্গলমকে দুনিয়া চিনেছে তার কলঙ্কে।

নীলগিরির পাদদেশে সত্যমঙ্গলম জঙ্গল পশ্চিমঘাট পর্বতমালা আর পূর্বঘাট পর্বতমালার জঙ্গলের মধ্যে যোগসূত্র। এই যোগসূত্র প্রাকৃতিক এবং বাস্তুতান্ত্রিক কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হলে আজকের দিনে বাস, ট্রেন কিংবা মোটর গাড়ি করে যায়। তার জন্য লাগে রাস্তা। মানুষ কেন যায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়? খাবারের প্রয়োজনে। হ্যাঁ, মূলত: খিদে মেটানোর জন্যই মানুষ রোজগার করে, সেই রোজগারের পয়সায় খাবার আর জ্বালানি কেনে। তবে রাঁধা আর কাঁচা খাবার খেতে পায়। রোজগারের জন্যই মানুষ গ্রাম থেকে গ্রামে, শহরে, ভিনরাজ্য, ভিনদেশে যায়।

জঙ্গলের বাঘ বা হাতিরও তাই খাবার খুঁজতে এক জঙ্গল থেকে আরেক জঙ্গলে যাতায়াত। মানুষের রাস্তার পাশে ঢাবা কিংবা হোটেল থাকে, জাহাজে আর এরোপ্লেনেও খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। একটা ভারতীয় হাতির ওজন দু টন থেকে পাঁচ টন হয়। এতো বড় শরীরটাকে সুস্থভাবে বওয়ার জন্য তাদের প্রচুর খাবার লাগে। সেই খাবার কেবল ঘন জঙ্গলেই মেলে। তাই হাতি কিংবা বাঘের এক জঙ্গল থেকে আরেক জঙ্গলে যাওয়ার রাস্তাও জঙ্গলই হয়। এই জঙ্গলে ঘেরা রাস্তাকে করিডর বলে। সত্যমঙ্গলমের জঙ্গল এমনই একটা করিডর। মুদুমালাই থেকে বান্দিপুরা - দুই ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে কিংবা এদের সাথে সিগুর মালভূমি ও বিলিগিরিরঙ্গস্বামী অভয়ারণ্যের মধ্যে মূলত: হাতির করিডর হলো সত্যমঙ্গলম। তিরিশ হাজার এশীয় হাতির দশ থেকে পনের হাজারই ভারতে; আবার ভারতের হাতির অর্ধেক উত্তর-পূর্ব ভারতে আর বাকি দক্ষিণে, অধিকাংশই নীলগিরি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ অঞ্চলে। সুতরাং হাতির এই সুবৃহৎ সংসার রাখতে গেলে করিডর জঙ্গল থাকা ভীষণ জরুরি।

আবার হাতির করিডর হওয়ার কারণেই এই সত্যমঙ্গলমের জঙ্গলে আস্তানা বানিয়েছিলেন কুশে মুনেস্বামী ভীরাপ্পান। তিনি জীবনধারণের জন্য বেছে নিয়েছিলেন হাতির দাঁত এবং চন্দন কাঠ বিক্রির

ব্যাবসা। ফলে তিনি নিজের প্রয়োজন মাফিক হাতি মারতেন, চন্দন গাছ কাটতেন। যেহেতু ভারতের মাটিতে এই দুটো জিনিসেরই ব্যবসা বেআইনি, তাই হাতি মারা এবং চন্দন গাছ কাটার সাথে সাথে বেআইনি ব্যবসার পথের বাধা মানুষদের মারতে, আহত করতে, ভয় দেখানোর জন্য অপহরণ করতে কিংবা যেকোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে তিনি পিছপা ছিলেন না। গাছ আর জীবজন্তুদের মধ্যে হিংসে বা ভালোবাসার সম্পর্কের জেরে প্রকৃতির বিভিন্ন নির্জীব উপাদানের পরিমাণ এবং গাছ ও জীবজন্তুর সংখ্যা ও পরিমাণ ঠিক থাকে। গাছ, জীবজন্তু আর নির্জীবের দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ককে বাস্তুতন্ত্র বলা হয়। মানুষও বাস্তুতন্ত্রের অংশ। তার নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকার জন্য, কোটি কোটি বছরেরও বেশি পৃথিবীতে টিঁকে থাকার জন্য বাস্তুতন্ত্রকে স্বাভাবিক রাখতে হবে। সেখানে ভীরাপ্পানের মতো একটামাত্র মানুষের পঁয়ষট্টি-সত্তর-বা-আশি বছর ভালোভাবে বেঁচে থাকার লোভ বাস্তুতন্ত্র এবং সেইসঙ্গে মানুষের ভবিষ্যতকে অনিশ্চিত করে। ২০০৪-এর অক্টোবর মাসের ১৮ তারিখে ভীরাপ্পানের বেআইনি কাজকর্ম থামে, তিনি নিহত হন তামিলনাড়ু আর কর্ণাটকের পুলিশদের নিয়ে বানানো জয়েন্ট টাস্ক ফোর্সের হাতে।

জন্তুর মধ্যে বাঘ আর হাতি ছাড়াও সত্যমঙ্গলমে পাওয়া যায় চিতল, চিতা, কৃষ্ণসার মৃগ (ব্ল্যাকবাক), গাউর, সাম্বার, চৌশিঙ্গা, বার্কিং ডিয়ার বা মুনজ্যাক, ভালুক, বুনো শুয়োর, হায়না। পাখির মধ্যে প্রধান হলো ছাতারে, বুলবুল, শালিখ, কাক, শ্যামা, গিপস্ নামের শকুন। চন্দন ছাড়া বড় গাছের মধ্যে আছে সিলভার ওক, সেগুন, নিম, শিরিষ, খয়ের, ধ, বাঁদরলাঠি, সিতাশাল, অঞ্জন, বিষতেন্দু, পিয়াশাল, আসন বা সাজ, বহেড়া ইত্যাদি শুষ্ক পর্ণমোচীরা। এদের অধিকাংশের কাঠ থেকেই ভালো আসবাব বানানো যায়। তবে এদের অধিকাংশের ফল, বাকল ইত্যাদি থেকে নানা ওষুধও বানানো যায়। তাছাড়া মিশ্র পর্ণমোচী এবং চিরহরিৎ বা শোলা জঙ্গলও আছে এখানে। কাঁটাঝোপ, লতা, গুল্মও আছে অনেক রকম।

বহুদিন থেকেই সত্যমঙ্গলম রিজার্ভ ফরেস্ট ছিল। ২০০৮ সালে এই ৫২৪.৩৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ২০১০ সালে এই বনে ৪৬টা বাঘ থাকার সম্ভাবনা দেখা গেছে। বাঘের সংখ্যা হিসেবে ৪৬ খুব কম নয়। সে কথা বিবেচনা করে এই জঙ্গলকে হয়তো জাতীয় ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতায় আনা হবে শিগগির।

ছবি: সংগৃহীত

বাঘতাড়ু

জে জে দত্ত

১৯৫৪ সালের কথা। আমি তখন হরদার ডি এফ ও। আমার হেডোকোয়ার্টার ছিলো টিমরণি নামের একটা গ্রামে। জায়গাটা হারদা থেকে তেরো কিলোমিটার পুবে। আসলে হারদায় তখন ফরেস্ট ডিভিশন সবে তৈরি হয়েছে। ফলে সেখানে অফিসটফিস কিছু নেই।

টিমারণিতে বনবিভাগের একটা বিরাট কাঠের গোলা ছিলো। গোলার জমিতে ছিলো অনেকগুলো খাপরার শেড। তার একটাতে অফিস আর ডিপো অফিসারের কোয়ার্টারে আমার বাসা হল। চারপাশে সেগুনের হাজার হাজার ঘনফুট কাঠ। বনবিভাগের লোকজন তা কেটে আনতেন। কাঠের নিলামও করত বনবিভাগ ওই গোলা থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধের প্রয়োজনে কাঠ সরবরাহ করবার জন্য এই গোলার সৃষ্টি হয় ১৯৪০ সাল নাগাদ। এ গোলার কাঠ সে'সময় প্রধানত রেললাইনের স্লিপার তৈরির কাজে ব্যবহার হতো।

টিমারণির তেরো কিলোমিটার দক্ষিণে রাহাটগাঁও নামে একটা গ্রাম আছে। সেখানে আমাদের রেঞ্জ অফিস ছিলো।সেখান থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে মগরধা গ্রামে দ্বিতীয় রেঞ্জ অফিস। মগরধার দফতরের পরিদর্শনের জন্য একদিন সন্ধেবেলা টেমারণি থেকে বেরিয়ে রাহাটগাঁও হয়ে মগরধার দিকে যাচ্ছিলাম।

বেরিয়েছিলাম সপরিবারে। সেসময় গরমের ছুটিতে আমার কলেজে পড়া ভাই এসে রয়েছে আমার কাছে। সঙ্গে সে ছাড়াও ছিলেন আমার স্ত্রী, ড্রাইভার কাম চাপরাসি মজিদ আর আমাদের তিনমাস বয়সী মেয়ে। সেকালের ভি এইট ফোর্ড স্টেশন ওয়াগন গাড়ি। ইস্পাতের তৈরি বেজায় শক্তপোক্ত শরীর তার। মজিদ অবশ্য সেদিন গাড়ি চালাচ্ছিল না। সে বসে ছিল আমার ভাইয়ের সঙ্গে

পেছনের সিটে। ড্রাইভ করছিলাম আমি। ঘুমন্ত মেয়েকে কোলে নিয়ে স্ত্রী বসেছিলেন আমার পাশে। সে সময় মগরধার আশেপাশে বাঘের উপদ্রবের কথা আমার কানে এসেছিলো। গ্রামের বেশ কিছু পোষা জীব তার শিকার হয়েছে ততদিনে। গ্রামে ঢুকে শিকার করা, বাঘের বুড়ো হবার চিহ্ন। বয়স্ক বাঘ দৌড়োদৌড়ি করে বনের পশু শিকারে ব্যর্থ হতে শুরু করলে তার নজর পড়ে মানুষের গ্রামের দিকে। এইধরণের বুড়ো বাঘ বেঁচে থাকলে আরো বুড়ো হয়ে গিয়ে মানুষখেকো হয়ে যাবার সমভাবনা থাকে। কাজেই , এই গৃহস্থের পোষা জীব শিকার করা বাঘটাকে মারবার একটা পরিকল্পনা আমার ছিলই।

মগরধা গ্রামের কিলোমিটারদুয়েক আগেই শুরু হয়ে যেত ঘন জঙ্গল। সে গ্রাম অবধি তখনও পাকা রাস্তা এসে পৌঁছোয়নি। সন্ধের মুখমুখ পাকা রাস্তা থেকে মগরধার দিকে যাওয়া কাঁচা রাস্তায় গিয়ে নামতেই দেখলাম মিটার পনেরো দূর দিয়ে বাঁয়ের ছিটে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে রাস্তা পেরিয়ে ডাইনের জঙ্গলের দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে বিরাট একটা জন্তু। দেখেই ভাইকে ডেকে বলতে সে তাড়াতাড়ি সার্চলাইটের আলো ফেললো সামনে। সেই আলোয় দেখি, বিরাট বড়ো এক কেঁদো বাঘ! হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখে থমকে দাঁড়িয়ে সে তখন ঘুরে তাকিয়েছে এদিকে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলাম আমরা। স্টিয়ারিং হুইল গাড়ির ডানদিকে থাকায় গাড়ির জানালা দিয়ে বন্দুক বাড়িয়ে ডান হাতে ব্যারেল ধরে বাঁহাতে ট্রিগার টেপা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। কিন্তু তখন আর অবস্থান বদলাবার উপায় নেই। অতএব উল্টো হাতেই চেষ্টা করতে হবে তখন আমায়।

ওদিকে হয়েছে কি, পাছে গুলি করবার সময় বন্দুকের আওয়াজ বা বাঘের গর্জনে মেয়ের ঘুম ভেঙে যায় তাই আমার স্ত্রী তখন ঘুমন্ত মেয়ের কানের ওপর দুটো হাত চাপা দিয়ে ধরেছেন। আর তাতে শান্ত থাকবার বদলে ঘুম ভেঙে উঠে মেয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছে। সে আওয়াজ শুনে বাঘ সঙ্গেসঙ্গেই আমায় ট্রিগার টেপার সুযোগ না দিয়েই এক লাফে উধাও হল ডানদিকের জঙ্গলে। হাতের বন্দুক হাতেই রয়ে গেল আমার। গুলি আর ছোঁড়া হল না।

সে যে কি বেজায় রাগ হয়ে গিয়েছিল আমার, কি বলবো তোমাদের! রাত্রিবেলা মগরধা পৌঁছে রাগ করেই বসে থাকলাম আমি। আর ভাই আর গিন্নি মিলে বাড়ি থেকে আনা পরোটা আর পাঁঠার মাংস দিয়ে ডিনার করলেন মহাসুখে। আর সেইসব কাণ্ডকারখানার মধ্যে আমার তিনমাসের মেয়ে মজা করে ঘুমিয়েই রইল।

ছবি: সংগৃহীত

চালচিত্তির খেলা

তরুণ কুমার সরখেল

ঐ যে দেখো মাথার উপর চালচিত্তির খেলা
উপুড় করা জলের কলস বইছে সারা বেলা।

ঐ যে দেখো মাঠের ধারে আলোকলতার বনে
পথ ভুলে কি সোনালি রোদ গাইছে আপনমনে ?

ঐ যে দেখো শাপলা বনে রসুন ফড়িং নাচে
রোদ ঝিক্ মিক্ আলোর খেলা স্বচ্ছ জলের কাচে।

ঐ যে দেখো রাংতা মোড়া চামর দোলা কাশে
মন ভোলানো প্রাণ দোলানে শরত রানি হাসে!

সব পারে

রতনতনু ঘাটী

বাবা বলবেন ‘‘দুষ্টু ভীষণ!’’
মা বলবেন, ‘‘বোকা!’’
দিদু বলবেন, ‘‘ছোট্টুটা তো
কমিকস বইয়ের পোকা!’’

‘‘এই ফেলছেন জলের গেলাস
এই ভাঙছেন শিশি!’’
এসব বলেন যখন আসেন
শিমুলতলার পিসি।

এই তো সেদিন মিতিনকাকুর
ছোট মেয়ে দোলা
ওরই সঙ্গে ইচ্ছেমতন
ডাকছিলো হরবোলা।

দাদু বললেন, ‘‘ছোট্টু কাণ্ড
তোমরা সবাই শোনো,

ছবি: সোমা

আগে তো কই এসব ব্যাপার
দেখিইনি কক্ষনো!

ঠিক শুনশান দুপুরবেলায়
ব্যস্ত ঠামি ঘুমে
তালদিঘিতে নৌকা ভাসার
দৃশ্যটা বাথরুমে।’’

আঁকার পাতাই নৌকা তখন
জলের ট্যাঙ্কি সাফ
দাদুর হাতের গাট্টা খেয়ে
ছোট্টু চাইছে মাফ।

কিন্তু সেবার তুমুল কাণ্ড
গোট্টা বাড়িই হাসে
আর কিছু নয়, ছোট্টুবাবুই
ফার্স্ট হয়েছেন ক্লাসে।

টুনটুনির চালাকি

(উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনি ও বিড়ালের কথা' অবলম্বনে)

অচিন্ত্য সুরাল

বেগুনগাছের আবডলে এক ছোট্ট মতন বাসা
বাচ্চা নিয়ে টুনটুনিটার কাটছিল দিন খাসা।
এমনসময় বিড়ালমাসী ফন্দি মনে আঁটে
তিনটে ছানা খাবার লোভে ঠোঁটটা খালি চাটে
টুনটুনিটা চালাক ভারি বললো তাকে হেসে
প্রণাম তোমায় মহারানি প্রণাম ভালবেসে

মহারানি খেতাব পেয়ে বিড়াল বেজায় খুশি
কালকে আবার আসবে ভেবে ফিরল ঘরে পুষি
বিড়ালপুষি রোজই আসে আসল কথা চেপে
দেখলে তাকে ছোট্ট টুনির বুকটা ওঠে কেঁপে
'গড় হই গো মহারানি,' টুনি বলে হেঁকে
এমনি করেই দিন করে পার ভয়টা রাখে ঢেকে

একদিন সে বললো, 'আমার সোনার বাছা ওরে
যা তো উড়ে পারিস নাকি তালগাছটার পরে'

ও মা একী! ফুরুৎ করে তিনটে কচি ছানা
বসল গিয়ে তালের ডগায় হাওয়ায় মেলে ডানা
বিড়াল তখন ভাবছে বসে নয়কো দেরি আর
কালই খাব টুনির ছানা ছাল মাংস হাড়
পরের দিনে খুব ভোরে বিড়াল এলে তার দোরে
চোখ পাকিয়ে টুনটুনি
বললো,'কী চাই তোর, শুনি?
দূর হ তুই লক্ষ্মীছাড়া, ব্যাটা পাজির পা ঝাড়া'
বিড়াল তখন খুব রেগে
লাফ দিয়েছে জোর বেগে

ধিন কেটে তাক ধিন তা না
টুনটুনি আর তিন ছানা
উড়ে গিয়ে তালগাছে, ধাগে ধিন ধা জোর নাচে

বেগুনকাঁটার জ্বালায় মরে বিড়াল কালো মুখে
ফিরল ঘরে, টুনটুনি আর বাচ্চা থাকে সুখে।

ছবি: সোমা

ইন্দি ঠাকরুণের ছেলেপিলে

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দি পিসির ছা
ঘুরেও দেখেন না
মায়ের ওপর রাগ করেছেন
মাটিও ছোঁবেন না।
ভাই কারে না রা
তারই সঙ্গে যা
গলায় গলায় ভাব তাহাদের
তাল মিলিয়ে পা।
সার বুঝেছেন যা
কা এর আগে টা
তাদের যত খোকাখুকু
একই সা রে গা।

ছবি: সোমা

ভেনিস

ঈশিতা ভাদুড়ি

বলো তো দেখি দেশের নাম
হাজার লিরা জলের দাম
নৌকা করে অফিস-বাড়ি
সেই দেশেতে সেটাই গাড়ি
তাদের সব দরাজ গলা
গানটি করে গনড্--ওলা
টিনটোরেটো কোথায় থাকে
অন্ধগলি নদীর বাঁকে
বলতে পারো কোন সে ভাষা
মানুষজন লম্বা খাসা
পিজা খায় ভীষণ হাসে
কী সে শহর জলেই ভাসে
নামটি তার আজব যেন
ভাবছো বুঝি ভেনিস কেন

ছবি: সোমা

মানবদেহ

শেখর রায়

সাতটি রঙের রামধনু
একজোড়া হাত দশটি আঙুল
পায়ের কথা ধরলে পরে
এক-এক-পায়ে পাঁচটি করে
একজোড়া চোখ কালো ভোমরা
তার নিচে নাক আছে খাড়া
ডাক শুনলেই দেবে সাড়া।
হাসলে পরে লাগে মিঠে
পেটে খেলে সয় যে পিঠে।
টক-ঝাল আর মিষ্টি কটু
খেয়ে দেখেন পেটুক বটু।
দুই পাশে দুই চওড়া গাল
গাল-বাদ্যে দিচ্ছে তাল।
তাতেই ফোটে মায়ের স্নেহ
সবার উপরে আছে মগজ
বিদ্যা বুদ্ধি স্মৃতি ভান্ডার
ছয়টি ঋতুর পরী
কর গুনে দুই কুড়ি।
একজোড়া পা দশটি আঙুল
হিসাবে তার নেই কোন ভুল
ফুলের বাগান দেয় পাহারা
দু পাশে কান সজাগ প্রখর
বত্রিশপাটি দাঁতের ঝিলিক
মাছ-মাংস পোলাও-লুচি
এক রসনায় সব কিছু স্বাদ
নন্দীমশাই চোখে দেখেন
তোবড়ানো কি ফুলকো লুচি
যেন তবলা-বাঁয়ার যুগলবন্দী
উপর নিচে ওষ্ঠ দু-ভাগ
কপট শাসন আর অনুরাগ।
চিকন চুলে থাকে ঢাকা
মজুত করে সেথায় রাখা।

আরও আছে অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে গড়া
হৃদপিন্ডের ধুকপুকানি বাঁচা এবং মরা।

ছবি : সৌভিক

বৈজ্ঞানিক

আবু হোসেন

বাগবাজারের বিজ্ঞানি
শ্রী বজ্রবদন নন্দি
রকেট ছাড়াই চন্দ্রে যাবেন
এমনি ছিল ফন্দি

তিরিশ তলার ওপর থেকে
উড়তে গিয়ে পাকড়ালো কে?
রাঁচির কাছে কাঁক গারদে
বজ্র এখন বন্দি।

ছবি : সৌভিক

রামে-রাবণে

পাহারু চট্টোপাধ্যায়

‘এতক্ষণে’, কহিলা ভোদুপতি
তেজোদৃপ্ত স্বরে, ‘প্রাণ করে
উড়ু উড়ু; যেমনি পুলকিত ঝড়ে
সুমহান মহীরুহ দল--
তেমনি চঞ্চল আহা!
ঐ আয় ত্বরা কর
চেলা গুণধর।

বাজারে মিলিল কিবা তরল বমাল
ভাণ্ডটির শেষবিন্দু সিন্ধুজ্ঞানে করিয়া লেহন
মন তার হইল রাঙাল।
মহাস্ফুর্তি, মহাস্ফুর্তি প্রাণে
গুণধরে কহিল ভোদু, ‘আয় দোঁহে
যাত্রা করি, মজি রামায়ণে।
আমি সাজি রাম আর তুই ব্যাটা হোঁতকা রাবণ,
চুল ছিঁড়ি মুন্ডুখানা টাকু করি দিব
পাঠাইব শমন সদন।’

গুণধর রাজি হলে রামযাত্রা শুরু হল বেশ।
ঢাঁই ঢুঁই কটাকট আছাড়ি পিছাড়ি দোঁহে
সহে নানা ক্লেশ।
ভোদু কহে, ‘ওরে ছুঁচো, ইঁদুর পুত্তলি
সীতহরণের পাপে এত ডুবে গেলি, তবু
জ্ঞান তোর হইল না গাধা,
দেখিলি না চক্ষুদুটি মেলে
আসিছে দারোগা, তোর
লংকা হতে চ্যাংদোলা তুলে
নরকের জেলে ভরি দিবে।
দেশবাসী কবে, সাধু সাধু ভোদুপতি
শিক্ষে বড় দিলে গুণধরে, অর্বাচীন মতিহর,
সামনে যমের দোর বোঝে নাই।

একখানি ভাণ্ডমাত্র, তার সিংহভাগ
একা মেরে দিলে?'

গুণধর বহুক্ষণ অতিকষ্টে সাজিয়া রাবণ
চুপ করি ছিলা।
রাবণে হারিতে হবে--এই বড় জ্বালা
বিঁধিছে কন্টক যথা মাতাল হৃদয়ে।
হোক সে মাতাল, তবু অকারণে 'তস্কর' গাল

প্রাক্তন কুস্তিগীরে যেন নাহি সহে।

সত্য বটে গুণধর পালোয়ান কিছু
তিনমণ ওজন তাহার, একদিনে হয় নাই।
তার তরে ভোদুপতি প্যাঁকাটি সদৃশ
নেংটি ইঁদুরসম ঘোরে পিছু পিছু।
প্রকাণ্ড জালার গায়ে টিকটিকি যথা।
'দেখাইব তোরে মূঢ়,' আচম্বিতে গুণধর
উঠিল রুষিয়া। কষিয়া ভুঁড়ির রশি

জোরসে বাঁধিল আর
বসিল ভোদুর শিরে
গন্ধমাদনসম লম্ফ দিয়ে জোরে।
সত্যই যুদ্ধ শুরু হইল তখন।

‘কে আছো বাঁচাও, বাঁচাও
হোঁতকা অতি গুণধর, বুঝি মারিল আমারে!’
ভোদুর সে আর্তনাদে টলিল বাতাস
ছড়ায়ে পড়িল তাহা দূরে অতিদূরে।

হেনকালে তাগড়াই
যেন হাতিসম কনস্টেবল,
খুঁজে আঁতিপাতি
একমনে মারিতেছিল মক্ষিকা কতিপয়
গাছের ছায়ায়।
কাতর রামের চিৎকার
পঁহুচিল আসি কর্ণদ্বয়ে তার
লাঠি ফেলে তখনি সে গোঁফে দিল চাড়
হাজার দু হাজার
তারপরে দুমাদুম বিভীষণ কিল
এলোমেলো দিয়া পলকে ছাড়াইল দোঁহায়
গুণধরে ফেলিল পারিয়া ভূমির সমীপে।
সেই অবকাশে
ভোদুপতি ধূলিশয্যা ত্যাগ করি
দাঁড়াইল ক্লেশে। টলমল চারিধার তবু
কহে হরষিয়া
‘আর বাবা রামায়ণে নাহি কাজ যাই আমি
হনুমানটা ছিল বলে গেলেম বাঁচিয়া।’

ঘুনসীবুড়ির জামাই

অমিতাভ প্রামাণিক

ব্যাপার কী রে -
কঞ্চি হাতে,
বাপ মরেছে
বাপ না, কাকা?
ক্যামনে ম'লো
হাত- পা গুলো
বলিস কি রে!
এতই ছিলো?
রিকশ টানা?
মর্‌সে বোধহয়
যক্ষ্মারোগে
অক্কা গেলো
ঘুন্‌সীবুড়ির
কি পেটখারাপ,
বলবো কি ভাই
ফুঁকতো সে লাল
সময় পেলে
ঐ সুতোতেই
নরম কাঁথা
আর সকালে
ওর বাগানে
মুরগি ম'লো;
সবাই মিলে
মাখলো, দিয়ে
বড়দাটা ওর
সে পান খেতো

অনেকটা রাত
ভুগতো না সে
তার যে ছেলে
ব্লাউজ বেঁধে
নাচতো ভীষণ
রাত বারোটায়
একদিন সেই
বলছি দাঁড়া,

মুন্ডি ন্যাড়া,
প্যান্টটা ছেঁড়া?
কাল বিকেলে?
বাপ তো জেলে!
খুল্লতাত?
ফুললো এতো!
কাজের নেশা
কি তার পেশা?
মৌলালিতে?
দ্যাখ্, টিবিতে।
পক্ষাঘাতে
সেদিন রাতে
জামাইখানা।
কি পায়খানা!
বুড়ির ছিরি –
সুতোর বিড়ি!
দুকুরবেলায়
করতো সেলাই
কি গামছাখান
দেখতো বাগান।
কুলের কাঁটায়
না কি পাঁঠাই?
সে মাংসটা
পানের বোঁটা।
জর্দা দিয়ে
মাচায় গিয়ে।

থাকতো মাচায় –
ঘোর আমাশায়!
গৌরনিতাই,
তার সে দু পায়
মোহিনী- আট –
চড়তো ফিয়াট!
গাড়ির চাকায়,
রাস্তা ফাঁকাই

যেমন থাকে তেমনি ছিল।
পাথর- কুকুর কিম্বা পিলো
কিচ্ছুটি না। কিন্তু হঠাৎ
গৌর ব্যাটা যেমনি বাঁ কাৎ
ঘুরিয়ে দিলো গাড়ির হুইল,
ফটাস করে একটা উইল
পড়লো খসে বনেট থেকে,
সবাই মিলে ফেললো ছেঁকে।
কি আছে রে উইলটাতে?
পড়তে বসে সে মাঝরাতে।
পিসির এত বিষয়- জমি,
কিছু তো তার। যতই কমই
দিক না কেন, তাতেই হবে
দু- তিন পুরুষ সবান্ধবে
চলবে খুবই নবাব চালে
পিসির দানের এ ট্যাঁকশালে।
জোত- জমি আর বাড়িটা এই
পুকুরগুলো সে তো পাবেই।
তিনটে নাগাদ পড়লো জানা
তার ভাগে ঐ ঘুনসীখানা!
সব কিছু সে জামাইটাকে
দান করেছে। ব্যাটার টাকে
চুল গজালো। আনন্দেতে
তক্ষুণি সে বসলো খেতে
কুলের টক, আর মন্ডা মিঠাই,
সব পেয়েছে আর সে কী চায়?
খেতে খেতেই ছাড়লো সে পেট –
বদ্যিবাড়ি পৌঁছলো লেট।
বদ্যিমশাই নিদান দিলে,
হাসির চোটে চমকে পিলে
ছুঁচলো হয়ে পেন্সিল- শিস –
সেটার থেকেই প্যারালিসিস!
ঐ পিলেটা চমকে ঢিবি
পেটের ভেতর গজায় টিবি।
সেই কারণেই বলছি তোকে,
কক্ষণো না নেশার ঝোঁকে
হাত দিবি না পরের ভোগে –
মরবি তবে যক্ষ্মারোগে
তার চে’ ভালো গাড়ির চাকা।
বাপকে বলিস, নেই তো কাকা!

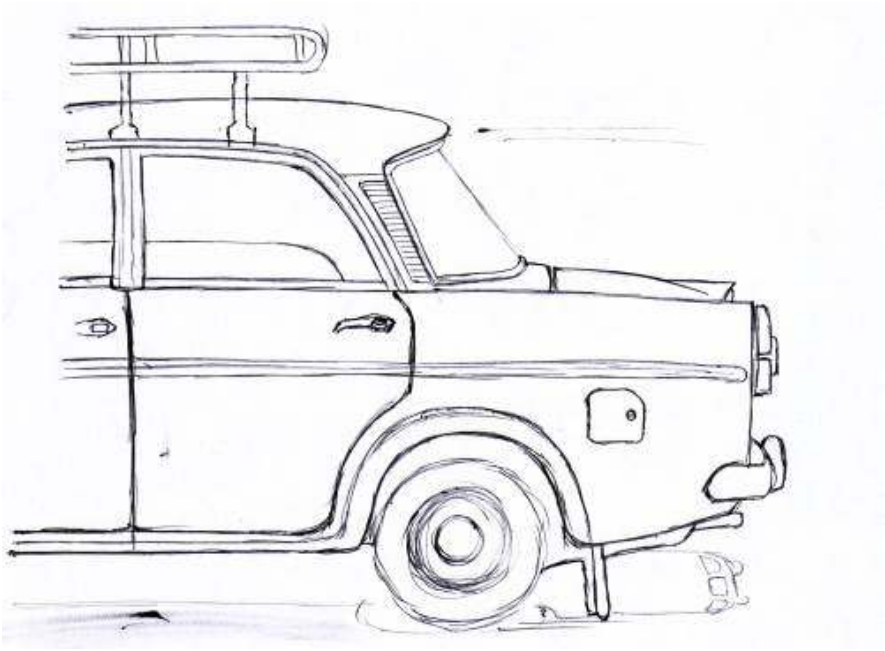

ঝিলিমিলির সন্ন্যাসিনী

ছত্তিশগঢ় রাজ্যের জশপুর জেলার ঝিলিমিলি গ্রামে কিরণ নামে একটি মেয়ে থাকে। আজ 'দেশ ও মানুষ'-এ তার কথা শোনাবো। ঝিলিমিলি গ্রামের কাছেই রয়েছে গভীর বন। ওঁরাও প্রজাতির মেয়ে কিরণদের সেই অরণ্য থেকেই অন্নসংস্থান করতে হয়। একদিন সেই জঙ্গলে কাঠকুটো, লতাপাতা কুড়োতে গিয়েছিলো কিরণ। ফিরে এসে সে ঝিলিমিলি গ্রামের লোকেদের একটা বিচিত্র গল্প শোনালো। গল্পটা এইরকম--

বনের মধ্যে মাথা নিচু করে কাজ করছিলো কিরণ, এমন সময় সে একটা হিস হিস শব্দ শুনতে পায়। চোখ তুলে দেখে প্রকাণ্ড একটা বিষধর সাপ এসে তার সামনে ফনা তুলে দাঁড়িয়েছে। তাতে মোটেও ভয় না পেয়ে কিরণ হাতজোড় করে সাপটাকে বললো, 'আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করিনি। আমি সজ্ঞানে কখনও কোনও পাপও করিনি। তুমিও তাহলে আমার কোন ক্ষতি করতে পারোনা।'

এই বলার সঙ্গে সঙ্গে নাকি সাপটা তার সামনে থেকে ফনা নামিয়ে চলে যায়। এর পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কিরণ বললো, রাত্রে সে যিশুখৃষ্টকে স্বপ্নে দেখেছে। সাপটা নাকি যিশুরই পাঠানো। তাকে পরীক্ষা করবার জন্য। ভয় না পাবার পরীক্ষায় কিরণ পাশ করেছে। স্বপ্নে যিশু নাকি তাকে অনেক রোগের চিকিৎসা করবার কায়দা শিখিয়ে দিয়ে বলে গেছেন মানুষের ভালো করতে।

সেই থেকে কিরণ হয়ে গেছে সে এলাকার ডাক্তার। সাধারণ , পরিচিত শারীরিক অসুখে সে ব্যবহার করে গাছগাছালির থেকে তৈরি ভেষজ ওষুধ। কিন্তু অসুখ গুরুতর হলে , যখন সকলের বিশ্বাস হয় যে রোগিকে কোন অশুভ আত্মা আক্রমণ করেছে, তখন ভেষজ চিকিৎসার পাশাপাশি শুরু হয় মানসিক চিকিৎসাও। সে চিকিৎসার প্রধান পদ্ধতি হল রোগিকে সঙ্গে নিয়ে বারংবার বিশেষ পদ্ধতিতে যিশুখৃষ্টের কাছে রোগ সারিয়ে দেবার জন্য আকুল প্রার্থনা। আধুনিক দেশের আধুনিক মনোবিদরা বলেন এই ধরনের প্রার্থনায় মনের জোর বাড়ে, শরীরও রোগের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য বেশি শক্তি পায়।

জশপুরের বিভিন্ন অজ গ্রামের খৃষ্টান ওঁরাও সমপ্রদায়ের মধ্যে এই মুহূর্তে কিরণ একটি জনপ্রিয় নাম। সন্ন্যাসিনী হয়ে নি:স্বার্থভাবে নিজের লোকজনের সেবা করে চলেছে বছর বত্রিশের এই অবিবাহিত মেয়েটা। চিকিৎসার জন্য কোন ফিজ সে দাবি করে না। কারণটা সহজ। তার সমপ্রদায়ের মধ্যে টাকা দিয়ে চিকিৎসা করাবার ক্ষমতা খুব কম লোকেরই আছে।

ভারতের আরো কিছু রাজ্যের মতন ছত্তিশগঢ়েও বহু গ্রামেই এখনও সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত নেই। শহরে পড়াশোনা করে পাশ করা ডাক্তারেরা সেইসব গ্রাম্য জায়গার নামে নাক কুঁচকোন। তাহলে সেইসব গ্রামের মানুষের অসুখেবিসুখে চিকিৎসা করে প্রাণ বাঁচাবে কে? কিরণের মত মানুষেরা এর দায়িত্ব নেন। অল্পশিক্ষিত মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে পুঁজি করে মনোচিকিৎসা এবং নিজেদের অর্জিত ভেষজ চিকিৎসার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে চারপাশের বনেজঙ্গলে ছড়িয়ে থাকা গাছগাছড়ার সাহায্যে শারীরিক চিকিৎসা, এই দুয়ের সাহায্যে গরিব মানুষের ভালো করা।

স্কুল-কলেজে না পড়া কিরণ কোনদিন রাষ্ট্রপতির পুরষ্কার পাবেন না। এই দেশের কোন টেলিভিশন চ্যানেল তাঁকে মোটেই কোন ইন্ডিয়ান আইডল বানাবে না কোনদিন। তবু জেনে রেখো, সাধারণ মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এই স্বল্পশিক্ষিত, গরিব, তবুও অসাধারণ মানুষগুলোই আমাদের দেশের প্রকৃত স্পিরিট। ঝিলিমিলি গ্রামের কিরণকে জয়ঢাক সেলাম জানায়।

ছবি:মৌসুমী

ধাঁধা

''বুঝলি ইন্দ্র, সেদিন উইক এন্ড ট্রিপে গেছিলাম কোস্টাল ট্রেক-এ।''

''সে তুমি যেখানে খুশি যাও না, আমার তাতে কী?''

''এই দেখো, রাগ করিস কেন?''

''না , রাগ করবো না! উনি যাবেন মহানন্দে বেড়াতে আর আমি ঘরে বসে বসে বসে জয়ঢাকের পাতা সাজাবো আর ধাঁধা চাইতে এসে নাহক বেড়াবার গল্প শুনবো।''

মামামণি আমার দিকে ঘুরে বসে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, '' আচ্ছা ঠিক আছে। বেড়াবার গল্পও হবে, সঙ্গে সঙ্গে ধাঁধাও পাবি। শোন তবে। কাগজ কলম নিয়ে বোস।

''সারাদিন সমুদ্রের ধার ধরে হেঁটে সেদিন সন্ধেবেলা প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে একটা দোমাথার মোড়ে এসে দেখি দুই পথের মুখে দুটো লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাঝখানে একটা সাইনবোর্ড। তাতে লেখা আছে, এর মধ্যে একটা পথ যায় ডাকবাংলোর দিকে । সে পথের মুখে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে সে সত্যবাদি। আর অন্য পথটা যায় জঙ্গলের দিকে। সে পথের মুখে যে দাঁড়িয়ে আছে সে মিথ্যাবাদি। এদের মধ্যে যেকোন একজনকে একটাই মাত্র প্রশ্ন করতে পারবেন।

''বলতো দেখি কোনজনকে কী প্রশ্ন করে ডাকবাংলোর পথ খুঁজে বের করা যাবে? এটা এবারের **প্রথম ধাঁধা**।''

''পথটা খুঁজে পেয়েছিলে?''

''হ্যাঁ পেয়েছিলাম। না পেলে দু নম্বর ধাঁধাটা আসতো কোথা থেকে? এবারে শোন। ডাকবাংলোয় পৌঁছে দেখি সেখানে একটা হ্যারিকেন, একটা মশাল, একটা কাঠ সাজানো ফায়ার প্লেস আর একটা রান্না করার স্টোভ রয়েছে। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে দেশলাই বের দেখি তাতে একটাই মাত্র কাঠি। বলতো দেখি আমি প্রথমে কোনটা জ্বালালাম? এটা এবারের **দু নম্বর ধাঁধা**।''

''উ: মামামণি , তোমার এই পচা ভ্রমণকাহিনী বন্ধ করে এবারে অন্য ধাঁধা দেবে তো বলো, নয়তো আমি চললাম।''

'' আচ্ছা, আচ্ছা, এতই যখন হিংসে হচ্ছে আমার বেড়ানোর গল্প শুনে তখন আর বলছি না। এই নে অন্য ধাঁধা।

তৃতীয় ধাঁধাঃ একটা হোটেলে নটা সিঙ্গল রুম আছে। একদিন সেখানে একসাথে দশটা লোক এসে প্রত্যেকে একটা করে আলাদা রুম চাইলো। হোটেলওয়ালা করলো কি, প্রথম দুজনকে বললো, আপনারা একটু এক ঘরে চেক ইন করুন, আমি একটু পরে দ্বিতীয় রুমটা দিচ্ছি। বকি রইল নটা লোক। তারপর সে ছ নম্বর ঘরে সপ্তম, তিন নম্বর ঘরে চতুর্থ, আট নম্বর ঘরে তৃতীয় , সাত নম্বর ঘরে অষ্টম , চার নম্বর ঘরে ষষ্ঠ, পাঁচ নম্বর ঘরে পঞ্চম আর সবশেষে দু নম্বর ঘরে নবম লোকটাকে ঢুকিয়ে দিল। বাকি রইল একটা ঘর। সেখানে সে এক নম্বর ঘরের দ্বিতীয় লোকটাকে , অর্থাৎ দশ নম্বর লোকটাকে এনে ঢুকিয়ে দিল। ব্যাস , সমস্যা শেষ। কী করে ব্যাপারটা হল বল তো?

কুইজ

১। লবের পিসির নাম কী ছিলো?

২। শত্রুঘ্নর জামাইবাবু কে ছিলেন?
৩। হিমালয়ের বড়নাতির নাম কী?
৪। কার বরকে শিব ছাই করে দিয়েছিল?
৫। কোন রাক্ষস শিবের বরে মঙ্গলগ্রহ হয়েছিলো?
৬। হিড়িম্বার ছেলের নাম কী ছিল?
৭। একচক্রা নগরীতে ভীম কোন রাক্ষসকে মেরেছিলো?
৮। বিভাণ্ডক মুনির ছেলে কোন রাজার মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন?
৯। কোন মুনির মা হরিণ ছিলেন?
১০। জতুগৃহে কারা পুড়ে মরেছিলেন?

ডুডলঃ

বলোতো এটা কী?

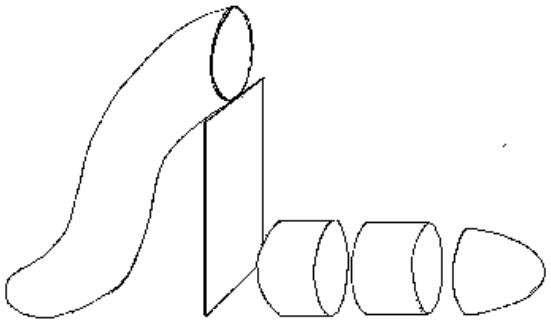

এবারে রঙিন বাক্সের অক্ষরগুলো নিয়ে এই বস্তুটার অন্য একটা নাম বানাও –*তিনতলা বসতবাড়ি*

মজার খেলা

সঙ্গে দেয়া সাতটা টুকরোকে জুড়ে একটা বর্গক্ষেত্র বানাতে পারবে?

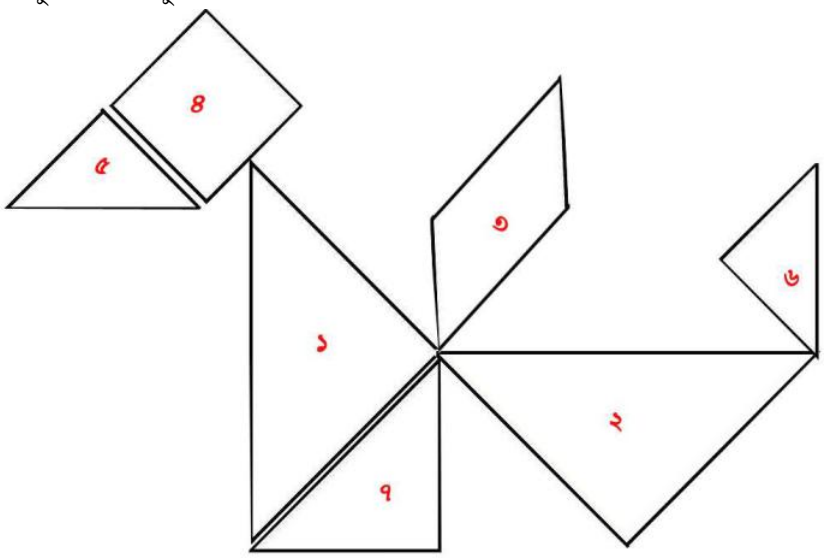

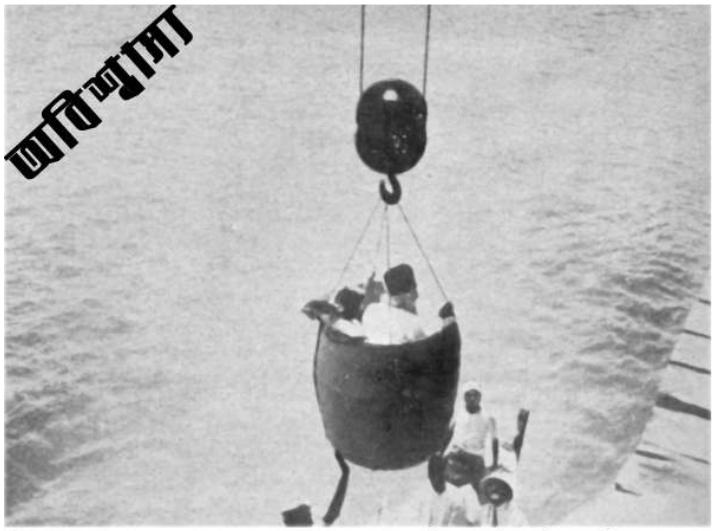

পিপেয় করে কাকে নামানো হচ্ছে ক্রেনে ঝুলিয়ে? উত্তরটা অবিশ্বাস্য। উনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। পণ্ডিচেরিতে উপযুক্ত জেটির অভাবে এইভাবে নামামো হচ্ছে কবিকে।

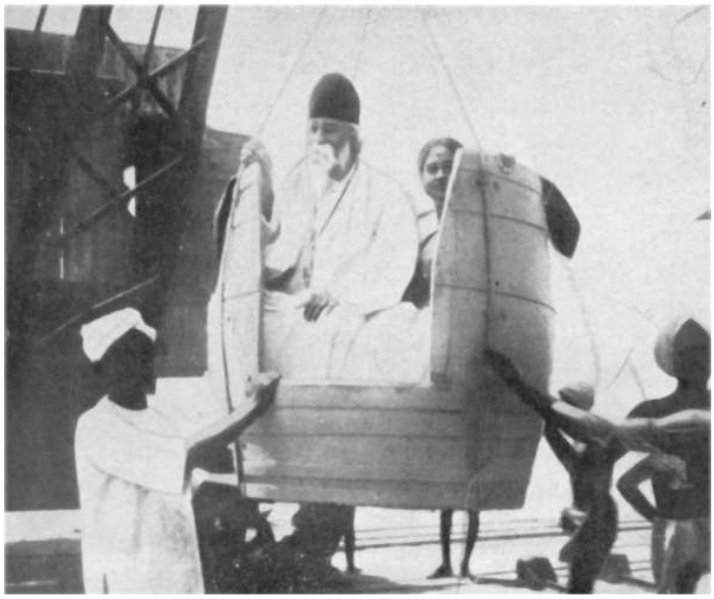

কীসের ফটো

মজার ইন্টারনেট:

১। এনসাইক্লোপিডিয়া অব লাইফ

আনুবীক্ষণিক জীব থেকে শুরু করে নীল তিমির মত বিশাল জীব নিয়ে পৃথিবী মায়ের সংসার কতোটা বড় জানো? এখন অবধি ১৯ লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতির জীবের খবর জানা গেছে। বিজ্ঞানীরা বলেন আরও বহু লক্ষ প্রজাতির জীব এখনো চিহ্নিত হবার জন্য বাকি রয়েছে। ২০০৭ সালে একটা ওয়েবসাইট তৈরি হয়েছে যার উদদেশ্য এই বিপুল সংখ্যক জীবপ্রজাতির প্রতিটির জন্য এক একটি পাতা তৈরি করা। এর নাম এনসাইক্লোপিডিয়া অব লাইফ। এতে গেলে খবর পাবে ইকনিউমন এমফিবোলাস ক্রিসবমার (সঙ্গে তার ছবি দিলাম) নামের বিচিত্র এক পোকা থেকে শুরু করে অস্ট্রেলিয়ান কোয়ালার (সঙ্গে ছবি দিলাম)মত অজস্র বিচিত্র প্রজাতির জীবের। জানতে পাবে তাদের নাম,ধাম,জীবনের বিচিত্র সব খবর । তোমার জানা কোন জীবের কথাও এখানে তুমি পৌঁছে দিতে পারো। দিতে হবে তার নাম, ছবি, বৈজ্ঞানিক নাম, কোথায় পাওয়া যায় এইসব তথ্য। যদি সে প্রাণীর খবর এখানে আগে থেকে না থাকে তবে তোমার দেয়া খবর এখানে প্রকাশিত হবে। এমনিভাবে পৃথিবীর হাজার হাজার মানুষের সহায়তায় তৈরি হয়ে চলেছে জীবজগতের সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে আকর্ষণীয় এক তথ্যভাণ্ডার। দেখতে হলে চলে এসো এইখানে: http://www.eol.org

২। ড্রামসেট বাজাতে হলে:

ড্রামসেট বাজাতে চাও? তাহলে চলে এসো এই সাইটে: http://www.lostvectors.com/flash/yoda.html .

আমি এই লেখাটা লেখবার সময় সাইটটা খুলে দুর্দান্ত মজার এই ড্রামসেটটা বাজাতে বাজাতে মহা বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম। কখন যে রাত বারোটা বেজে গেছে টেরই

পাইনি। তারপর তাণ্ডব শব্দে ঘুম ভেঙে উঠে এসে মা না----উ:! এখনো পিঠে ব্যথা রয়ে গেছে।

৩। যেকোন ছবির পেনসিল বা চারকোলের ড্রয়িং বানাতে হলে এইখানে এসো:

http://www.befunky.com/create/#/basic

সময় লাগবে ঠিক এক সেকেণ্ড। নিজের ফটো থেকে পেন্সিল স্কেচ বানিয়ে বন্ধুদের তাক লাগে দেবার জন্য এমন সাইট আর দুটি হয়না। সঙ্গে একটা আসল ছবি আর এই সাইটের কারিকুরির পরে তার চেহারার উদাহরণ দিয়ে দিলাম:

জানো কি?

১। ভারত হলো পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ছোটগাড়ির বাজার।
২। নিজেদের সুপারকমপিউটার নিজেরা বানায় এমন মাত্রই তিনটি দেশের একটি হলো ভারত।
৩। নিজেদের কৃত্রিম উপগ্রহ নিজেরা আকাশে পাঠায় এমন মাত্রই ছটি দেশের একটি হলো ভারত।
৪। আমেরিকার পরে ভারতই হলো পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম সফটওয়ার তৈরিকারী দেশ।
৫। পৃথিবীর বৃহত্তম দুগ্ধউৎপাদক, ও বৃহত্তম খাদ্য উৎপাদক।
৬। আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি বিদেশি ছাত্র আসে ভারত থেকে।
৭। চিনের পর ভারতের ওষুধ শিল্প পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম
৮। বছরে নশোর বেশি সিনেমা তৈরি হয় এ দেশে।

গত সংখ্যার ধাঁধার উত্তর:

ধাঁধা:

১। সাতটা বাঁপায়ের আর সাতটা ডান পায়ের মোজা।
২। ছ শিশি। (পঁচিশটা শিশিতে লেগে থাকা মধু একত্র করলে পাঁচটা শিশি ভরবে। সেই পাঁচ শিশির প্রত্যেকটা যখন খাওয়া হবে তখন প্রত্যেকটাতে ফের ওই এক পঞ্চমাংশ মধু লেগে থাকবে। সেগুলো একত্র করে ফের এক শিশি মধু হবে।
৩। দুটোই কলকাতা থেকে একই দূরত্বে থাকবে।

কুইজ

২৮, ইন্দাস নদী, রিভার ডলফিন, অন্ধ্রপ্রদেশ, হুগলি নদী, কেরালা, আরাবল্লী, উলার হ্রদ, পুষ্কর মেলা, ষোড়শ শতক

ডুডলঃ

মাকড়শা এক পায়ে দাঁড়াবার খেলা দেখাচ্ছে।

হযবরলঃ

উপমহাদেশ, পেনসিল টরচ, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব, ভারতভাগ্যবিধাতা, আট পেয়ে মাকড়শা

প্রশ্নের জবাব: ভাম আসিবে।

কিসের ফটো:

কানের খোল (ইয়ার ওয়্যাক্স)

ছবি: সংগৃহীত

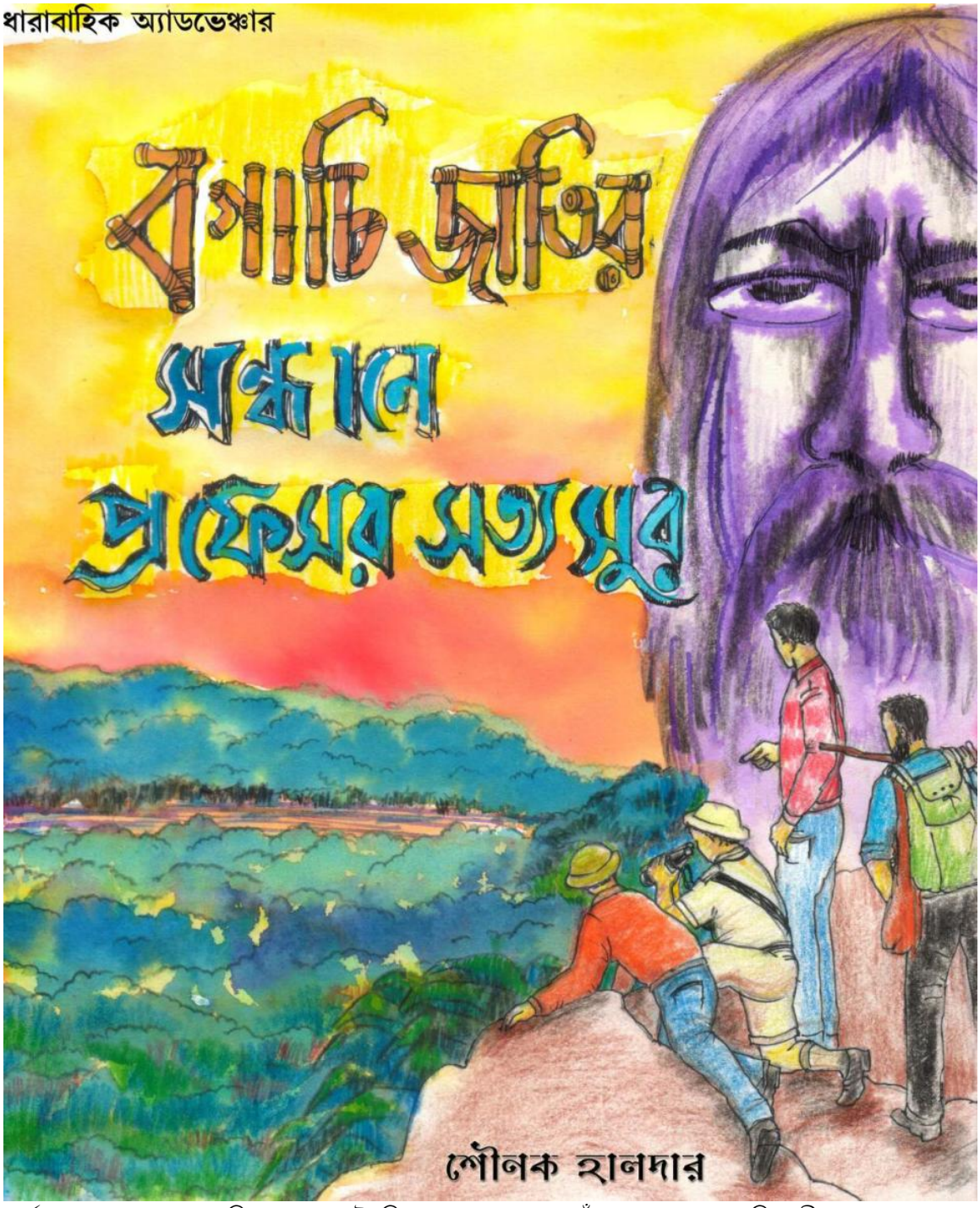

বর্মামুলুকের পাহাড়ে হারিয়ে যাওয়া ইহুদিদের এক শাখার খোঁজে বের হয়ে অভিযাত্রী ক্লাবের সদস্যরা, স্থানীয় গাইড থাঙ্গার সঙ্গে মিজোরামের বনপাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে এসে পৌঁছেছে আচুই জাতির মানুষদের আড্ডায়। তারপর----

রাতে একটা ছোটখাটো সভা বসল মাঠে। পরিষ্কার আকাশে ঝকঝকে চাঁদ ও তারার মালা। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসে আছি। আছে গোষ্ঠীপতি, গ্রামবৃদ্ধরা, অনেক

পুরুষ,আর থাঙ্গা। খাওয়াদাওয়া শেষ। ধূমপানের পালা চলছে। সঙ্গে গল্প। গোষ্ঠীপতি ভাঙভাঙা ইংরেজি জানেন। মাঝেমাঝে দু'চারটে কথা ইংরেজিতে বলছেন। বাকি সব থাঙ্গা অনুবাদ করে দিচ্ছে।

জানা গেল, আচুইরা অনেকদিন আগে থেকে এই এলাকায় আছে। তারা এসেছে আদতে তিব্বত থেকে, বর্মামুলুক ঘুরে। কিন্তু গত কয়েকশো বছরে তারা বারেবারে জায়গা পাল্টেছে। কেননা ঝুম চাষে এক জায়গায় টানা বেশিদিন থাকা যায় না।

একশো বছর আগে সাদা চামড়ার সাহেবরা আসতো। তারা শুনেছে নাকি একটা চার্চও খোলা হয়েছিল। চার্চের সঙ্গে ইংরেজি শেখার স্কুল ছিল। কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক আচুইদের ওপর তার বিশেষ প্রভাব পড়েনি। ইদানিংকাল তারা কেউকেউ বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। দু'চারজন দূরের গ্রামের স্কুলে পড়তেও যাচ্ছে। এমনকি বর্তমান গোষ্ঠীপতি ক্লাস ফাইভ অবধি মাইনর স্কুলে লেখাপড়াও করেছেন। কিন্তু সমবেতভাবে তাঁরা মনে করেন যে তাঁরা এখানেই এভাবেই বেশ আছেন। এই নীলপর্বত, ঝরনা, গাছপালা, পশুপাখি --- তাদের কাছ থেকে যা কিছু প্রয়োজনীয় তাঁরা পাচ্ছেন। তাঁদের আর বিশেষ কিছু প্রয়োজন নেই।

হ্যাঁ, তাঁদের বিশেষ কিছু গোপনীয়তা আছে, যার জন্য তাঁরা বাইরের জগতের স্পর্শ থেকে দূরে থাকতে চান। তাছাড়া, তাঁরা তাঁদের এই বিদেশী অতিথিদের মুখ থেকে শুনতে চান যে আসলে তারা কী চায়?

আমার এই সময়ে ফাদার ফিনিকোর চিঠিটার কথা মনে পড়ছিল।

চঞ্চলদা অনেক চিন্তা ভাবনা করে গুছিয়ে আমাদের অভিযানের মূল উদ্দেশ্য জানালো। টের পেলাম উপবিষ্ট সমস্ত শ্রোতা যেন একসঙ্গে শিউরে উঠল। বৃদ্ধরা মাথা দোলাতে থাকলো। গোষ্ঠীপতি অনেকক্ষণ ধরে কী যেন ভাবলেন, তারপর বাকিদের থামিয়ে বললেন, ''বিদেশী অতিথি, এতে তোমাদের কী লাভ?''

''কোনো লাভের জন্য আমরা এত কষ্ট করে আসিনি। একটা জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে জানা দরকার। আমাদের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।''

গোষ্ঠীপতি তাঁর লোকজনেদের সঙ্গে ফিসফিস করে কী যেন পরামর্শ করলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন,

''আমাদের কাছ থেকে তোমরা কী চাও?''

''তথ্য। আর---''

''আর?''

''আর কোনো পথপ্রদর্শক--''

গোষ্ঠীপতি শিউরে উঠে বললেন, ''বিশ্বাস করে তথ্য দিতে পারি। কিন্তু শর্ত আছে।''

''কী শর্ত?''

''কোথাও ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে কিছু জানাতে পারবে না। আর দুনম্বর শর্ত হল, কোনো পথপ্রদর্শক পাবে না। যদি কোথাও যেতে চাও তো নিজেদেরই যেতে হবে।''

সত্যদা বলল,''আমাদের নিজেদের মধ্যে একটু ভেবে দেখার সময় দাও।''

গোষ্ঠীপতি বললেন,''কাল চাঁদ উঠলে আলোচনায় বসবো। অতিথিরা তোমরা বিশ্রাম নাও। আমাদের অতিথিসৎকার করার সুযোগ দাও। আমাদের গ্রাম খুব সুন্দর। তাকে তোমরা উপভোগ করো।

১১ই নভেম্বর

আচুইদের গ্রামে দ্বিতীয় দিনটা ভালোই কাটল। দানিকেন আর অতনু দুজনেরই জর কমেছে। অতনু বলতে গেলে ভালোই আছে। রাতে চাঁদের আলোয় ফের সভা বসল। আজ ভিড় কম। অল্প কিছু বৃদ্ধ। থাঙ্গাকে দেখলাম না।

সত্যদা ফের জানাল যে শর্তে আমরা রাজি। দলপতির মুখে হাসি ফুটল।

হাত তুলে বললেন,''ঠিক আছে''। তারপর ধীরেধীরে কিসব মন্ত্র পড়ে ভাসাভাসা গলায় বলতে থাকলেন, ''এই যে নীলপর্বত দেখছো, আমরা তার পেটের কাছে থাকি। আমাদের অধিদেবতা ধনেশপাখি।

আর ঐ পাহাড়ের ওপর থাকত অন্য মানুষেরা। তাদের নাম আমরা অবশ্য জানি না। বুড়োদের মুখে শুধু গল্প শুনেছি যে তারা এক আশ্চর্য জাতি। তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো মিল নেই। শুধু আমাদের সঙ্গে নয়, এদেশের কারুর সঙ্গে তাদের মিল নেই। তারা ছিল দৈত্যের মতন লম্বা আর তেজি। আমরা আচুইরা তাদের ভয় পেতাম আর তাদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতাম, যদিও তাদের সঙ্গে আমাদের একদম মেলামশা ছিল না। ঠিকই বলেছো তোমরা বিদেশী অতিথি, তারা নীলপর্বতের মাথায় বাস করত। সেখানে গভীর জঙ্গল, সবসময়ে মেঘে ঘেরা।''

''আর পুশাউ হ্রদ?'' চঞ্চলদার গলা।

''তার কথা আমরা জানিনা। একশো বছরেরও আগে মওট্লুমের বাঁশ ফুলের মড়কে আমাদের গ্রামের কেউ কেউ খাবারের খোঁজে তাদের গ্রামে গিয়েছিল। তারা কোনো হ্রদ দেখেনি। পাহাড়ের মাথায় হ্রদ থাকাবে কোথায়? তবে হ্যাঁ, হ্রদ তৈরি হয়েছিল পরে। সে হ্রদ এখনো আছে। শুনতে চাও তার কথা?'' গোষ্ঠীপতির গলা মৃদু হয়ে গেল, ''সে বড় ভয়ানক কাহিনী। তার আগে বলতো,নীল পর্বতের কোনো চূড়া দেখেছো কি?''

উপরে তাকালাম। কুয়াশা ঘেরা নীল পাহাড়। জ্যোৎস্নায় আদিম বনভূমি অপার্থিব লাগছে। কিছু ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।

''সকালে উঠে ভালো করে দেখো, নীল পর্বতের কোনো চূড়া নেই। আমার ঠাকুর্দার মুখে শুনেছি---- অনেক বছর আগে একবার অসময়ে ভীষণ বৃষ্টি নামে। চারদিকে বড়বড় গাছ পড়ে , ধস নেমে একাকার হয়ে গেছিল। একনাগাড়ে নাকি বারোদিন বৃষ্টি হয়েছিল। আমরাও বুঝেছিলাম যে দেবতারা রেগে গেছে। আমরা রাতদিন পুজো করছিলাম। হঠাৎ একদিন মাঝরাতে বৃষ্টি থামল। আর শেষ রাতে নড়ে উঠল পাহাড়। যেন এক মস্ত পাহাড়ি অজগর তার কুন্ডলি নাড়িয়েচাড়িয়ে বসল। সে কি ঝাঁকানি! আমরা আতংকে সব বেরিয়ে পড়লাম--- আর তখনই প্রচন্ড একটা শব্দে সবার কান ফেটে গেল। মনে হল যেন নীল পর্বতের চূড়া ভেঙে গিয়ে পড়ল ঐ পূব দিকে। আমরা মনে করেছিলাম বুঝি সব শেষ হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে রাত কাটতে, ভোরের আলোয় দেখা গেল সত্যি সত্যিই নীলপর্বতের চূড়া আর নেই। আর তার সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে গেছে সেই রহস্যময় মানুষরা আর তাদের গ্রাম।

ঐ ধাক্কাটা সইতে আমাদের আচুইদের একযুগ লেগে গেল। আমাদের গ্রামেও ঢের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তারপর একদিন কয়েকজন অসমসাহসী গ্রামবাসী দেখতে গেল তাদের কী হয়েছে? নীল পর্বতে চড়ে তারা আর কিছু দেখতে পায়নি। পর্বতের ওপাশে দেখেছে একটা নতুন হ্রদ। তার টলটলে জলের মধ্যে একটা আস্ত গ্রাম ডুবে রয়েছে। আরো একযুগ পরে দুজন দু:সাহসী শিকার করতে গিয়ে কুঙ্গারি পুষ পেরিয়ে ঐ হ্রদের দিকে চলে গেছিল। দুর্গম জঙ্গলের ডেরা সেই হ্রদ অবধিও তারা যেতে

পারেনি। দূর থেকে দেখেছিল আকাশে মায়াবি আলো আর আওয়াজ। একটাও পশুপাখি নেই সেখানে। আর হ্রদের মধ্যে আস্ত একটা গ্রাম। তার চারপাশ মায়াজালে ঘেরা। হ্রদের তীরে মায়াবিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। জ্যান্ত মানুষ দেখে মায়াবিরা নাকি তাদের আক্রমণ করেছিল। অতিকষ্টে একজন মাত্র ফিরে

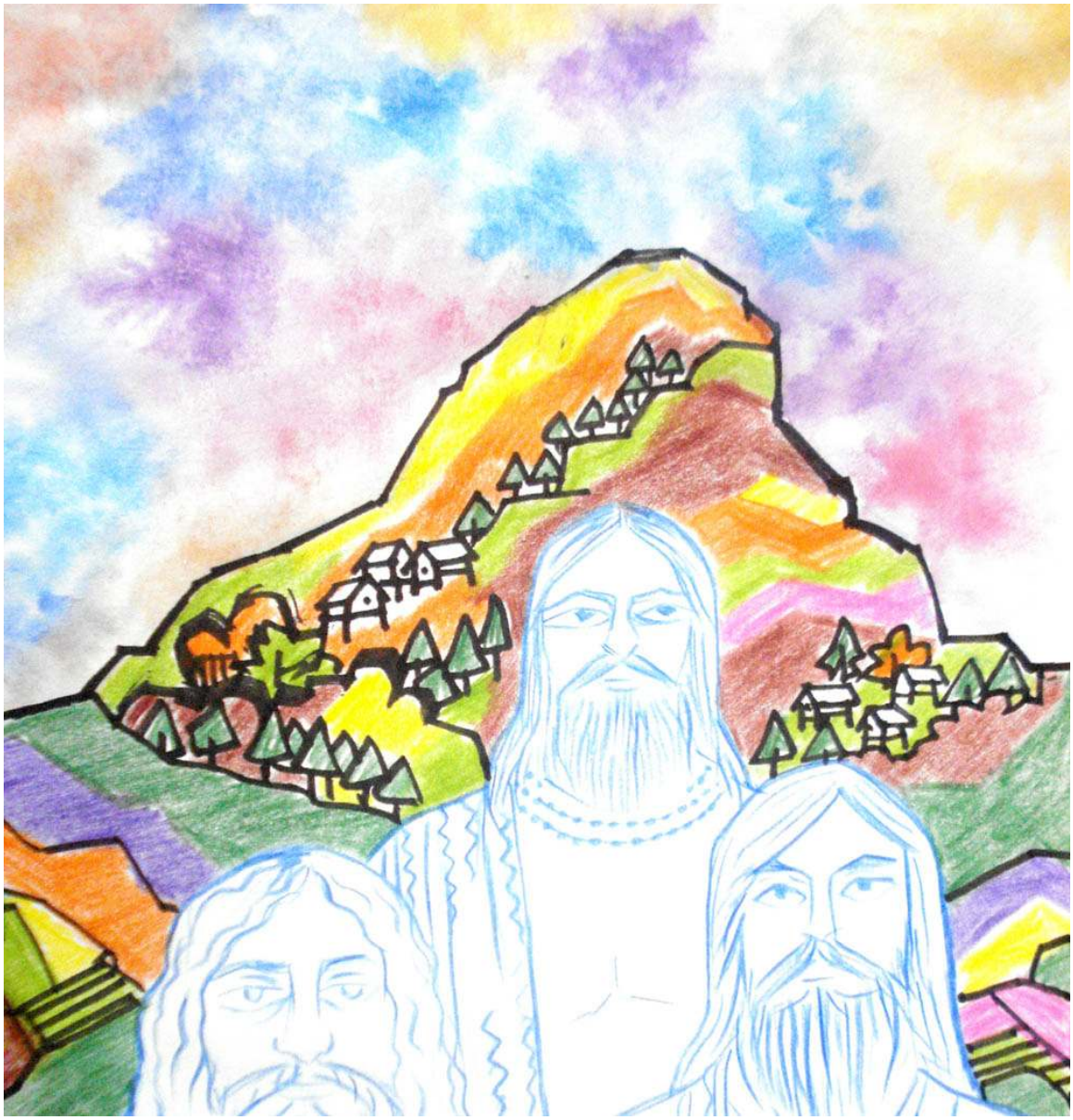

এসেছিল। এসেই অচেনা অসুখে মারা যায়। তার মুখেই এসব শোনা। সেই থেকে ওদিকে যাওয়া আমাদের নিষিদ্ধ।

কালকের সেই বুড়োটা গোষ্ঠীপতির কাছে এসে কি বলল। গোষ্ঠীপতি একটু বিরক্ত মুখে বললেন, ‘‘বৈদ্য বলছে তোমাদের দলের দুজনের অচেনা অসুখ হয়েছে। তোমরা বেশিদিন এখানে না থাকলেই মঙ্গল।’’

বুঝলাম এখানে আর দেরি করা যাবে না। সত্যদা খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, ‘‘গোষ্ঠীপতির সৌজন্য ও অতিথি বাৎসল্যে আমরা মুগ্ধ, তাই আর তাঁকে বিরক্ত করতে চাইনা। আমাদের যা জানার, তা জানা হয়ে গেছে। কালই ভোরে আমরা হ্রদের দিকে রওনা হবো।’’

''তোমরা সত্যি যাবে ?'' গোষ্ঠীপতির গলা কঠোর শোনালো। সমস্ত বুড়োরাও একসঙ্গে ''না না , যেও না---'' বলতে থাকল।

''আমরা এতদূর থেকে এতকষ্ট করে যখন এখান অবধি পৌঁছতে পেরেছি, তবে শেষটা দেখে যাব না? আমরা সেই হারিয়ে যাওয়া মানুষদের রহস্য খুঁজে বের করবোই। গোষ্ঠীপতি আপনারা আমাদের শুধু শুভেচ্ছা ও কিছু রসদ দিও,'' সত্যদার গলা গমগম করতে লাগল।

''হারিয়ে যাওয়া মানুষরা তো হারিয়ে যায়নি শেষপর্য্যন্ত। তোমরা বিশ্বাস না করলেও আমরা বিশ্বাস করি যে তারা বেঁচে আছে। তারা মায়ার মধ্যে আছে। তোমরা তাদের সঙ্গে পারবে না। তারা খুব ভয়ংকর।''

''আমরা যাবোই।'' আমরা সবাই একসঙ্গে বললাম।

ক্রমশ

ছবি : মৌসুমী

ফ্রিজ চোর ও ডিনার সেট

রোগি: ডাক্তারবাবু, পিঠে বড় ব্যথা।

ডাক্তার (পিঠ ভলো করে দেখে): ইস্!জোর লেগেছে যে! হলো কী করে?

রোগি: ভোরবেলা রান্নাঘরে খুটখাট শব্দ শুনে পা টিপে টিপে সেখানে গিয়ে দেখি ব্যালকনির দরজাটা হা হা করছে খোলা। দৌড়ে সেখান দিয়ে বের হয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। তখন বুঝলেন, ব্যালকনি থেকে নীচের দিকে চাইলাম। দেখি একটা লোক মাথার ওপর একখানা ডিনার সেট ধরে নিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। ব্যাটা নিশ্চয় আমার রান্নাঘর থেকে সেটটা চুরি করেছে। আমি রেগেমেগে হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে ফ্রিজটাকেই মাথার ওপর তুলে ছুঁড়ে মারলাম ব্যাটার মাথায়। ওইতেই পিঠে একটু ফিক ব্যথা হয়ে গিয়েছে।

খানিক বাদে দ্বিতীয় রোগির আবির্ভাব।

রোগি (২): ডাক্তারবাবু-উ-উঁ-উঁ--

ডাক্তার: এ কী? আপনার দশা দেখছি আমার আগের রোগির চেয়েও খারাপ! কী হয়েছিলো?

রোগি (২): আমি অর্ডার সাপ্লাইয়ের বিজনেস করি। আজ সকালে একটা ডিনার সেট সাপ্লাই দেবার কথা ছিলো। ঘড়িতে অ্যালার্ম দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, তা সকালে ঘুম ভেঙে দেখি দেরি হয়ে গিয়েছে। তা বিল্ডিং থেকে ডিনার সেটটা নিয়ে বাইরে বেরিয়েছি কি না বেরিয়েছি, বললে বিশ্বাস যাবেন না, আমার ঘাড়ের ওপর আকাশ থেকে একখানা আস্ত ফ্রিজ এসে পড়ল। তাতেই আমার এই দশা হয়েছে!

খানিক বাদে তৃতীয় রোগির আবির্ভাব।

রোগি (৩): কোঁ কোঁ কোঁ-----

ডাক্তার: এ কী ! এ যে প্রায় মরে গেছে। কোঁ কোঁ করছে, ওরে কে আছিস এর মুখে একটু জল দে। তা কিহে? তোমর এমন অবস্থা হলো কী করে?

রোগি (৩): আজ্ঞে ডাক্তারবাবু, আমি একটা ফ্রিজের মধ্যে লুকিয়ে বসেছিলাম তখন একটা লোক ফ্রিজটাকে তুলে তেতলার থেকে নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, আর আমি--------

যোগচিহ্ন! !

রাজু অংকে বেজায় খারাপ। তার বাপ মা হাজার চেষ্টা করে, টিউটর রেখে টেখেও কোন ফল পেলেন না। শেষে তাকে ইশকুল থেকে তাড়িয়ে দিতে তার বাবা মা রাজুকে নিয়ে গিয়ে একটা ক্যাথলিক মিশনারি ইশকুলে ফের ভর্তি করিয়ে দিলেন। ইশকুলে প্রথম দিন গিয়েই রাজু ফিরে এলো বেজায় সিরিয়াস মুখ করে। বাড়ি ফিরে রোজকার মত খেলতে যাবার নামটি না করে সোজা নিজের পড়ার ঘরে গিয়ে উঠে দোর বন্ধ করে ঘোর পড়াশোনা করতে শুরু করে দিল। তারপর দেখা গেল দিনরাত শুধু অংকই কষে যাচ্ছে রাজু। রাতে খাবার সময় মা ডেকে আনতে কোনোমতে নাকেমুখে খাবার গুঁজেই টিভি দেখবার কথা উচ্চারণও না করে ফের সে গিয়ে বইপত্র নিয়ে বসল। বেশ কিছুদিন ধরে এইরকম চলবার পর ফার্স্ট টার্ম পরীক্ষায় দেখা গেল রাজু অংকে একেবারে এ প্লাস গ্রেড পেয়েছে। এইবারে তার মা বেজায় অবাক হয়ে গিয়ে রাজুকে ধরে বসলেন, 'রাজু, আমায় তোকে বলতে হবে কী হয়েছে। তুই হঠাৎ করে পড়ায় এতো মনযোগ দিলি কেন? নানরা কি খুব কড়া?'

'উঁহু।'

'তাহলে? বইগুলো কি খুব ভালো? নাকি ইশকুলে খুব পেটায়, নাকি খুব প্রাইজ দেয় নাকি---- সত্যি করে ব্যাপারটা একবার আমায় বল বাবা!'

রাজু এইবারে মায়ের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আসলে ব্যাপার কি জানো মা? ইশকুলটা মোটেই সুবিধের নয়। প্রথম দিন ঢুকেই দেখি প্রেয়ার হলে একটা বিরাট যোগচিহ্নের গায়ে একটা রোগা মতন লোককে পেরেক দিয়ে গেঁথে রেখেছে। ওই দেখেই বুঝলাম এ ইশকুলে অংকে খারাপ করলে আর রক্ষে নেই। তাই----'

ছবি : সৌভিক

আমার স্বপ্ন

ঋত্বিক প্রিয়দর্শী
ক্লাস টু। এপিজে স্কুল। সল্ট লেক

একদিন আমি আর আমার দিদিভাই একটা ভীষণ পুরোন সিঁড়িতে এসেছি আর এসে একটা সাইকেল দেখলাম আর তক্ষুনি একটা মেয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে আমাদের কাছে এল আর সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলটা একটা রোবট হয়ে গেল। তখন আমি দৌড়োতে দৌড়োতে একটা ঘরে চলে গেলাম আর দেখলাম এসির মধ্যে একটা ছেলে বসে আছে। ছেলেটা ভীষণ জোরে জোরে কথা বলছিল। তখন হঠাৎ করে ওই মেয়েটা এসে বললে, 'বেশি জোরে কথা বললে রোবট শুনে ফেলবে।' তারপর দেখলাম দিদিভাইও এসে গেছে। তারপর আমরা বাইরে গিয়ে দেখলাম রোবট নেই।

এটি একটি সত্যিকারের স্বপ্নের বিবরণ

কিপটে

প্রমণা চট্টোপাধ্যায়
ষষ্ঠ শ্রেণী,শিবপুর হিন্দু গার্লস হাই স্কুল

(১)
দাড়ি নেড়ে হাঁড়ি বাবু
ব্যাগ হাতে কেনে মাল,
কিপটে বড়ই সে যে
কেনে পচা চাল ডাল।
(২)
তার ব্যাগে আছে পচা
পাতিলেবু, উচ্ছে
পচা আটা, বাসি মাছ
পচা আলু নিচ্ছে।
(৩)
বাজার হয়ে গেলে পরে
নটায় বাড়ি ফিরল,
বাড়ি ফিরে ভুল করে
নতুন লুঙ্গি ছিঁড়ল।
(৪)
লুঙ্গি ছিঁড়ে বসে পড়ে
মাথায় হাত দিয়ে,
সব চুল ছিঁড়তে থাকে
সামনে আয়না নিয়ে।
(৫)
চুল ছিঁড়ে ফেলে সে
আনন্দিত হল,
‘যাক বাবা, চুল কাটার
পয়সা বেঁচে গেল।’

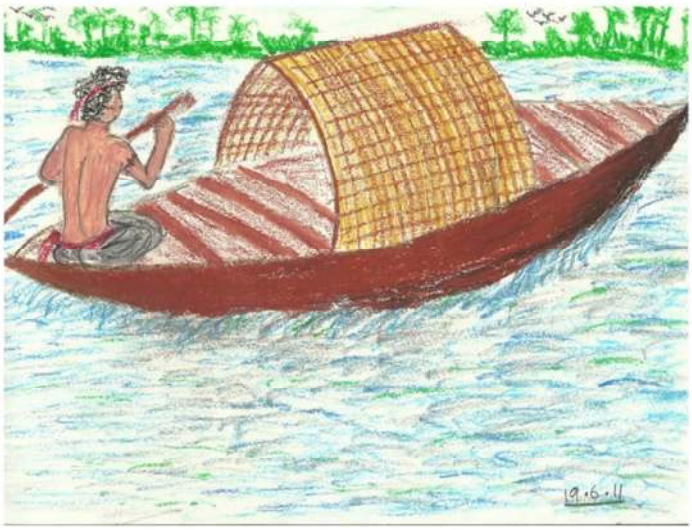

গ্যালারি

রূপসু
(কলকাতা)

অন্তরা (পুণে)

বউল
(নৈহাটি)

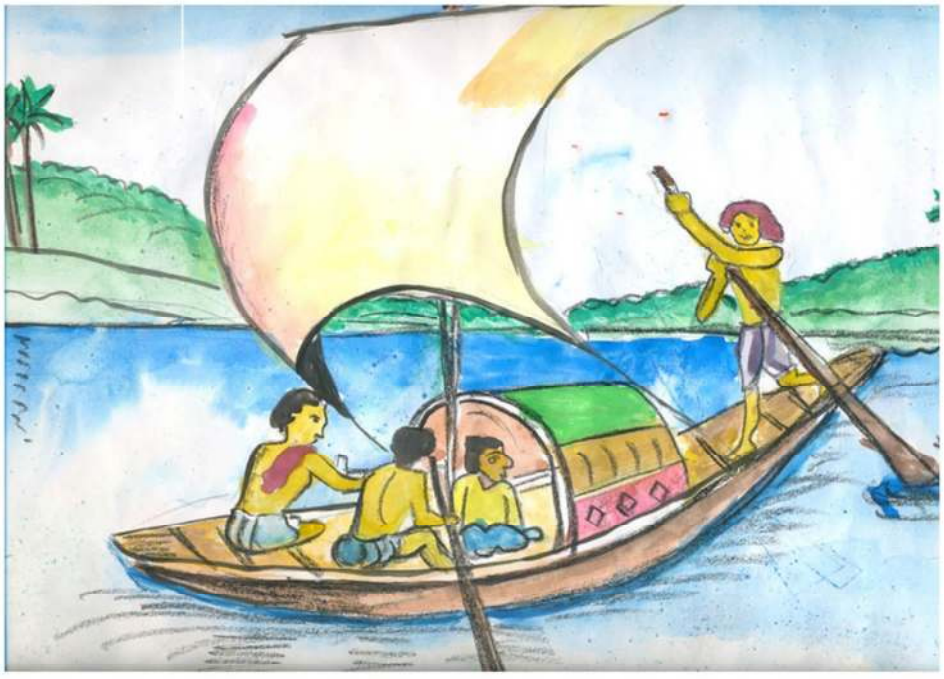

মহুল
(নৈহাটি)

পুরাণ কথা

হিড়িম্বার বিয়ে

সংহিতা

হস্তিনাপুরের সিংহাসন নিয়ে কুরু-পাণ্ডবের ঝগড়ায় মারামারির শুরু জতুগৃহে। অনেক কৌশলে কুরু রাজকুমার দূর্যোধন রাতারাতি কুন্তী আর পাঁচ পাণ্ডব ভাইকে জতুগৃহে পুড়িয়ে মেরে সিংহাসনের দখল নেওয়ার ফন্দি এঁটেছিল। কিন্তু ষড়যন্ত্র টের পেয়ে পাণ্ডবরা নিজেরাই জতুগৃহ পুড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে যায় জঙ্গলে। তখন আবার জঙ্গল ভর্তি রাক্ষস-খোক্কস-পিশাচ। ফলে পাণ্ডবদের প্রাণভয় রয়েই গিয়েছিল। সারাদিন দুর্যোধনের চরেদের নজরের বাইরে থাকা যাবে যে শহরে সেই শহরের খোঁজে তারা ঘুরে বেড়াত জঙ্গলের আনাচে-কানাচে; আর সন্ধে লাগলেই ঘুমিয়ে পড়ত।

এরকম এক সন্ধেবেলায় মধ্যম পাণ্ডব ভীম ছিল পাহারায়। যেখানে ভীম আর তার ঘুমন্ত চার ভাই, মা রাতের আস্তানা নিয়ে ছিলেন, তার খুব কাছেই একটা শাল গাছে থাকত জঙ্গলটার রাক্ষসরাজা হিড়িম্ব। মানুষের গন্ধে তার ঘুম ভেঙে গেল। খিদেও পেল চাগিয়ে। বোন হিড়িম্বাকে ডেকে বলল মানুষ কোথায় দেখে, মেরে নিয়ে আসতে।

হিড়িম্বা পাণ্ডবদের কাছাকাছি যেই এলো, অমনি ভীমকে দেখে তার খুব ভালো লেগে গেল। ভীমকে সে ভালোও বেসে ফেলল চট করে। তার খুব ইচ্ছে হলো ভীমকে বিয়ে করে তার সাথে ঘর-সংসার করতে। বেচারি পড়ল মুশকিলে। এদিকে ক্ষুধার্ত ভাই অন্যদিকে ভীম। ভেবে চিন্তে তার মনে হলো মানুষ মেরে নিয়ে গেলে হিড়িম্ব তাকে ধন্যবাদ জানাবে কেবলমাত্র সেই রাতটুকুর জন্য; কিন্তু বিয়ে করলে ভীম তাকে জন্মজন্মান্তরের সুখ দেবে। ফলে ভীম এবং তার ভাইয়েদের খেয়ে ঢেঁকুর তোলার বদলে সে ভীমের বউ হতে চাইল। তাই সুন্দর মেয়ের রূপ ধরে সে ভীমের কাছে গেল। জিজ্ঞেস করল, ''হ্যাঁ গো, কে তুমি? এরাই বা কারা তোমার সাথে, ঘুমিয়ে আছে? তোমরা কি জানো না জঙ্গলে ভয়ানক রাক্ষসের বাস? সত্যি কথা বলতে কী হিড়িম্ব নামে একটা মানুষখেকো রাক্ষস থাকে এখানে। সে আমার ভাই। আমকে পাঠিয়েছে তোমাদের মারার জন্য, তোমাদের মেরে তাকে দিলে সে খাবে বলে। কিন্তু তোমাকে দেখেই বড্ড ভালোবেসে ফেলেছি গো! তাই তোমাকে বাঁচাবার জন্য তোমার কাছে এলাম। আমাকে তুমি বিয়ে করবে? আমি তোমাকে মানুষখেকোদের হাত থেকে রক্ষা করব, তোমাকে আমার পিঠে নিয়ে উড়ে যাব পাহাড়ের বুকে যেখানে কোনো সাধারণ জন্তু যেতেই পারবে না। করবে আমাকে বিয়ে?''

সব শুনে ভীম বলল, ''বিয়ের লোভ নেই যে আমার। ঘুমন্ত মাকে, ভাইয়েদের রাক্ষসের মুখে ফেলে আমি তোমার সাথে কী করে বেড়াতে যাই গো রাক্ষসী সুন্দরী?'' তখন হিড়িম্বা বলল, ''আমি

তোমার সাথে যারা আছে তাদেরও বাঁচাব রাক্ষসের গরাস থেকে।'' কিন্তু হিড়িম্বর ভয়ে পালাতে হবে বলে ভীম কিছুতেই তার মায়ের, ভাইয়েদের ঘুম ভাঙাতে রাজি হলো না।

এদিকে হিড়িম্বার দেরি দেখে হিড়িম্ব শালগাছের মাথায় চড়ে দেখতে গেল কী হয়েছে। হিড়িম্বা সুন্দরী মেয়ের বেশে দেখেই হিড়িম্ব বুঝে ফেলল ব্যাপারটা কী। আর রেগে আগুন হয়ে তেড়ে এলো যেখানে ভীম আর হিড়িম্বা কথা বলছিল সেখানে। রাক্ষসদের মুখে চুনকালি দিয়ে মানুষকে বিয়ে করতে চাইছে বলে হিড়িম্বাকে সে খুব বকাবকি করল। তারপর যেই ভীমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল অমনি ভীমও হিড়িম্বকে জাপটে ধরে নিয়ে চলে গেলে খানিক দূরে, যাতে মারপিটের আওয়াজে সবার ঘুম না ভেঙে যায়। কিন্তু হিড়িম্বটা থেকে থেকেই বাজখাঁই হুঙ্কার ছাড়তে থাকে। তারপর দুজনের মারপিটে হুড়মুড় করে গাছপালা পড়তে থাকে। ফলে কুন্তী আর তার ঘুমন্ত চার ছেলে জেগে ওঠে। হিড়িম্বা ছিল ঘুমন্ত কুন্তী আর বাকিদের পাহারায়। জেগে উঠে হিড়িম্বাকে দেখে সবাই অবাক। কুন্তী জানতে চান, ''তুমি কে গো সুন্দরী?'' উত্তরে হিড়িম্বা সব কথা বলে দিল।

ব্যাপার বুঝে যুধিষ্ঠির আর অর্জুন ভীমকে বলতে থাকে, ''কী খেলা করছো তুমি? হয় মারো ব্যাটাকে, না হলে তুমি ক্লান্ত থাকলে বলো, আমরা এসে হাত লাগাই।'' ভাইয়েদের কথায় ক্ষেপে গিয়ে ভীম হিড়িম্বকে মাথার ওপরে তুলে ধরে বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে থাকে। ভাইয়েরা আবার তাগাদা দেয়। ভীম হিড়িম্বকে মাটিতে আছড়ে ফেলে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

তারপর সবাই মিলে কাছের শহরে যাওয়ার তোড়জোড় করতে থাকে কারণ সেখানে দুর্যোধনের চরেরা তাদের খুঁজে পাবে না। তখন হিড়িম্বাও তাদের সঙ্গে সঙ্গে যায়। তা দেখে ভীম রেগে গিয়ে বলে, ''মানুষ খাওয়ার লোভে রাক্ষসীরা অনেক রূপ নেয়। তুই নিজে যদি ফিরে না যাস তো তোকেও তোর ভাইয়ের হাল করে দি।'' যুধিষ্ঠির আটকায় ভীমকে; মনে করিয়ে দেয়, ''মেয়েদের মারতে নেই''।

তখন হিড়িম্বা কুন্তীর কাছে কেঁদে পড়ে বলে, ''আমি নিজেই যে ব্যথায় কাতর, আমি তোমাদের কী ব্যথা দেব? আমাকে যদি ভীম বিয়ে করে তবে কথা দিলাম যে তুমি মনে মনে ডাকলেই আমি ভীমকে নিয়ে হাজির হবো তোমার কাছে।'' তাতে যুধিষ্ঠির সায় দিল। ভীম রাজি হলো এই শর্তে যে হিড়িম্বার ছেলে হলেই সে কুন্তীর কাছে, তার ভাইদের কাছে বরাবরের মতো ফিরে আসবে।

ব্যস হিড়িম্বার বিয়ে হয়ে গেল। পাহাড়ের বুকে কিছুকাল ভীমের সাথে সে মহানন্দে ঘরকন্না করল। তারপর তার ছেলে জন্মাল। ঘটির মতো টাক মাথা বলে, হিড়িম্বা ছেলের নাম রাখল

ঘটোৎকচ। সে ছেলেও অবাক ছেলে ছিল। জন্মেই সে জোয়ান হয়ে উঠেছিল। ভীম ডাকলেই হাজির হবে বলে সে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ছেলে নিজের রাজ্যে চলে গিয়েছিল। ভীমও ফিরে গিয়েছিল ভাইয়েদের কাছে।

ছবি: মৌসুমী

রাশিয়ান সাহিত্য

তিন বন্ধুর গল্প

আলেক্সেই টলস্টয়

বাংলা অনুবাদ- - দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য। (মিরিয়াম মর্টনের ইংরিজি অনুবাদ থেকে)

অনেক অনেক দিন আগে একটা বেড়াল , একটা কোকিল আর একটা ছোট্ট মোরগ মিলে গভীর বনের মধ্যে একটা বাড়িতে থাকতো। বেড়াল আর কোকিল মিলে রোজ গভীর বনে যেত কাঠ কাটতে। ছোট্ট মোরগ শুধু থেকে যেত ঘরের ভেতর। বের হবার আগে বেড়াল আর কোকিল ছোট্ট মোরগকে বলতো, 'আমরা বেরোচ্ছি রে । বাড়ির কাজকম্ম করিস, তবে সাবধান। বেশি আওয়াজ টাওয়াজ করিস না যেন আবার। শব্দ পেলে শেষে শেয়াল আসতে পারে। আর শেয়াল যদি কখনো আসে, তাহলে জানালার বাইরে তাকাবি না খবরদার। তাকালেই কিন্তু সর্বনাশ।'
এমনই একদিন সকালবেলা বেড়াল আর কোকিল যখন বনে গেছে, ওমনি শেয়াল করেছে কি, দৌড়ে এসে জানালার ঠিক নিচে বসে গান জুড়েছে- -

মোরগ খোকা
পালক ঢাকা
রাঙা মাথার ঝুঁটি
মুখ দেখালেই
খেতে দেবো
তিনটে মটরশুঁটি।

তাই শুনে ছোট্টমোরগ যেই না জানালা দিয়ে উঁকি মারা , শেয়াল ওমনি তার ঝুঁটি চেপে ধরে টানতে টানতে একেবারে সোজা নিয়ে চললো তার গর্তে। যেতে যেতে মোরগছানা কাঁদতে কাঁদতে বলে,

শেয়াল আমায় চললো নিয়ে
পেরিয়ে গভীর নদী
ও ভাই বেড়াল, কোকিল দাদা
দৌড়ে এসে দাওগো বাধা
বাঁচাতে চাও যদি।

শুনতে পেয়ে কোকিল আর বেড়াল দৌড়ে এসে শেয়ালের মুখ থেকে ছিনিয়ে এনে প্রাণ বাঁচালো ছোট্ট মোরগের।

পরদিন আবার কাঠ কাটতে বের হবার সময় বেড়াল আর কোকিল ছোট্ট মোরগকে সাবধান করে দিল, 'দ্যাখ্ বাপু, আজ আমরা যাবো বনের ভেতর অনেক দূরে। চিৎকার করলেও শুনতে পাবো না কিন্তু। সাবধানে থাকিস।'

যেই তারা গেছে ওমনি শেয়ালও এসে জুটেছে বাড়ির সামনে। থাবা পেতে বসে গান জুড়েছে,

ছেলেমেয়েগুলো ছড়িয়ে রেখেছে
কত না গমের দানা
মুরগিরা সব খুঁটে খায় বাদ
পড়লো মোরগছানা।

ছোট্ট মোরগ জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললো,

কোঁকর কোঁকর কোঁ
ও শেয়ালের পো
শুনতে বড়ই সাধ
কেন মোরগছানা বাদ?

ওমনি শেয়াল তার বাড়ানো গলা কামড়ে ধরে নিয়ে চললো নিজের গর্তের দিকে। যেতে যেতে মোরগছানা কাঁদতে কাঁদতে বলে,

শেয়াল আমায় চললো নিয়ে
পেরিয়ে গভীর নদী
ও ভাই বেড়াল, কোকিল দাদা
দৌড়ে এসে দাওগো বাধা
বাঁচাতে চাও যদি।

ডাক শুনতে পেয়ে বেড়াল আর কোকিলধাওয়া করলো শেয়ালের পেছনে। বেড়াল ছুটে চললো আর কোকিল চললো উড়ে উড়ে। খানিক বাদে শেয়ালের নাগাল পেয়ে বেড়াল তাকে দিলো কুড়ি নখের আঁচড় আর কোকিল দিলো তার মাথায় ঠুকরে। ওমনি ছোট্ট মোরগকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল পাজি শেয়ালটা।

পরদিন আবার কাঠ কাটতে বের হবার সময় বেড়াল আর কোকিল ছোট্ট মোরগকে সাবধান করে দিল, 'দ্যাখ্ বাপু, আজ আমরা যাবো বনের ভেতর অনেক দূরে। চিৎকার করলেও শুনতে পাবো না কিন্তু। সাবধানে থাকিস। জানালা দিয়ে মোটে মুখ বের করবি না আজ।'

যেই না তারা যাওয়া ওমনি শেয়াল এসে গান ধরেছে,

মোরগ খোকা
পালক ঢাকা
রাঙা মাথার ঝুঁটি

মুখ দেখালেই
খেতে দেবো
তিনটে মটরশুঁটি।

সেই শুনেও মোরগ চুপটি করে বসে রইলো। শেয়াল তখন গাইলো,

ছেলেমেয়েগুলো ছড়িয়ে রেখেছে
কত না গমের দানা
মুরগিরা সব খুঁটে খায় বাদ
পড়লো মোরগছানা।

ছোট্ট মোরগ জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললো,

কোঁকর কোঁকর কোঁ
ও শেয়ালের পো
শুনতে বড়ই সাধ
কেন মোরগছানা বাদ?

ওমনি শেয়াল তার বাড়ানো গলা কামড়ে ধরে নিয়ে চললো নিজের গর্তের দিকে। যেতে যেতে

মোরগছানা কাঁদতে কাঁদতে বলে,

শেয়াল আমায় চললো নিয়ে
পেরিয়ে গভীর নদী
ও ভাই বেড়াল, কোকিল দাদা
দৌড়ে এসে দাওগো বাধা।
বাঁচাতে চাও যদি।

কিন্ত তার বন্ধুরা সেদিন সত্যি সত্যিই অনেক দূরের গভীর বনে চলে গেছে। তারা আর মোরগের ডাক শুনতে পেলো না। শেয়াল তাকে নিয়ে নিশ্চিন্তে চলে গেলো। সন্ধেবেলা ফিরে এসে বেড়াল আর কোকিল মোরগকে দেখতে না পেয়ে শেয়ালের থাবার ছাপ ধরে ধরে চললো বন্ধুকে খুঁজতে। চলতে চলতে তারা এসে হাজির হলো শেয়ালের গর্তের কাছে। বেড়াল তখন ভারী মিঠে গলায় গান ধরলো,

কোথায় গেলে শেয়াল বন্ধু
পাইনে কেন খুঁজে
বনের ভেতর ঘুরছো , নাকি
ঘুমোচ্ছ মুখ গুঁজে?

তাই শুনে শেয়াল গর্তে বসে ভাবলো কে রে এমন মিষ্টি সুরে গান গেয়ে আমায় খোঁজে? এই ভেবে যে না সে গর্ত থকে বাইরে বের হয়েছে, অমনি বেড়াল আর কোকিল মিলে শেয়ালকে কি মার, কি মার!। মার খেয়ে শেয়াল শেষে এক দৌড়ে পগাড় পার। বেড়াল আর কোকিল তখন ছোট্ট মোরগকে গর্ত থেকে বের করে একটা ছোট্ট ঝুড়িতে বসিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো। সেইদিন থেকে শেয়াল আর কোনদিন ফিরে আসেনি তাদের বাড়ির কাছে। বেড়াল, কোকিল আর ছোট্ট মোরগ মিলে তারপর চিরকাল সুখে ঘরকন্না করলো।

ছবিঃ সংগৃহীত

আজ থেকে এক হাজার বছর আগে আমাদের এই বাংলা খুব সমৃদ্ধ দেশ ছিলো। সেই সময়ে বাংলার ব্যবসায়ীরা বিরাট বিরাট জাহাজে (ডিঙা) চেপে পৃথিবী জুড়ে এডভেঞ্চার আর ব্যবসা করে বেড়াতো। নানা দেশ থেকে বাংলার জন্য বয়ে আনতো অগুণতি ধনরত্ন। বাংলার মাঝি, দেহের শক্তি আর মাথার বুদ্ধি দিয়ে যুদ্ধ করতে পারতো দারুণ সমুদ্রের ঝড়ের সঙ্গে। সেইসব সোনার দিনের গল্প লিখে গেছেন গত শতাব্দির মহাপণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই, তাঁর 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র একজন বাঙালী সওদাগর। তাঁর নাম 'বিহারী'। বাবা মাকে বোলো সেই বইটা যেন তোমাদের কিনে দেন। পড়লে বুকের ছাতি গর্বে দশহাত হয়ে যাবে। এইখানে আমরা সেই উপন্যাসের খানিকটা তুলে দিলাম। বালীদ্বীপ থেকে বাংলায় ফেরবার পথে কেমন করে বাংলার নৌ-অভিযাত্রীরা মারাত্মক সমুদ্রের ঝড়কে সামলালো তার রোমাঞ্চকর কাহিনী------

ক্রমে ক্রমে ঊনপঞ্চাশখানা ডিঙা আসিয়া বালীদ্বীপে জুটিল। যার যা মেরামতের ছিল, মেরামত করা হইল। সব ডিঙা আবার বাঙলার দিকে চলিল। অনেক বাঙালি বহুদিন ধরিয়া বিদেশে বিহারীর কাজ করিতেছিল, তাহারা অনেকে ছুটি লইয়া, অনেকে ইস্তফা দিয়া, অনেকে বৃত্তি বার্ষিক লইয়া, অনেকে আবার বরখাস্ত হইয়া দেশে ফিরিল। সবাই বিহারীর অতিথি, বিহারী অতিথিদের সৎকারে মুক্তহস্ত। বিহারীর স্ত্রী এইসব অতিথিদের সেবায় খুব মন দিয়াছেন। তাহাদের কাহারো কোনো জিনিসের দরকার হইলে তৎক্ষণাৎ যোগাইতেছেন। আর বিহারীর মেয়ে সবারই সব, সর্বদাই সবার কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কাহাকেও দাদা মশায়, কাহাকেও কাকা, কাহাকেও মামা, কাহাকেও ভাই বলিয়া সকলের কাছে যাইতেছে, সকলকেই মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। আর সকলের কোলে উঠিতেছে, সকলেরই আদর পাইতেছে। সেই বুড়া মাঝি কিন্তু তাহার প্রধান সঙ্গী, সে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহারই কাছে যাইতেছে। এক মেয়েতে ডিঙাগুলিকে মাত করিয়া রাখিয়াছে।

সব ডিঙা ভাসিল, কেহ বলিল জয় কালী, কেহ বলিল, জয় সাত গাঁয়ের কালী। কেহ বলিল, জয় গঙ্গামার জয়, কেহ বলিল, জয় বরুণদেবের জয়, কেহ বলিল, জয় সমুদ্রের জয়। বেশ আমোদে দিন কাটিতে লাগিল। যাবার সময় স্থির সমুদ্রের উপর দিয়া পাল তুলিয়া আসিয়াছে। আসার সময়ও ঠিক সেই ভাব। বিহারীর আনন্দ ধরে না। সে এক-একবার ছইয়ের উপর উঠিয়া ডিঙা গনে দেখে, সব ডিঙাই চোখের সামনে আছে। মনে মনে লাভালাভ কষে, আর দেখে যে, এত লাভ তাহার অদৃষ্টে আর কখনোই হয় নাই।

কিন্তু সব দিন সমান যায় না। একদিন সকালে উঠিয়া দেখিল, দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কালো মিসমিসে একখানা মেঘ উঠিয়াছে। মাঝি বলিল, 'দত্ত মহাশয়, আজ বড়ো সুবিধা নয়, ঐ যে মেঘখানা দেখিতেছেন, ওখানা ভালো নয়। একটু বাদেই ঝড় উঠিবে। আপনারা আপন আপন কামরায় যান, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবেন। বেশি নড়াচড়া করিলে প্রমাদ ঘটিবে জানিবেন।' বলিতে বলিতে ঝড় উঠিল, প্রথম বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ, তাহার পর ঝাপটা, এক-এক ঝাপটায় নৌকাগুলো যেন উল্টাইয়া পড়ে, কিন্তু বাংলার পাটনি মাঝি বড়ো শক্ত মাঝি। হাল চাপিয়া ধরে আর নৌকা ঠিক থাকে। ঝাপটা আসার পূর্বে মাঝির হুকুমে সব পালগুলি গুটানো ও নামানো হইয়াছিল; সুতরাং পালসুদ্ধ নৌকা গুঁজড়াইয়া অতল জলে ডুবিবে, সে ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে। ঝড়-ঝাপটা, ঝড়ের ধাক্কা, গোঁগোয়ানি, এ সকলের চেয়ে আর-এক ঘোর বিপদ আসিয়া পৌঁছিল, সে হইল সমুদ্রের ঢেউ। জোর বাতাসে ঢেউগুলি জোরে জোরে উঠিতে লাগিল। সিকি মাইল, আধ মাইল, এমনকি এক মাইল লম্বা এক-একটি ঢেউ আসিয়া নৌকায় লাগিতে লাগিল। নৌকা যেন চুরমার হইয়া যাইতে লাগিল। ছইয়ের উপর দিয়া ঢেউ গিয়া নৌকার ওপারে পড়িতে লাগিল। ঢেউয়ের মাঝখানে নৌকা পড়িলে, চড়ন্দারেরা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে। সকলে ইষ্টদেবতার নাম করে; ভাবে, আর রক্ষা নাই। এক মুহূর্ত পরে আবার ঢেউ সরিয়া গেলে আবার তাহাদের মনটা একটু সুস্থ হয়। কিন্তু সে সুস্থভাব কতক্ষণ? আবার ঢেউ, আবার ঢেউ। যেন রাশি রাশি, বস্তা বস্তা তুলা - পিঁজা তুলা সমুদ্রের চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। বাতাসে জল প্রথমে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠে। দশ হাত, কুড়ি হাত, ত্রিশ হাত পর্যন্ত জল ফুলিয়া উঠে; সেই ফোলা জলের মাথায় নৌকাগুলি মোচার খোলার মতো উঠিয়া পড়ে; তাহার পর সেই ফোলা জলের মাথাটা ফাটিয়া ফেনা বাহির হয়। ফেনা গড়াইতে থাকে। গড়াইতে গড়াইতে দু ক্রোশ, পাঁচ ক্রোশ, দশ ক্রোশ যাইয়া আবার জলে মিশিয়া যায়। থাকে কেবল দুধের মতো সাদাটুকু। কবির বড়ো আমোদ, তিনি খুব বর্ণনায় সুবিধা পান; কিন্তু যাহারা সেই ফেনার মধ্যে পড়ে, তাহাদের প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতে থাকে। চড়ন্দারেরা মাঝিদের সঙ্গে ঝগড়া করে, 'তোরা আপনার দোষে আমাদের ডুবাইলি দেখিতেছি।' তাহারা মাঝিদের গালি পাড়ে। মাঝিমাল্লারা প্রাণপণে নৌকা রক্ষার চেষ্টা করিতেছে। সেই ভয়ানক ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও তাহাদের গলদঘর্ম হইতেছে, নি:শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে। গালি দিলে তাহারা সহ্য করিবে কেন? তাহারাও গালি পাড়ে; আর বলে, 'আমরা কি করিব? তোমাদের বলিতেছি, চুপ করিয়া বসিয়া থাকো, নড়িলে চড়িলে নৌকা রাখা ভার হইবে।' তাহারা বলে, 'হাঁ রে বেটারা, আমরা কি গুড়ের নাগরি যে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব? আমাদের কি প্রাণের ভয় নাই? তোদের কি? তোরা পরের প্রাণ লইয়া খেলা করিতেছিস?' তাহারা বলে, 'আমাদের বুঝি প্রাণ নয়? তোমাদেরও যেমন প্রাণ আমাদেরও তেমনি। আমাদের প্রাণ থাকিলে তো তোমাদেরও প্রাণ থাকিবে।' একজন বলিল, 'বেটারা জানিস? এই সাঙ্ঘায় বিহারী দত্ত আছে। সে যদি ডুবে, বাংলা দেশটা অন্ধকার হইয়া যাইবে।' তাহারা বলিল, 'হাঁ হাঁ, জানি; কিন্তু আমাদের নিজের প্রাণটা আমাদের কাছে শত শত বিহারী দত্তের চেয়েও বেশি দরকারী। বিহারী

মরিলে তাহার ধন আছে, দৌলত আছে, তাহার পরিবারকে দেখিবার অনেক লোক হইবে। আমাদের স্ত্রীপুত্রকে দেখিবার কে আছে, বলো দেখি?' আবার ঢেউ আসিল। সব ঝগড়া-বিবাদ, সব চেঁচামেচি বন্ধ হইয়া গেল। আবার ত্রাহি ত্রাহি ডাক পড়িয়া গেল।

এদিকে বিহারীর নৌকায় ঢেউ দেখিয়া মেয়েটি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। তাহার দাঁতকপাটি লাগিয়াছে। বিহারীরা স্ত্রীপুরুষে জলের ঝাপটা দিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সে কিছুতেই সমুদ্রের গোঁগোঁয়ানি সহিতে পারিতেছে না, আবার মুর্ছিত হইয়া পড়িতেছে। বিহারীর স্ত্রীর গা বমি বমি করিয়া উঠিল, মাঝিরা একখানা কাঠের সেঁউতি আগাইয়া দিল। বেনেবৌ তাহাতে বমি করিতে লাগিলেন, বমি থামে না। একটু সুস্থ হন, আবার বমি, নৌকা যত দোলে , বমি ততই বেশি হয়। বোধ হয় যেন, পেটের নাড়ি ছিঁড়িয়া যাইতেছে। সে কাতরভাবে স্বামীর মুখের দিকে তাকায়, আর বমি করে। কথা কহার সামর্থ্য নাই, শরীর দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। বেনেবৌ অসার হইয়া পড়িল। মেয়ের ও স্ত্রীর এই অবস্থা দেখিয়া বিহারী স্থির থাকিতে পারিল না। বারবার বড় মাঝিকে ডাকিতে লাগিল। মাঝি আসেনা। সে বলে, 'এখন আমি হাল ছাড়িকে রক্ষা থাকিবে না।' তখন বিহারী পাগলের মত হইয়া তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত। বলিল, 'আমার স্ত্রীর এই অবস্থা, আমার মেয়ের এই অবস্থা, আমায় রক্ষা কর।'

সে বলিল, 'আমি নহি, সে ভগবান! ভগবানের শরণ লও।'

বিহারী বলিল , 'আমি যে ভগবানকে ডাকিব, সে শক্তি নাই। সম্মুখে আমার সর্বস্ব স্ত্রী ও কন্যা মারা যায়, আমার মনের সে জোর কোথায় যে, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি? তুমি রক্ষা কর।'

মাঝি বলিল, 'তোমার স্ত্রীর যে ব্যারাম হইয়াছে, জলের ক্ষোভ হইলে অনেকেরই ওরূপ হয়। জল স্থির হইলে উহা আর থাকিবে না। তুমি একটু শান্ত হও। এতবার সমুদ্রযাত্রা করিয়াছ, তুমি উতলা হও কেন? তোমার মেয়ের প্রাণের কোন ভয় নাই। সে ঢেউ দেখিয়া ভয় পাইয়াছে, ঢেউ ভাঙিলে সুস্থ হইবে।'

বিহারী বলিল, 'আমার আর সয়না। তুমি ইহার একটা বিহিত কর, নহিলে আমি প্রাণত্যাগ করিব; ওই শুন, আবার বাতাস গোঁ-গোঁ করিতেছে, আবার ঝাপটা আসিবে। আবার পর্বতপ্রমাণ ঢেউ আসিয়া নৌকাখানাকে উল্টাইয়া পালটাইয়া ফেলিবে।'

'মাঝি বলিল, 'মশাই, আমি এই ঢেউ থামাইয়া দিতে পারি, কিন্তু তাহাতে আপনার সাত আট লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে, সহিতে পারেন তো বলুন।'

বিহারী বলিল, 'আমার যথাসর্বস্ব যায়, সেও আচ্ছা, আমার স্ত্রী ও কন্যা যেন প্রাণ পায় ও সুস্থ হয়।'

'আচ্ছা, তবে আপনি ঘরে যান, আমি যাহা জানি, করিয়া ফেলি।' বলিয়া মাঝি আরেকজন মাঝিকে ডাকিয়া কি বলিয়া দিল। সে নৌকার খোলের ভিতর গেল, আর সমস্ত মাঝিমাল্লা ডাকিয়া পঞ্চাশটা গর্জন তেলের পিপা বাহির করিয়া পাটাতনের উপর রাখিল। ঝড় যখন খুব জোরে আসিতেছে, তখন সেই পিপার সমস্ত তেল সমুদ্রের মধ্যে ঢালিয়া দিতে লাগিল। অনেক কষ্টের সংগ্রহ করা তেলের পিপাগুলি এইরূপে নষ্ট করায় বিহারীর মনে একটু কষ্ট হইল বটে, কিন্তু সে কিছুই বলিল না।

তেল যতদূর যাইতে লাগিল, সমুদ্র স্থির হইতে লাগিল; বাতাসের যে জোর, সেই জোরই রহিল, কিন্তু সমুদ্রে আর ঢেউ উঠে না। সমুদ্র দর্পনের মত স্থির রহিল; নৌকা জোরে চলিতে লাগিল, কিন্তু টলে না। বেনেবৌ একটু সুস্থ হইল, তাহার বমি থামিয়া গেল। মেয়েও সুস্থ হইল; বেনের মনটাও ঠাণ্ডা হইল, সে মাঝিকে অনেক টাকা পুরষ্কার দিবে স্বীকার করিল। মাঝির উপত তাহার বিশ্বাস খুব বাড়িয়া গেল। ঝড় তখনও সমানে বহিতেছে। মাঝি দত্তমহাশয়কে নিকটে ডাকিয়া পাঠাইল। বেলা তখন দুপর। বিহারী মাঝির ঘরে বসিয়া দেখিল, তাহার নৌকা স্থির সমুদ্রের উপর দিয়া বেগে উত্তর পশ্চিম মুখে যাইতেছে। তাহার সব ডিঙাগুলি দূরে দূরে দেখা যাইতেছে। মাঝি বলিল, 'ঝড়ে আমাদের বড়ই উপকার করিয়াছে, আমরা এক বেলায় সাত আটদিনের পথ আসিয়া পড়িয়াছি। আজ সন্ধ্যার পূর্বে হউক বা একটু পরেই হউক, গঙ্গার মোহানায় গিয়া পৌঁছিব।'

মাঝি যাহাই বলিল, তাহাই হইল। সন্ধ্যার একটু আগে, চাকি ডুবডুব সময়ে বিহারীর সাঙ্ঘার সাত ডিঙা গঙ্গার মোহানায় আসিয়া পৌঁছিল ও একটা প্রকাণ্ড বালির চড়ায় নোঙর করিল। চরাটা অনেক উঁচা হইতে ক্রমশ ঢালু হইয়া জলের ভিতর চলিয়া গিয়াছে; যেখানটা খুব উঁচা, সেখান হইতে ওদিকে নিবিড় বন। সুন্দরী গাছই বেশি; সোঁদাল, পাঁও প্রভৃতি গাছও আছে, দুইচারিটা বড় গাছও আছে। আর তলায় বেতবন, গোলপাতার গাছ, আর নানারকম লতাগুল্ম। নোঙর করা হইলে অনেক মাঝি ও অনেক চরণদার মহা-আনন্দে নামিয়া অনেক দিনের পর বাঙলার মাটি ছুঁইয়া গেল।

বেনের মেয়ের প্রথম প্রকাশ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 'নারায়ণ' পত্রিকায় ১৯১৮ সালে। তেল দিয়ে সমুদ্রের ঢেউকে ঠাণ্ডা করবার গল্প বাঙলায় প্রথম লিখেছিলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত তাঁর এই গল্পে অবশ্য বিহারীর ব্যবহৃত দামি গর্জন তেলের বদলে ব্যবহার করা হয়েছিল একান্তই বাঙালি একটি তেল। তার নাম কুন্তলীন কেশতৈল।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা জানাই। বাংলার প্রথম সায়েন্স ফিকশনটি লেখা হয়েছিলো ১৮৫৭ সালে। প্রথম প্রকাশ ১৮৭৯ সালে। লেখক ছিলেন বিজ্ঞানি শ্রী জগদানন্দ রায়। গল্পের নাম 'শুক্র ভ্রমণ।' এটি আধুনিক যুগের সবচেয়ে পুরোন সায়েন্স ফিকশনগুলোর মধ্যে একটা।

সেই আয়না

জয়ঢাক-পড়ুয়াদের জন্য এবারে কলম ধরলেন শিল্পী সুজয় রায়, তুলির সাথে কলমেও শব্দছবি আঁকায় যাঁর জুড়ি মেলা ভার। তিনি নিয়ে এসেছেন এক আশ্চর্য জাদু আয়না, যার বুকে ধরা পড়েছে পুরোনদিনের সব ছবি, বিহারের গ্রামদেশে কাটিয়ে আসা এক সুন্দর ছোটবেলার গল্পকথা। এসো, আমরা সবাই মিলে দেখতে বসি–

পর্ব দুই

এক

কৈশোরে মাতুলালয়ের স্মৃতিচারণ অনেকেই করে থাকে। আমারও মনের এক জানালা খোলা সেই দিকে। দক্ষিণ কলকাতার অনুপম সুন্দর ঢাকুরিয়া লেকের কাছে লেক টেরেসের ভাড়া বাড়িতে আবসর জীবনযাপন করে গেলেন আমার দাদামশায়। শুনেছিলাম দেশ ভাগের সময় দাঙ্গাতাড়িত হয়ে সুন্দর ফ্ল্যাট পেয়েছিলেন কিছু সেলামী দিয়ে। গৃহস্বামী মেয়ে-জামাই একই কারণে বিপন্ন হয়ে প্রার্থী হয়েছিল, কিন্তু সেলামী দিতে সক্ষম নয় তাই এই প্রস্তাবে তার মন গলেনি। দাদামশায়ের ছয় ছেলে, পাঁচ মেয়ে নিজেদের পরিবার সহ প্রথমে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করলেন এই নিবিড় আস্তানায়। বাড়ির পরিবেশ ছিল উজ্জ্বল, মুখর। জীবনের খোরাক ছিল ঝলমলে কৌতুক। হাস্যরস পরম নিষ্ঠার সঙ্গে কথায়, ব্যবহারে, এমনকি পোশাকেও ধরে রাখা পরিবারের নিপুণ বৈশিষ্ট্য ছিল। বলব সেই কথা। অবশ্য অদৃষ্ট পুরুষ নিজেও মানুষের সঙ্গে অকরুণ কৌতুক করেন, বোধহয় খেলা-ভাঙার খেলা করেন। রসবোধ কেউ শেখায় না। নিজের মেজাজেই কোন এক পরিবারে ভর করে। রসের ভূত মাথায় চাপলে দুঃখের দিনেও মন হাল্কা হয়ে যায়।

বাড়ির বিপরীতে ছিল বজরং ব্যায়ামাগার। এখনও আছে। ইদানিং সেখানে বেশ জাঁক করে বজরঙবলি পূজো হয় মন্দির তুলে। দক্ষিণা আয় হয় বেশ। সেই পরিমাণে শরীরচর্চা হয় কিনা সে প্রশ্নটি মন্দিরের ভিড়ের আড়ালে ধূপ-ধুনায় ধোঁয়াটে থেকে যায়। গোড়াতে অবশ্য শরীরচর্চার এই মন্দিরে অনেকে নিয়মিত শরীরপাত করত, বীর হনুমানের মত শালপ্রাংশু চেহারা ছিল তাদের। আমাদের অতি পরিচিত ছিল চুনীদা। রোজ নিয়ম করে বিকাল পাঁচটায় আখড়ায় নেমে পড়ত, বিহারী এক পহলওয়নকে নিয়ে লোফালুফি করত। পালোয়ান বেচারা ছিল কুস্তির মাইনে করা ওস্তাদ। বিকেল পাঁচটায় চুনীবাবুর গলার হুঙ্কার শুনে পাড়ার সচকিত লোকেরা ঘড়ি মিলিয়ে নিত। শিষ্যের হাতে গুরুর

এই দুর্গতি দেখে অনেকেই বুদ্ধিমানের মত কুস্তির আখড়া সন্তর্পনে এড়িয়ে চলত। শেষ পর্যন্ত চুনীদার দিগ্বিজয় যাত্রা শেষ হয়েছিল অপ্রত্যাশিত ভাবে। বার্ষিক কুস্তি প্রতিযোগিতা। চুনীবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বি কর্পোরেশনে সামান্য চাকরি করে। বাবরি চুল, কবিতা লেখার শখ আছে, তবে সংস্কৃতে। ভগবান স্বাস্থ্য ভালই দিয়েছেন। চুনীদার হাতে বলির পাঁঠার মত নধর। কুস্তী শুরু হতে এক লহমায় চুনীদার লৌহকপাট বজ্র আলিঙ্গনে সেঁদিয়ে গেল সে। পরের দৃশ্য অভাবনীয়। চুনী পালোয়ানের আর্ত চিৎকার, খিল খিল হাসি, কাশ্মীরের খিলানমার্গ খসে পড়বে বুঝি। 'আমাকে রক্ষা করো, ছোঁড়া আমারে কাতুকুতু দিয়া গঙ্গাযাত্রা করাইবে, আমি তো আর নাই। এই পোলাপানের মাথায় শয়তানের বুদ্ধি। অই, অই, আমাগো প্যাটে চুমা খাইতাছে। ওরে ডাক্তারের মানা আছে - আমার বড় হাসি পায়। হাসি থামান যায় না।

'ছোঁড়া, আখড়ার নিয়ম কানুন জানা নাই? আমারে হাসায়ো না - আমাগো কান্না পায় যে। কে তোরে এই অপকর্ম শিখাইল, আমার পোলাডা নিশ্চয়। যেমন বাপ, তেমনি পোলা আমার।' চুনীবাবু পরম বিক্রমে মাটি নিল, ভূমিকম্পের মতো প্রকম্পিত হল শরীরটা। আমরা দর্শকের শ্রেণীতে দাঁড়িয়ে প্রথমটা ভ্রম করলাম নক্সা হচ্ছে বুঝি। হয়তো ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে চুনীদা একেবারেই চিৎ। নবাগত কুস্তিগীর এবারে কানে কানে চুনীদাকে কী যেন গূঢ় তথ্য জানাল। চুনীদার হাস্যযন্ত্রণা কালবিলম্ব না করে একেবারেই প্রশমিত হয়ে গেল, দমে গেল সম্পূর্ণ। 'কী কইলে? স্পিচ দিতে হবে, ফেয়ারওয়েল স্পিচ? ইংরাজিতে পারুম না। আমার তিন পুরুষ ইংরাজি কয় নাই। তার আগে অমন ভাষা আছিল কিনা জানা নাই। আমি বাড়ি যামু, আমার ঘাম অইতাছে। সুড়সুড়ি সওন যায়, কিন্তু ইংরাজি, সে বড় লজ্জার ব্যাপার।'

সেই দিন চুনী পালোয়ান, অনেক লড়াইয়ের সাক্ষি, আখড়া ছেড়ে চলে গেল বীরের আসন শূন্য করে। পালোয়ানী ছেড়ে রসের কড়াই চাপিয়ে বসল বড় রাস্তায় দোকান দিয়ে। মিঠাইয়ের দোকান। যারা সারাদিন গুলতানি করে দিনটাকে জাহান্নামে পাঠায়, তাদের রসের যোগান দিয়ে চলল চা ও তেলেভাজা সহযোগে। আমরাও দোকানে গেছি, অম্লরসের বিষোদগার করে চলে এসেছি ভুক্তভোগী হয়ে। ক্রমশ চুনীদার পালোয়ানী গঠনটা উদর স্ফিত ময়রাপানা হয়ে গণেশাবতার দেখাত।

আমার দাদামশায়ের বাড়ি শনিবাসরীয় ও রবিবাসরীয় কোলাহলে কল্লোলিনী হয়ে জমে থাকত। সপ্তাহান্তে আত্মীয়রা দিনাবসানে পালতোলা নৌকোর মত নোঙর ফেলত সেখানে। দরজায় চটিজুতো ছত্রাকার। কার সম্পদ কে তুলে নিয়ে গেল পায়ে, ফেরার পথে তা ঠাহর করা যেত না। কার পাদুকা কে পায়ে বহন করে এনেছিল, সেই গোড়ার কথাটাই জানা ছিল না যে এমন হরণকারী চরণবিদ্যা পায়ের তলায় হেলাফেলা করত তারা। তেমনি জামাকাপড়ের একটা বিভ্রান্তকারী এ-গায়ে, সে-গায়ে যাতায়াত ছিল অনায়াস ক্ষিপ্রতায়।

মনে পড়ে, আমি তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। নিয়মিত ক্লাস চলে কফি হাউসে। হাত খরচের বড় জরুরি প্রয়োজন। ছোটমামা আছে বিজ্ঞাপন অফিসে। বেশ বিজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত চেহারা। পোশাকে-আশাকে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করে চলে আমাদের হ্যাংলা দৃষ্টির সামনে। সে-ই প্রশ্রয় দিয়ে বললে, 'আমার অফিসে একটা ইন্টারভিউ দে, মার্কেট সার্ভে করা হবে টেম্পরারি হাতে।'

ঘোষণা করে তো অফিসে গেল সে। কিন্তু আমার কাছে তো চাকরিসন্ধানী উপযুক্ত জামা নেই! তবে নরাণাং মাতুলক্রম। তাঁরই এক জামা গায়ে চাপালাম, হলদেপানা গরদের শার্ট, বেশ জামাই-শ্রী খোলে। মাথায় চপচপে তেল মেখে, সিঁথি টেনে ঘর্মাক্ত ললাটে উপস্থিত হলাম অফিসে। সঙ্গে আমার ছাত্রবন্ধু। এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাই আমরা। অসামান্য দীনতায় ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে উপস্হিত হলাম ঝড়ে পড়া ভগ্নতরীর মতো।

ও হরি! সামনে ছোটমামা সিগারেট ধূমায়িত করে চলেছে জটিল জ্যামিতিতে। পাশে এক অগ্নিশিখা, কালো কুন্তল চুল, ভ্রমরের মত গুঞ্জন করে চলেছে। মহিলার নাম খেয়ালি নন্দী। আমরা দুই বন্ধু নন্দী-ভৃঙ্গীর মতো। আমাদের একমাত্র কোয়ালিফিকেশন জানালাম যে আমরা বেকার। আমাদের সামনে হর-পার্বতীর আসন টলল, খেয়ালির খেয়ালে বিচার হলো কোয়ালিফিকেশন সত্যিই জোরালো। অস্থায়ী চাকুরি মঞ্জুর। রাস্তায় এসে আনন্দের জোয়ারে সিগারেট ধরালাম, গায়ের জামা আগুনের ছ্যাঁকায় একটু ছিদ্র হলো।

অফিস থেকে ছোটমামা ফিরে এল গনগনে মেজাজে। চটে বলল, 'যে জামাটা খেয়ালি আমাকে প্রেজেন্ট করেছিল, সেটা পরেই তার সামনে গেলি হনুমানের মতো। চাকরিও হয়ে গেল, আমার ইয়ে, মানে প্রেস্টিজ ডুবিয়ে। তা, এখন থেকে কি আমারই প্যান্ট শার্ট চড়িয়ে অফিসে যাতায়াত হবে'? তাই শুনে আরেক মাতুল মন্তব্য করল 'তোর চেয়ারেই অফিসে গিয়ে বসবে হয়তো, বলা কি যায়!'

ছোটমামার অগ্রজ রুণুমামা, গোপনে নাম দিয়েছিলাম ক্লাসিকাল মামা। কারণ উচ্চাঙ্গ গান ছাড়া অন্য গান তঁকে তৃণসম দগ্ধ করে দিত। এই সব কথা নিয়ে নিয়মিত বচসা ছোটমামার সঙ্গে। কথা কাটাকাটির তুবড়ি ছুটত, বিশেষ করে ভাতের থালায়। রুনুমামা বলল 'আধুনিক গান পান-বিড়িওয়ালাদের মানায়'। ছোটমামা অমনি জবাব দিল 'কেন, তোমাদের বড়ে গোলাম আলি যখন গায় তিরছি নজরিয়াকে বাণ, তখন খারাপ শোনায় না?'

বড়পিসীর ছেলে ভানুদা। রুনুমামার সমবয়সি। মামা-ভাগ্নের চতুর রসিকতা আজও কানে বাজে। ভানুদার মস্ত শরীর, বারবেল ভাঁজা চেহারাটা। রুনুমামা ফরসা, সাফ-সুরত, হাওয়াতে চলে হাল্কা মানুষ। খানিকটা সাহেবিয়ানা আছে মেজাজে। ভানুদা ব্যায়াম সেরে ঘর্মাক্ত কলেবরে হাতে তুলে নিত খোলা ভোজালি। গান ধরত 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয়।' গানের তানের সঙ্গে রুনুমামাকে গ্রাস করত কঠিন আলিঙ্গনে। ....

ক্লাসিকাল মামা বিয়ে করলেন। তাঁর শর্ত ছিল শ্বশুরবাড়ি এমন হওয়া চাই যারা মার্গসঙ্গীত পছন্দ করে। বিয়ের দিন বরযাত্রীর গাড়ি চড়ে আমি আর ভানুদা চলেছি। বিয়েবাড়ির কাছাকাছি কানে

এল সানাইয়ের ভরপুর তান। মামা নড়েচড়ে বসে বলল, 'পরিবারটা বেশ, নারে ভানু? রুচি আছে স্বীকার করতে হবে।' ভানুদা উত্তর দিল 'ক্রমশ প্রকাশ্য।' প্রসন্নমনে গন্তব্যস্থলে এসে পড়লাম। এদিকে

'বর এসেছে' ডাকে ডাকাত পড়তেই সানাই বন্ধ, মাইকে শুরু হল হিন্দি গানের সুরে ব্যান্ড। আমরা বজ্রাহত। ওদিকে গোদের ওপর বিষফোঁড়া। রুনুমামার হাঁটার তালে ব্যান্ড স্বচ্ছন্দে তাল মিলিয়ে চলেছে। ভারি অস্বস্তিকর ব্যাপার। কিছুতেই এই তালের ফাঁদ কাটিয়ে উঠতে পারছে না বরের আড়ষ্ট পা। ভানুদা আমার কানে কানে বলল 'হাঁদা কিস্যু বুঝিস না সানাইটা ওদের বায়না করা, আমার ব্যান্ড ভাড়া করা।' নরাণাং মাতুলক্রম, কিংবা একটু বেশি বটে!

আমার বহুল মাতুলের অতুল কথাসাহিত্য মনে রাখার ক্ষমতা নেই। জীবনের রঙ খানিকটা ফিকে হয়ে গেছে কিনা। আপন মামা ছাড়া নাতিদূর সম্পর্কের মামারাও আছে। পরিহাস সাহিত্যের প্রতিবেদনায় তাদের আত্মত্যাগ কম নয়। এমনি এক তপন মামা, এয়ারফোর্সে ছিল। মিলিটারি গোঁফ, মজবুত শরীর, অবসর সময়ে অরবিন্দের বিশাল ইংরাজি বই পড়ত, যাতে আমাদের দাঁত ভেঙে যেত। একটু বোহেমিয়ান ছিল। একদিন হঠাৎ ভগবানের দান সবকটা কাঁচা দাঁত তুলে চলে এল বীরের মত। (আমদের পারিবারিক ডাক্তার সন্দেহ করত মামারা সকলেই কমবেশি পাগল-সুন্দর)। যাইহোক, ঘটনাটা শ্রী অরবিন্দের প্রভাব ভেবে বহুকাল অরবিন্দের পথ মাড়াইনি। তপনমামার সহোদর ভাই কালিমামা আমাদেরকে ছোটবেলায় শোনাত অবিকল হেমন্তের কন্ঠে শচীন কর্তার গান। একবার নাকি বেতার জগতের সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান সূচিতে দুজনের নাম উল্টেপাল্টে গিয়েছিল, আর তাঁরা গলা পাল্টে গেয়েওছিলেন। কালিমামার মুখে শোনা।

ক্রমশ

স্মরণীয় যাঁরা

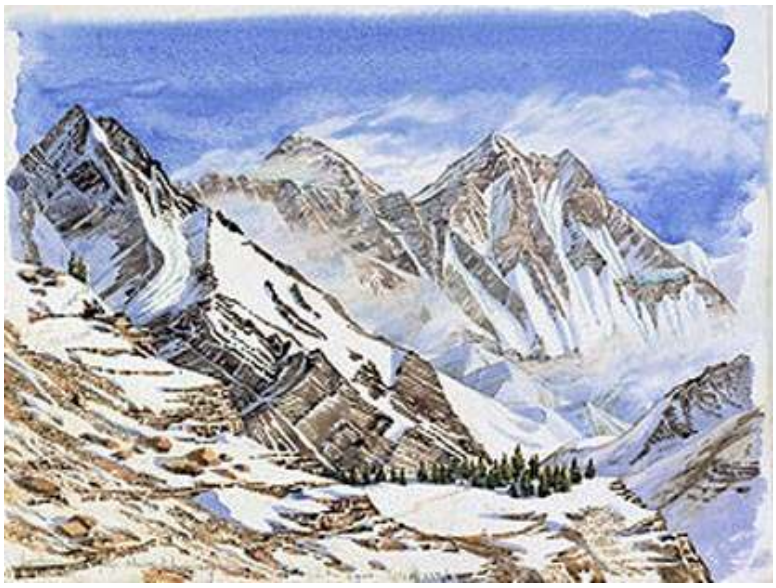

রাধানাথ শিকদার

মহাশ্বেতা

সন ১৮৫২। ভারত তখন ইংরেজ শাসনাধীন। একদিন দুপুরবেলা 'দা গ্রেট ট্রিগোনমেট্রিক সার্ভের' একটা অফিসে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলো এক ভারতীয় যুবক। কিছুক্ষণ পরেই তার বড়কর্তার ঘরে ঢুকে তাঁকে জানাল, 'স্যার, আমি বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গটা আবিষ্কার করে ফেলেছি।'

এই যুবকটির নাম রাধানাথ শিকদার। সে যুগের এক অন্যতম ভারতীয় গণিতজ্ঞ, যিনি প্রমান করেছিলেন যে সার্ভে ম্যাপে দেখানো পিক ১৫ নামের একটা আপাত সাধারণ গিড়িচূড়াই হল বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ।

১৮১৩ সালের অক্টোবর মাসে, কলকাতার জোড়াসাঁকোয় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে রাধানাথ জন্ম নিয়েছিলেন। বাবা তিতুরাম গোঁড়া ব্রাহ্মণ হলেও, তাতে রাধানাথের পড়াশোনা করায় বিশেষ অসুবিধা হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন কমল বোসের স্কুলে। রাধানাথ ডিরোজিওর অন্যতম শিষ্য ছিলেন। কিন্তু ডিরোজিওর আর সব শিষ্যের মধ্যে একমাত্র তিনিই বিজ্ঞানকে পড়ার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। ১৮২৪ সালে তিনি হিন্দু কলেজ, মানে এখনকার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন, আর প্রায় ন-বছর সেখানে পড়াশোনা করলেন। হিন্দু কলেজে ছাত্র থাকাকালীন তাঁকে প্রতি মাসে তাঁর ছাত্রবৃত্তির একটা বড় অংশ দিয়ে দিতে হত বাবার অভাবের সংসার চালানোর জন্য।

রাধানাথ কলেজ ছাড়লেন ১৮৩২ সালে, ভালো ব্যবহারের জন্য একটা সার্টিফিকেট, আর ইংরিজি ভাষা ও সাহিত্যে দুর্দান্ত দক্ষতা নিয়ে। কলেজ ছাড়তেই সংসার চালানোর দায়িত্ব এসে পড়ল তাঁর ঘাড়ে। রাধানাথ চাকরির খোঁজে হন্য হয়ে ঘুরছেন যখন, তখন হঠাৎ করেই তাঁর এক শিক্ষক সমস্যার সমাধান করে দিলেন। হিন্দু কলেজের এই অধ্যাপক, ড:টাইটলার, 'দা গ্রেট ট্রিগোনমেট্রিক সার্ভে'-তে একটি পদের জন্য রাধানাথের নাম সুপারিশ করলেন সার্ভেয়র জেনারেল জর্জ এভেরেস্টকে একটা চিঠিতে। এভারেস্টের দরকার ছিল গোলক ত্রিকোণমিতিতে দক্ষ কোন অঙ্কবিদকে। টাইটলার, তার সেই চিঠিতে রাধানাথের অঙ্কের মাথা সম্বন্ধে বেশ কিছু ভাল কথা বলেছিলেন। ফলে রাধানাথ শিকদার ট্রিগোনমেট্রিক সার্ভের 'কমপিউটর'-এর পদে নিযুক্ত হলেন। আর তিনিই ছিলেন ওই পদটায় নিযুক্ত হওয়া প্রথম ভারতীয়। প্রতি মাসে মাইনে তিরিশ টাকা। রাধানাথ কলকাতা ছাড়লেন সেই বছরের ১৫ই অক্টোবরে, সেরাং বেস লাইনে কাজ শুরু করবার জন্য। সেইখানে কাজ করবার সময় রাধানাথ প্রচলিত জরিপের নিয়ম ছাড়াও তাঁর নিজস্ব কিছু অঙ্কের নিয়ম ব্যবহার করতেন। তাঁর বানানো সেই নিয়মগুলো পরে সব জরিপের কাজেই ব্যবহার করা শুরু হয়।

জরিপের কাজের সাথে সাথে রাধানাথ অঙ্কও করে যেতে লাগলেন। অঙ্কে তার এই দক্ষতা দেখে খুশি হয়ে এভারেস্টও তাকে কিছু ব্যাপারে সাহায্য করতেন। আর সার্ভের কাজেও রাধানাথের জুড়ি ছিল না। এইরকম কাজের লোককে কোনমতেই হাতছাড়া করতে ইচ্ছুক ছিলেন না এভারেস্ট। তাই ১৮৩৭ সালে যখন রাধানাথ ডেপুটি কালেকটরের পদের জন্য চেষ্টা করছেন, তখন এভারেস্ট কিছুতেই তাঁর নামে সুপারিশ দিতে রাজি হলেন না। সেইসঙ্গে তিনি ওপরওয়ালাদের সঙ্গে কথা বলে এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে রাধানাথ কিছুতেই অন্য কোন দপ্তরে কোন কাজ না পায়। কিছুকাল পরে একটি চিঠিতে এভারেস্ট লিখেছিলেন, 'রাধানাথের মতো মাথাওয়ালা লোক, শুধু ভারতে নয়, ইউরোপে খুঁজলেও বেশি পাওয়া যাবে না। ইংল্যান্ডে দৈনিক এক গিনির কম মাইনেতে এমন লোক রাখা যাবে না। আর যদি ওর মতো দক্ষ ও গণিতকে বোঝার শক্তিযুক্ত লোককেই খুঁজতে হয় আমাদের, তাহলে আমার এটা বলে দেয়াই ভালো যে, তাকে দিয়ে কোনভাবেই এইসব কাজ করানো যাবে না। সে তাকে আমরা যতো মাইনেই দিই----------'

১৮৪৩ সালে এভারেস্ট চাকরি থেকে অবসর নিলেন। তাঁর জায়গায় তখন এলেন কর্নেল অ্যান্ড্রু ওয়াউ। এভারেস্টের মতন তিনিও রাধানাথের কাজে বেজায় খুশি, আর আগের জনের মতো তিনিও তাকে আর কোথাও কাজ করতে দিতে নারাজ। ১৮৫০ সালে রাধানাথ যখন ম্যাজিস্ট্রেটের পদের জন্য কলকাতায় দরখাস্ত করলেন, তখন ইনিও তাতে বাগড়া দিলেন। রাধানাথকে তাঁর দপ্তরে রেখে দেয়ার জন্য তিনি ওপরওয়ালাদের চিঠি লিখলেন রাধানাথের মাইনে বাড়িয়ে দেয়ার জন্য।

প্রায় ২০ বছর হিমালয়ে কাটিয়ে দেয়ার পর, ১৮৫১ সালে রাধানাথ শিকদার 'হেড কমপিউটর' হিসেবে কলকাতায় বদলি হয়ে এলেন। সেই দুই দশকে তিনি হিমালয় প্রায় চষে বেরিয়েছেন এবং সেইসব জায়গা সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতাও অর্জন করে ফেলেছেন। শুধু তাই নয়, হেড কমপিউটর হওয়ার সাথে সাথে তিনি আবহওয়া দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডেন্টও ছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর নিজস্ব কিছু নতুন নিয়ম কানুন চালু করেন, যা পরের বেশ কিছু দশক সেখানকার নির্দিষ্ট নিয়ম হয়ে ছিল। সেগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে বিভিন্ন তাপমাত্রায় নেওয়া রিডিংস-কে ৩২ ডিগ্রি ফারেনহাইটের হিসেবে বদলানোর ফর্মুলা। ১৮৫৪ সালে তিনি বাঙালি মহিলাদের শিক্ষা ও সচেতনতার ওপর একটি 'মাসিক পত্রিকা'নামে একটা পত্রিকার জন্ম দিলেন।

কিছুকাল পরে কর্নেল ওয়াউ-এর নির্দেশে রাধানাথ হিমালয়ের কিছু বরফে ঢাকা পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা মাপার কাজ শুরু করেন। এই পর্বতশৃঙ্গদের মধ্যেই ছিল পিক ১৫। রাধানাথের নেয়া প্রায় ছ'খানা রিডিং এই প্রমান করল যে এই পিক ১৫, যার উচ্চতা ২৯,০০২ ফিট, পুরোন মাপজোক অনুযায়ী উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার থেকে বেশ অনেকখানি উঁচু। আরও বেশ কয়েকবার হিসেব করে, তথ্যটিকে ভালভাবে যাচাই দেখে নেয়ার পর রাধানাথ কর্নেল ওয়াউ-কে তাঁর এই আবিষ্কারের একটা রিপোর্ট দিলেন। ওয়াউ কিন্তু সাবধানী লোক। তথ্যটি পুরোপুরি সত্যি কিনা সেটা যাচাই করে না নিয়ে তিনি এই আবিষ্কারের কথা কাউকে জানালেন না। কয়েক বছর পরে, নিজে এ ব্যাপারে একদম নিশ্চিত হবার পরই তিনি এই আবিষ্কারের কথা আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করলেন।

এই ধরণের পর্বতশৃঙ্গের নামকরণের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম ছিল, শৃঙ্গের আঞ্চলিক নামই হবে তার অফিসিয়াল নাম। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বদেশপ্রেমী ওয়াউ সেই নিয়ম মানলেন না। পিক ১৫-এর নামকরণ করা হল ওয়াউ-এর আগের কর্তা এভারেস্টের নামে। ফলে রাধানাথ শিকদারের দ্বারা আবিষ্কৃত পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গের নাম হয়ে গেল 'মাউন্ট এভারেস্ট'। ইয়োরোপীয় কর্তাদের নামে ধন্য ধন্য হতে লাগলো আর এই মেধাবী বাঙালি গণিতজ্ঞ তলিয়ে গেলেন বিস্মৃতির সমুদ্রে। হাজার হোক, রাধানাথ ছিলেন পরাধীন ভারতের এক সাধারণ নাগরিক। তাঁর সমসাময়িক অনেক ইয়োরোপীয় গণিতজ্ঞ যতটা সম্মান ও পরিচিতি পেয়েছিলেন তার কিছুই প্রায় পেয়ে উঠতে পারেননি রাধানাথ শিকদার।

১৮৫১ সালে ট্রিগোনমেট্রিক সার্ভে থেকে একটি 'সার্ভে ম্যানুয়াল' ছাপা হয়। তার ভুমিকায় বেশ স্পষ্টভাবেই বলা ছিল যে ম্যানুয়ালের জটিল অঙ্ক ও টেকনিকাল অংশগুলো রাধানাথ সিকদারের লেখা। এই ম্যানুয়ালটি পরে সার্ভেয়রদের খুবই কাজে লেগেছিল। কিন্তু ১৮৭৫ সালে এই ম্যানুয়ালটির তৃতীয় সংস্করণে ভুমিকাটাকে উড়িয়ে দেওয়া হল। তার সঙ্গে হারিয়ে গেল রাধানাথ শিকদারের নামও। কোথাও আর তাঁর কাজের কোনও উল্লেখ রইল না। রাধানাথ তখন আর বেঁচে নেই। ১৮৭০ সালের ১৭ মে-তে তিনি মারা গেছেন। তার হয়ে লড়ার কোন লোক নেই আর। কিন্তু ঘটনাটা পুরোপুরি উপেক্ষিত হয়নি। তখনকার এক নামজাদা খবরকাগজ 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া'-তে এর অনেক নিন্দা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে বিশেষ কোন লাভ হয়নি।

শুধু গণিতজ্ঞই নয়, রাধানাথ দেশপ্রেমিকও ছিলেন। ১৮৪৩ সালে ইংরেজ সরকার তাঁর থেকে ২০০ টাকা জরিমানা নেয়। ট্রিগোনমেট্রিক সার্ভেতে ভারতীয় কর্মীদের ওপর করা অবিচারের প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি তাই এই শাস্তি। ডিরোজিওর আরেক শিষ্য, রামগোপাল ঘোষ-এর সমপাদনায় 'দা বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এ এই ঘটনাটার খুঁটিয়ে বিবরণ দেওয়া হয়।

তবে একটুও স্বীকৃতি পাননি তিনি সেটা বললে ভূল বলা হবে। ১৮৬৪ সালে জার্মান ফিলোসফিকাল সোসাইটির বাভারিয়া শাখায় তাঁকে সদস্য করা হয়েছিল। সেযুগে একজন ভারতীয়র পক্ষে এ ধরণের সম্মান পাওয়া ছিল প্রায় অসমভব। স্বাধীন ভারতও তাঁকে মনে রেখেছে।

২৭/৬/২০০৪ সালে ভারতের পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট থেকে মাউন্ট এভারেস্টের আবিষ্কারক রাধানাথের ছবিওয়ালা ডাকটিকিট বের করা হয়েছে।

অঙ্কপাগল রাধানাথ বিয়ে করেননি। সারাটা জীবন বিজ্ঞান ও গণিতকেই পূজো করে এসেছেন তিনি। হৃদয়ে আর অন্য কোন কিছুর জায়গা ছিল না তাঁর।

ছবিঃ সংগৃহীত

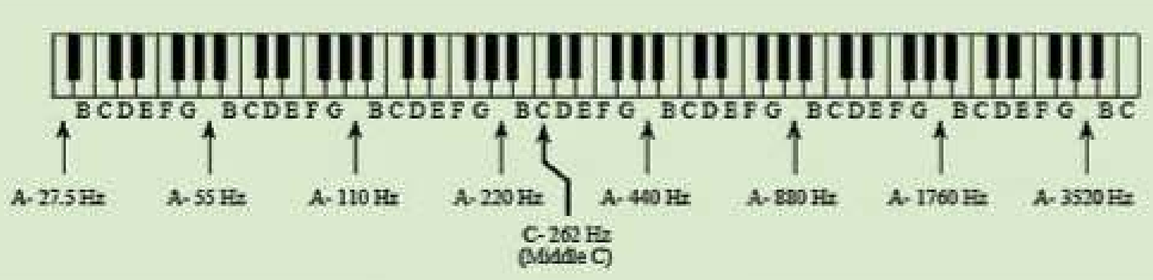

সুর ঢাক

• প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

স্বর-লিপি বা স্বরের লিখিত রূপের ব্যাপারটা কি তা না শিখেও অক্ষরজ্ঞান আছে এমন যে কেউই স্বরলিপি সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারে - কথা হচ্ছিল এই নিয়ে। যেমন 'ক' বা 'এ' শব্দ দেখে কেউ 'খ' বা 'ঐ' বলে না। অক্ষর-পরিচয় করিয়ে দেবার সময়ও, যিনি শেখাচ্ছেন তিনি স্বরলিপি না জেনেও অক্ষরগুলোর সঠিক উচ্চারণ শেখাতে পারেন।

বলেছিলাম ছোটবেলা থেকে শুনে শুনে সব অক্ষরের, শব্দের, বিশেষ বিশেষ ছাপ যদিও অজান্তেই আমাদের মনে গেঁথে যায়, সেই ছাপগুলো আমাদের প্রকাশভঙ্গীকে গানের স্বরলিপির মত করে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে না। এইভাবে বেঁধে না রাখার ফলে মনের ভাব বোঝাতে কোন্ শব্দটা কিভাবে ব্যবহার করব, সেই ব্যাপারে নিজস্বতা, বা স্বাধীনতা, কথা বলার ক্ষেত্রে খানিকটা হলেও বেশী-ই থাকে স্বরলিপি-নির্ভর গানের তুলনায়। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে -

ধরো কাউকে বলছ - 'তুমি এলে, এই আমার সৌভাগ্য'। এই কথাটার অক্ষর বা শব্দগুলো আমরা কেউই শুধুমাত্র অক্ষর-পরিচয়ের সময় শেখা উচ্চারণ অনুসরণ করে বলি না। কখন, কাকে মনের কোন্ ভাব বোঝাতে এই কথাটা বলছি তার ওপর শব্দগুলোর ওঠানামা নির্ভর করে। এই কথাটা বলার সময় 'তুমি'ব 'মি', 'এলে'র 'লে', 'এই আমার' আর 'সৌভাগ্য'র 'ভাগ্য' এই কথাগুলো তীক্ষ্ণতর (উঁচু) স্বরে বলে দেখো - দেখবে কথাটা ব্যঙ্গের মত শোনাবে। রেখাচিত্র দিয়ে বোঝালে ব্যাপারটা এরকম দেখাবে-

আবার শুধু 'এই' কথাটা উঁচু করে বাকিগুলো মোটামুটি একই স্বরে রাখলে মনে হবে আন্তরিক ভাবে বলছ। তখন রেখাচিত্রটা হবে এই রকম -

এই উঁচু আর নীচু স্বরের রেখাচিত্রের ব্যাপারটা যদি খটোমটো মনে হয়, তাই এই ব্যাপারটা আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম লাইনটা দিয়ে বলি - কারণ এই লাইনটা সবারই মোটামুটি জানা। তবে তার আগে গানের লাইনটা ঠিক যেভাবে উচ্চারণ করে গাই আমরা, ঠিক সেভাবে লিখে নেব -

জন গণ মন অধি নাআ য়ক জয় হেএ

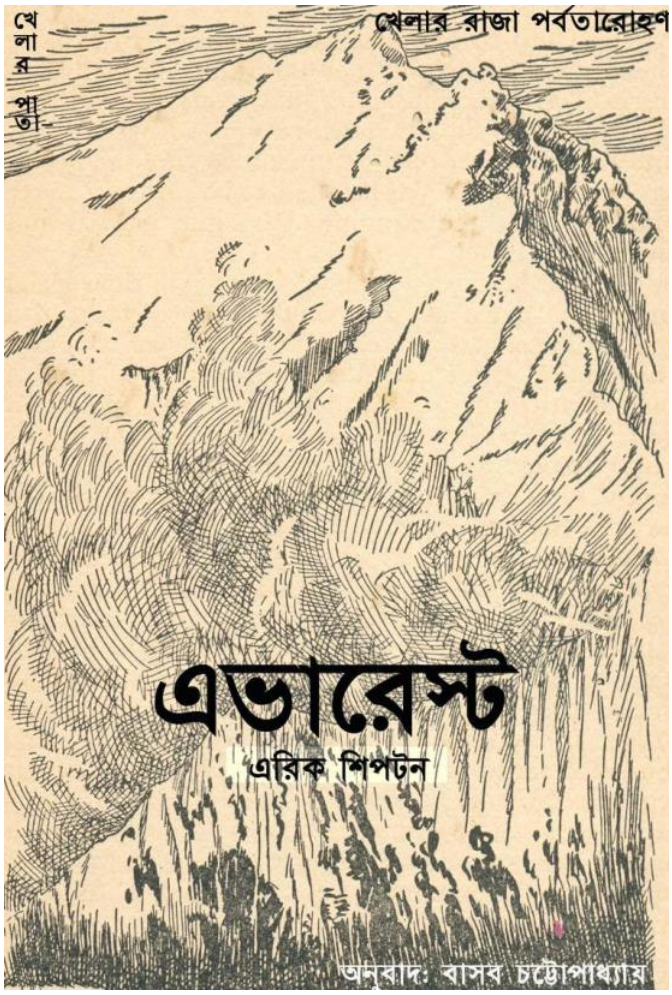

পথের সন্ধান

১৯২১ সালের মে মাসে অভিযাত্রী দল দার্জিলিঙ পৌঁছলেন। অনুসন্ধান শুরু করলেন এভারেস্টে আরোহণের প্রকৃত পথ।এই দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অভিযান শুরু হল।

অভিযানের নেতা ছিলেন কর্নেল সি.কে.হাওয়ার্ড বিউরি। যিনি তিব্বত দিয়ে অভিযানের অনুমতি আদায় করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এভারেস্ট অভিযানের অনুসন্ধিৎসু দলটিতে দক্ষ পর্বতারোহীদের মধ্যে বিজ্ঞানীরাও ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন প্রকৃতিবিজ্ঞানী এ এফ আর উলাস্টন এবং এ এম হেরন-এর মত ভূতত্ত্ববিদ। ছিলেন সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার দুই অফিসার মেজর এইচ টি মার্সহেড এবং ক্যাপ্টেন ই ও হুইলার। উপরোক্ত দুজনই ছিলেন অভিজ্ঞ পর্বতারোহী। এছাড়াও প্রধান চার অভিযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন ড: এ এম কেলাস, এইচ র‍্যাকবার্ন, জি এল ম্যালোরি ও জি বুলক।

কেলাস এবং র‍্যাকবার্নের হিমালয়ে অভিযানের প্রাক অভিজ্ঞতা থাকায় তাঁরা জানতেন অতিরিক্ত উচ্চতা মানুষের শারীরবৃত্তীয় কাজে কীভাবে প্রভাব ফেলে। শুধু তাই নয় তাঁরাই প্রথম শেরপাদের উচ্চ হিমালয়ে কাজ করবার শিক্ষা দেন। ম্যালোরি হচ্ছেন সেই সময়ের একমাত্র ব্রিটিশ অভিযাত্রী, যার অ্যালপাইন ক্লাইম্বার হিসেবে পৃথিবীতে খ্যাতি ছিল।

অভিযাত্রী দলটিকে দুটি দলে ভাগ করা হল। প্রথম এবং দ্বিতীয় দলটি যথাক্রমে ১৮ এবং ১৯ মে দার্জিলিং থেকে রওনা হল। প্রত্যেক দলে ছিল ৫০ টি খচ্চর এবং ২০ টি কুলি। যদিও এভারেস্টের দূরত্ব উত্তর-পূর্ব থেকে ১০০ মাইল। তবু এই অভিযান করতে আমাদের ৩০০ মাইল পথ অনুসরণ করতে হয়েছিল। প্রধান পর্বতমালা, যেখান থেকে এভারেস্ট অভিযান শুরু হয় সেটি তিব্বতের উত্তর-পূর্বে একটি রুক্ষ অঞ্চল। উচ্চতা ১৪০০০ ফুট। পশ্চিম দিকে ১০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে হল ঝোড়ো হাওয়ার মধ্য দিয়ে। জং থেকে বাকি ৫০ মাইল রাস্তা হেঁটে এভারেস্টের পাদদেশে পৌঁছনো হল। এই পুরো রাস্তাটা অনভিজ্ঞের কাছে খুবই কষ্টকর। কামপা জং-এ পৌঁছে অভিযাত্রীরা প্রথম বাধার সম্মুখীন হল। ড: কেলাস অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর অভিযাত্রীদের প্রথম অভিজ্ঞ সদস্যের মৃত্যু হল। স্বভাবতই দলটি এমন একজন সদস্যকে হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ল।

ম্যালোরি বলেছিলেন ড: কেলাস-এর মৃত্যুর পরের দিন যাত্রা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যে এভারেস্ট শৃঙ্গ দর্শন তাঁদের কাছে কাকতালীয় বলে মনে হল।

ম্যালোরির নিজের কথায়---

‘‘ সেদিন ভোরবেলায় আবহাওয়া ছিল একেবারে আদর্শ। ক্যাম্পের কাছেই, একটা পুরোন দুর্গের পেছন দিয়ে উঠে গেছে নিষ্প্রাণ, খাড়া ঢাল। তাই বেয়ে হাজারখানেক ফিট উঠে গিয়ে আমরা দাঁড়ালাম। পেছন ঘুরে দু চোখ ভরে প্রথমবারের জন্য তার দেখা পেলাম। পশ্চিমের আকাশে মাথা জাগিয়ে দাঁড়িয়ে দুই মহান পর্বতশৃঙ্গ-- ধূসর, কঠোর, রুদ্রতাপস মাকালু আর তার দক্ষিণে খানিক দূরে, যেন পৃথিবীর মুখ থেকে বের হয়ে আসা এক অতিকায় সাদা দাঁতের মতন মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহান এভারেস্ট।’’

কামপা জং থেকে পর্বতটি আরো ১০০ মাইল দূরে থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্যে পৌঁছতে যেন এর চেয়ে বেশি পথ অতিক্রম করতে হল। কারণ দূর থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট ঢালগুলি দৃশ্যমান হয়না। কাছে পৌঁছলে বোঝা যায় অপেক্ষাকৃত ছোট ঢালগুলোও অতিক্রম করা বেশ সময় ও কষ্টসাধ্য।

অভিযাত্রীরা পৌঁছলেন টিহরিতে। তিব্বতে ছোট পাহাড়ি গ্রামটিতে আশিটি পরিবার বাস করে। হাওয়ার্ড বিউরি কল্পনা করেন এই গ্রামই হবে অভিযাত্রীদের প্রধান দপ্তর। গ্রামে পৌঁছেই বিজ্ঞানীরা ভৌগলিক এবং ভেষজ নমুনা সংগ্রহ শুরু করল। সার্ভেয়াররাও তাঁদের জরিপের কাজ শুরু করলেন। ম্যালোরি এবং বুলক ১৬ জন কুলি এবং একজন কুলির সর্দার সাথে নিয়ে দক্ষিণের দীর্ঘ উপত্যকা পরিদর্শনে বেরোলেন অভিযানের মূল শিবির অনুসন্ধানের জন্য।

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা পৌঁছলেন রংবুক গোম্ফা যে উপত্যকায় অবস্থিত তার প্রবেশদ্বারে। এখান থেকেই আরোহীরা এভারেস্টের প্রকৃত আকৃতি দেখলেন এবং উপলবধি করলেন কত কঠিন এই শৃঙ্গারোহণ। সরলরেখায় বিস্তৃত উপত্যকার ২০ মাইল দৈর্ঘ্যের অর্ধেকই হিমবাহ আচ্ছাদিত। হিমালয়ের পাদদেশে রংবুক মনাস্টেরি থেকে রংবুক উপত্যকা প্রায় ৪০০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত উঠে গেছে। বৌদ্ধ

গোম্ফা থেকে খাড়াই এভারেস্টের পাদদেশে অবস্থিত উপত্যকাটি ১০০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত পৌঁছেছে। ম্যালোরি এবং বুলক শীর্ষে পৌঁছে দীর্ঘ উপত্যকাটির সমান্তরাল দৃশ্য দেখে অভিভূত হন। ১০,০০০ ফুট আরোহণ করে এভারেস্টের উত্তরগাত্রে দাঁড়িয়ে ম্যালোরি অভিভূত হয়ে গেলেন। বললেন, ''*দা হাইয়েস্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড'স গ্রেট মাউন্টেইনস্ , ইট সিমস্, হ্যাজ টু মেক বাট আ সিংগল জেশ্চার অব ম্যাগনিফিশেন্স টু দ্য লর্ড অব অল, ভাস্ট অ্যান্ড আনচ্যালেঞ্জড অ্যান্ড আইসোলেটেড সুপ্রিমেসি*।''

এভারেস্টের উত্তর-পশ্চিম গাত্রের ডানদিক ঢালু ও পিচ্ছিল হওয়ায়, এই দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করা খুবই কঠিন। অথচ এভারেস্টের বাম দিকের অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব গাত্র তুলনায় কম বিপজ্জনক। এই পথই ম্যালোরিকে আকৃষ্ট করল।

এভারেস্টের ছবি দেখলে বোঝা যায় এটি একটি পিরামিডাকৃতি পর্বত। যার আছে তিনটি আলাদা আলাদা গাত্র। এভারেস্টের তৃতীয় গাত্র অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্ব দিকটিতে যুক্ত হয়েছে আর একটি শৃঙ্গ যাকে বলে সাউথ পিক বা লোটসে। এই দক্ষিণ-পূর্ব গাত্র সম্পর্কে পরে আলোচনা করবো।

ম্যালোরি দক্ষিণ-পূর্ব গাত্র সমপর্কে কিছুই জানতেন না। তাঁর লক্ষ্য শুধু উত্তর-পূর্ব গাত্র দিয়ে এভারেস্ট আরোহণ। এই উত্তর-পূর্ব গাত্রের ২০ মাইল রাস্তার চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বোঝা সমভব না হলেও, এই গাত্র দিয়ে শৃঙ্গারোহণ যে তুলনামূলক সহজ তা তিনি বুঝলেন। তাছাড়া, চূড়ার পৌনে এক মাইল নীচে পাহাড়ের ধার থেকে একটা সরু গলি সোজা উত্তরমুখো গিয়েছে। প্রথমে খানিকদূর নিম্নমুখী হয়ে এগিয়ে গিয়ে তা ঢাকা পড়ে গেছে অন্যান্য পাহাড়ের আড়ালে, কিন্তু খানিক বাদে আবার সেটা ওপরমুখো হয়ে গিয়ে মিশেছে একটা শৃঙ্গে। এ শৃঙ্গটার নাম ছিল চাংসে বা নর্থ পিক।

ম্যালোরি উপলব্ধি করলেন, শৃঙ্গারোহণের আসল সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে উত্তর পূর্ব গাত্র এবং নর্থ পিকের (চাংসে) মধ্যেকার কল-টা অতিক্রম করতে পারলে, যাকে বলা হয় নর্থ কল।

তিনি এবং বুলক হিমবাহের নিকটে একটি শিবির স্থাপন করলেন। উচ্চতা ১৬৫০০ ফুট। আল্পসের উচ্চতম শৃঙ্গ মঁব্লা থেকে প্রায় ১০০০ ফুট বেশি উচ্চতায় অবস্থিত সেই শিবির ছিল সমুদ্রতল থেকে ১৬৫০০ ফিট উঁচুতে। পরদিন শুরু হল হিমবাহ বেয়ে তার মাথাটাকে ঘিরে থাকা পর্বতের দেয়ালের দিকে বেয়ে ওঠা।

এ এক অন্য হিমবাহ। পূর্বে তাঁরা যেসব হিমবাহ দেখেছেন তার সাথে এর যেন কোন সাদৃশ্য নেই। আল্পসের হিমবাহ মসৃণ এবং প্রায় ৮০ ফুট লম্বা অসংখ্য শৃঙ্গের জঙ্গল সন্নিবিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও হিমালয়ের এই হিমবাহ স্বতন্ত্র। আইসিকলস পরিবৃত এই হিমবাহের বিস্তৃতি মাইলের পর মাইল। যেন তুষারমন্ডিত এক রূপকথার দেশে এই আইসিকলস গুলি যেন একে অপরের সাথে নি:শব্দ কথোপকথনে ব্যাস্ত। কিন্তু আইসিকলস
এর গোলকধাঁধায় পথ তৈরি ভীষণ মন্থরগতিতে চলতে থাকে। চলতে যাকে হিমবাহের কিনারা দিয়ে বিপজ্জনক পথে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলা।

ধীরগতিতে হিমবাহ অতিক্রম করতে করতে তাদের শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ল। ফুরিয়ে এল শরীরের সব ক্ষমতা। একে পর্বতারোহীরা বলেন হিমবাহ অবসন্নতা। হিমবাহে যখন সূর্যালোক এসে পড়ে তখন সেই উত্তপ্ত বায়ুতে আর্দ্রতার সৃষ্টি হয়। এই আর্দ্রতাই অবসন্নতার প্রধান কারণ।

অবশেষে ১লা জুলাই ১৯২১ তাঁরা রংবুক হিমবাহের শীর্ষে পৌঁছলেন। সাথে অনুভব করলেন তাঁরা এক অসীম অববাহিকার মাঝে দন্ডায়মান। চতুর্দিকে ঘিরে থাকা বিস্তীর্ণ পর্বতশৃঙ্গের মাঝে দাঁড়িয়ে তাঁরা বিস্মিত। ম্যালোরিরা পৌঁছলেন ১৯০০০ ফুট উচ্চতায়। তারা দেখতে পেলেন নর্থ কল। নর্থ

কলটি নর্থ পিক এবং এভারেস্টের উত্তরপূর্ব গাত্রের মাঝে। কিন্তু এই দিক দিয়ে কল অতিক্রম করা সত্যই অসম্ভব ভেবে পর্বতারোহীরা হতাশ হয়ে গেলেন।

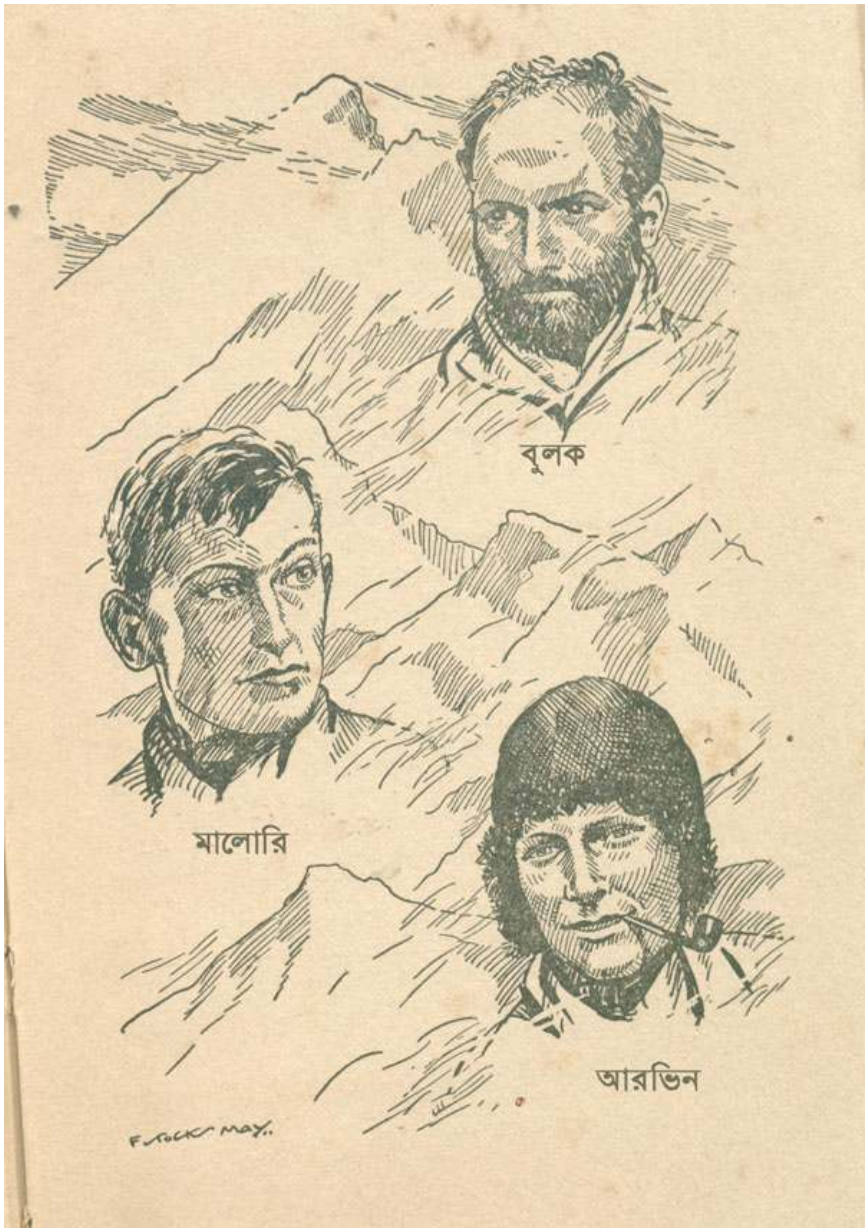

এই দুর্গম পথ অতিক্রম করতে শুধু দক্ষ পর্বতারোহীর প্রয়োজনই নয়,সাথে প্রয়োজন নর্থ কলে বড় শিবির স্থাপন। যেখান থেকে এভারেস্ট আরোহীদের সপ্তাহের পর সপ্তাহ খাদ্য এবং আরোহণের সব সরঞ্জাম সরবরাহ করা যায়। কিন্তু এখানেও প্রধান সমস্যা শেরপাদের বরফের মধ্যে দিয়ে আরোহণে অজ্ঞতা। ম্যালোরি ও বুলক বুঝলেন নর্থ কলে কোনো অদক্ষ আরোহীকে মালপত্র দিয়ে পাঠানো যাবে না। এই কঠিন রাস্তায় অবশ্যই প্রয়োজন বরফে আরোহণে স্বচ্ছন্দ মালবাহক।

এই অঞ্চল ছাড়ার আগে ম্যালোরি এবং বুলক ঘুরতে ঘুরতে নর্থ কলের পূর্ব দিকে পথের সন্ধান করতে গিয়ে একটি উপনদীর সন্ধান পেলেন। নদীটি পশ্চিম থেকে প্রবাহিত হিমবাহের সাথে যুক্ত হয়েছে। যদি পশ্চিমের এই পর্বতমালার চূড়ায় ওঠা যেত,তবে এভারেস্টের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটি হয়ত পরিষ্কার দৃশ্যমান হত। তাঁরা দুটি হিমবাহের সংযোগস্থলের নিকটে ২২,৫২০ ফিট উঁচু একটা শৃঙ্গ আরোহণ করলেন। এখানে পৌঁছে আরোহীদের ঐ অঞ্চল সমপর্কে ভৌগলিক ধারণা তৈরি হল। আরোহীরা হিমবাহের অন্দরে প্রবেশ করলেন এবং আবিষ্কার করলেন পশ্চিম রংবুক হিমবাহ। ১৯জুলাই তাঁরা দুটি নদীর অববাহিকার মাঝে পৌঁছলেন। ম্যালোরি বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন, ‘‘এ এক অপরূপ

স্বর্গীয় সৌন্দর্য। পায়ের তলার মাটি যেন প্রবল বেগে অতলস্পর্শ গভীরতায় প্রায় ৩০০০ ফুট নীচে নেমে এলো।''

দেখলেন অন্য এক হিমবাহ। দক্ষিণমুখী এই হিমবাহ নেপালের অরণ্য উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্যদিকে আছে একটি বিশালাকৃতি ফাটল,নিকটেই ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে একটি ২৫০০০ ফুট উঁচু বরফের দেওয়াল। দেওয়ালে অসংখ্য ভাস্কর্যের চিহ্ন যেন কোনো মগ্ন শিল্পীর নিপুণ স্পর্শের প্রমাণ দেয়। এই দেওয়ালটি এভারেস্ট শৃঙ্গকে একটি সংকীর্ণ গভীর উপত্যকার সাহায্যে পৃথক করেছিল। ম্যালোরি যার নাম রেখেছিলেন ওয়েস্ট সি ডবলু এম।

যেখানটাতে তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে ম্যালোরি আর বুলক এভারেস্টকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। কেবল নজরে আসছিলো একটা সরু প্রবেশপথ, আর তা দিয়ে বাইরের দিকে উপচে বেরিয়ে আসা বরফের রাশি।

ম্যালোরি বুঝলেন ,ভয়ংকর খাড়াই পর্বতগাত্রের জন্যে এই দিক দিয়ে এভারেস্টের রাস্তা খুঁজে পাওয়ার সমভাবনা ক্ষীণ। তাছাড়া , অববাহিকার একেবারে এক প্রান্তে যেখানটা তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, তার ঠিক পায়ের নীচে ছড়িয়ে থাকা সুবিশাল একটা খাদ, তাঁদের সেই প্রবেশপথে পৌঁছোবার পথে মূর্তিমান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

নর্থ কলের পূর্ব দিয়ে এভারেস্টের রাস্তা খুঁজে পাওয়াই আসল সমস্যা। সেই সমস্যার সমাধান অর্থাৎ ঐ দিক দিয়ে রাস্তা অন্বেষণই অভিযাত্রীদের প্রধান এবং একমাত্র কাজ হয়ে উঠল।

ক্রমশ

ছবি: মূল বই থেকে

টাইম মেশিনে চড়ে আমরা ঢুকে পড়েছি ঊনিশ শতকের মধ্যভারতে ঠগীদের দেশে। সেখানে আমীর খান নামে একটা ছেলের বাবামাকে মেরে ঠগীরা তাকে লুঠে নিয়ে গিয়েছে। ঠগী দলপতি ইসমাইলের ঘরে বড় হয়ে উঠে এইবারে সে নিজে ঠগীধর্মে দীক্ষা পেতে চলেছে। তারপর----

মিডোজ টেইলরের 'কনফেশনস অব আ ঠাগ' অবলম্বনে:--

বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ের পরদিন আমি ইসমাইলের সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে ঘোড়ার পিঠে রওনা হলাম। দিনচারেক পরে পৌঁছে গেলাম শেওপুরে। এইখানেই ঠগীদের গোটা দলবলের সঙ্গে আমার আলাপ হবার কথা। আমার মনে মনে তাই তখন বেজায় উত্তেজনা। উঠলাম এসে মোইন সাহেবের বাড়িতে। সেখানে তখন আরো কয়েকজন ঠগী জেমাদার এসে জড়ো হয়েছে। পরদিন ঠগীদের সভায় গিয়ে দেখা গেল আমার বাঘ মারবার কীর্তির কথা ততদিনে এদিকেও ছড়িয়ে পড়েছে। লোকজন আমাকে বেশ সম্মান করে কথা বলছিল। আর আমার পালক পিতা ইসমাইলকে এরা সবাই যেমন সম্মান করে তাতে বুঝে গেলাম, সে সমস্ত দলটারই নেতা।

দিনদুয়েক পরে ভবানীর পুজো উপলক্ষে দশহরার উৎসব। অতএব সভায় ঠিক করা হল, ওইদিনেই আমায় ঠগীর দলে দীক্ষা দেয়া হবে। আমি অবাক হয়ে বাবাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ভবানী তো হিন্দুদের দেবতা। তাহলে আমরা মুসলমানরা কেন----

বাবা বলল, 'সে আমি ঠিক বলতে পারব না। তবে আমাদের ঠগীদের ধর্মটাও তো হিন্দুদের তৈরি! ওদের কাছেই ঠগীর পেশার কায়দাকানুন আমাদের প্রথম শেখা। তাছাড়া মা ভবানী খুব জাগ্রত দেবী। ঠগীদের ভালোমন্দ সবকিছুর খেয়াল রাখেন।'

'ঠগীধর্ম কী করে পৃথিবীতে এলো?'

'বলছি। মন দিয়ে শোন। পৃথিবীতে গোড়ায় ছিল দুজন দেবতা। একজন সবকিছু গড়তো আর অন্যজন ছিল মৃত্যুর দেবতা। সৃষ্টির দেবতা এত তাড়াতাড়ি মানুষ সৃষ্টি করছিলেন যে ধ্বংসের দেবতা তার সঙ্গে তাল রেখে ধ্বংস করতে পারছিলেন না। শেষে ধ্বংসের দেবতার স্ত্রী ভবানী বা কালী তৈরি করলেন ঠগীদের। তারপর তাদের হাতে ধরে শেখালেন কেমন করে শ্বাস বন্ধ করে মানুষদের মারতে হয়। তাদের আদেশ দিলেন মানুষদের মেরে ফেলে রেখে অন্য জায়গায় চলে যেতে। তিনি নিজে তাদের শরীরগুলোর গতি করবেন। সেই আইন মেনে চললে কোনদিন মানুষের তৈরি কোন আইন তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এই নিয়ম মেনে ভালোই ছিল ঠগীরা। কিন্তু একবার কয়েকজন ঠগী করলো কি, মানুষ শিকার করে তারপর সেইখানেই লুকিয়ে রইল, ভবানী কী করে তাদের গতি করেন তাই দেখতে। কিন্তু দেবতার চোখ এড়াবে কী করে তারা? ভবানী সব টের পেয়ে গিয়ে তাদের ডাকলেন। তারা ভয়ে ভয়ে ভবানীর সামনে যেতে তিনি বললেন, 'এই যে তোমরা আমায় দেখলে, আমার আদেশ

অমান্য করলে এতে তোমাদের ভয়ানক পাপ হয়েছে। এর পর থেকে আমি আর তোমাদের রক্ষা করব না। তোমাদের শিকারদের দেহের গতি তোমাদেরই করতে হবে। আমি শুধু তোমাদের নানা সংকেত দেখিয়ে সৌভাগ্যের বা বিপদের আভাসটুকু দেবো। তাতে তোমরা নিজেদের চেষ্টায় শিকার করতে কিংবা শত্রুদের হাত থেকে বাঁচতে পারলে বাঁচবে, নয়তো ধরা পড়ে শাস্তি পাবে। আজ থেকে এই হবে তোমাদের অবাধ্যতার শাস্তি।' সেই থেকে আমরা ঠগীরা ভবানীর দেয়া ভালো বা মন্দের সংকেত মেনে শিকার ধরি। আমাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দু-ই আছে। যে যার ধর্ম মেনে চলি। কিন্তু আমরা সবাই ভবানীর সন্তান। এই হল ঠগীদের গল্প।'

দশহরার দিন সকালবেলা আমার ঠগীধর্মে দীক্ষা হলো। সকাল সকাল স্নান করে নতুন কোড়া কাপড় পরে বাবার হাত ধরে আমি একটা ঘরে এলাম। সেখানে দলের অন্যান্য নেতারা একটা পরিষ্কার সাদা কাপড় পেতে তার ওপরে বসে ছিল। সবার সামনে দাঁড়িয়ে বাবা প্রশ্ন করল, 'আমার ছেলেকে ঠগীধর্মে দীক্ষা দিতে ইচ্ছা করি। আপনারা তাতে রাজি কি?'

উত্তরে সমস্বরে সবাই বলে উঠল, 'রাজি।'

তখন সকলে মিলে আমাকে খোলা আকাশের নিচে নিয়ে গেল। বাবা আকাশের দিকে মুখ তুলে বলে উঠল, 'হে মা ভবানী, তোমার এই নতুন সেবককে তোমার পায়ে সমর্পণ করলাম। তাকে যদি তুমি গ্রহণ করো তাহলে সংকেত দেখাও মা!'

এর পর খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। একটু বাদে একটা পেঁচার ডাক শোনা গেল একটা গাছের মাথা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে গোটা দলটা একসঙ্গে 'জয় ভবানী' বলে চিৎকার করে উঠলো। বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'দীক্ষা পুরো হয়েছে তোর। ভবানী তোকে কৃপা করেছেন। দিনের বেলা পেঁচার ডাক! এর চেয়ে শুভ কোন সংকেত আর হয় না।'

এবারে ফের মিছিল করে ঘরের ভেতর ফিরে গেলাম আমরা। আমার ডান হাতে একটা সাদা রুমাল পেতে তার ওপরে ধরিয়ে দেয়া হল ঠগীদের পবিত্র চিহ্ন, একটা গাঁইতি। সেটাকে বুকের কাছে তুলে ধরে ঠগীধর্মের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে একটা ভয়ানক শপথবাক্য পাঠ করলাম আমি। তারপর পবিত্র কোরাণ ছুঁয়ে ফের সেই শপথটা পড়লাম।

শপথবাক্য পড়া শেষ হলে আমার হাতে তুলে দেয়া হল একদলা প্রসাদি গুড়। সেটা মুখে পুরতেই শেষ হল আমার ঠগীধর্মে দীক্ষা। বাবা তখন আমার দিকে ফিরে বলল, 'আজ থেকে পৃথিবীর প্রাচীনতম পেশায় তুমি যুক্ত হলে। হঠাৎ এসে পড়া অথবা নিজের কৌশলে জোটানো যে কোন মানুষ তোমার বধ্য হবে। তবে কিছু শ্রেণীর মানুষের বলি ভবানী গ্রহন করেন না। তারা তোমার শিকার হবে না কখনো। এরা হল ধোপা, ভাট, শিখ, নানকশাহী, মাদারি ফকির, নাটুয়া, ভাঙ্গী, তিলি, কামার, ছুতোর। এইবারে তোমার দীক্ষা শেষ হল। এরপর তোমার প্রয়োজনীয় শিক্ষার ভার নেবেন অন্যান্যরা।'

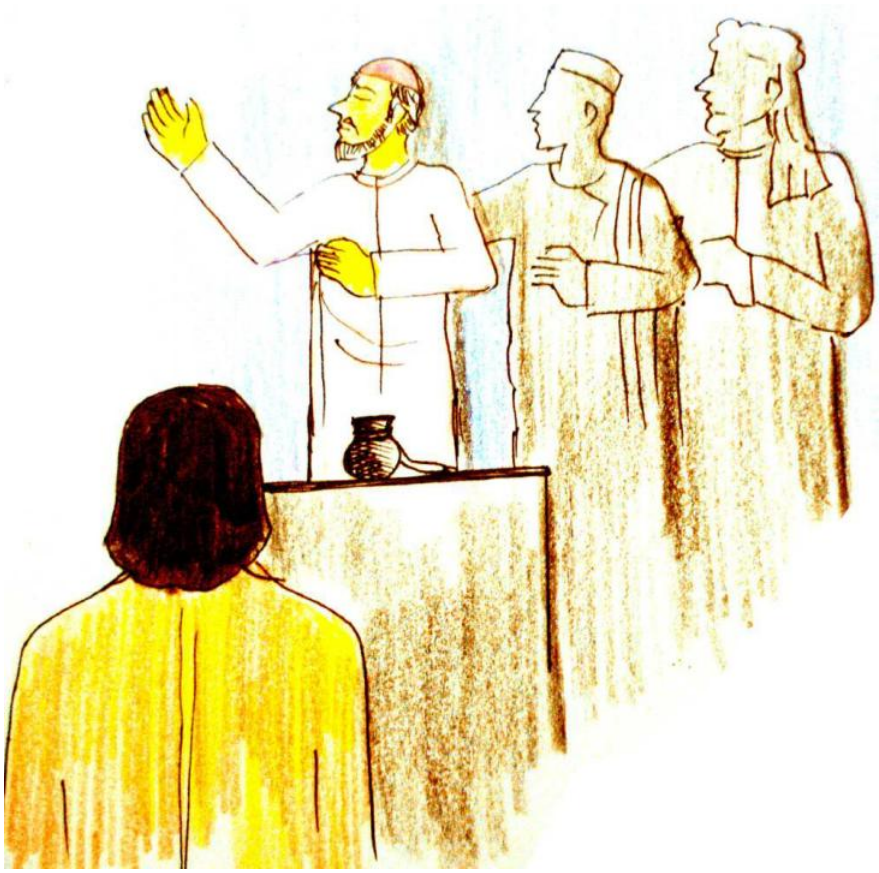

বর্ষার লম্বা সময়ের বিরতির পর শরত এলে ভারতবর্ষের রাস্তায় রাস্তায় মানুষের যাতায়াত ফের বেড়ে ওঠে। ব্যবসাবাণিজ্যও বাড়ে। পণ্য ও টাকাপয়সার আদানপ্রদান চলে দেশের নানান জায়গার মধ্যে। ঠগীরাও এই সময়টাকে তাই বেছে নেয় তাদের শিকার অভিযানের জন্য। সেই উপলক্ষ্যেই সে বারে দশহরার সময় শেওপুরে ঠগীরা এসে জড়ো হয়েছিলো। দীক্ষার পরদিন ঠগীদের নেতারা একত্রে আলোচনায় বসল। ঠিক হল বাবা, হুসেন আর ঘাউস খানের নেতৃত্বে বিরাট একটা দল রওনা হবে দক্ষিণের পথে। নাগপুর পৌঁছে বাবা ষাট জনের একটা দল নিয়ে যাবেন হায়দরাবাদ অবধি। পঁয়তাল্লিশজন ঠগী নিয়ে গড়া দ্বিতীয় দলটা ঔরঙ্গাবাদ হয়ে খান্দেশ, বুরহানপুর হয়ে ইন্দোর অবধি যাবে, তারপর ফের ফিরে আসবে শেওপুরে। ত্রিশজন ঠগীর তিন নম্বর দলও ঔরঙ্গাবাদ অবধি

এগোবে, কিন্তু তারপর রাস্তা বদলে চলে যাবে পুনার দিকে। পরের বছর বর্ষা শুরুর আগে তিনটে দল ফের এসে মিলিত হবে শেওপুরে।

দক্ষিণ অভিযানের এই পরিকল্পনাটা ইসমাইলের করা। দলের সকলেই তাতে মহা উৎসাহে সায় দিল। কারণ দক্ষিণের দিকে বহুকাল কোন বড় অভিযান হয় নি। দিনকয়েক প্রস্তুতির পরে আমরা রওনা হবার জন্য তৈরি হলাম।

তবে রওনা হবার আগে ভবানীর সংকেত জানবার দরকার ছিলো। কেমন চলবে আমাদের আগামি অভিযান, ভালো শিকার পাওয়া যাবে কিনা, কোন বিপদ হবে কিনা সেই সবই জানা যাবে ভবানীর সংকেত থেকে।

রওনা হবার দিন সকালে রাস্তার ওপরে আগে থেকে ঠিক করে রাখা একটা জায়গায় গোটা দলটা একত্র হল। দলের পণ্ডিত বদ্রীনাথ কাঁধে পবিত্র গাঁইতি নিয়ে আগে আগে চলছিল। তার ঠিক পেছনে ছিল বাবা আর তার সঙ্গী দুই জেমাদার হুসেন ও ঘাউস খান। একটা জলভরা ঘটির গলায় দড়ি বেঁধে, দড়িটা দাঁতে কামড়ে ধরে মুখের ডানদিক দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিল বাবা। লোটা পড়ে গেলে বুঝতে হবে অভিযানে ভয়ানক বিপদ আসছে। আর সে বিপদে লোটাধারীর মৃত্যু অনিবার্য। অতএব লোটা মুখে বাবা পাফেলছিল খুব সাবধানে। ফলে তার পেছন পেছন এগোতে থাকা গোটা দলটাই খুব আস্তে আস্তে এগোচ্ছিলো। খানিক বাদে আগে থেকে ঠিক করে রাখা একটা পুজাস্থলে পৌঁছে ঘটিটা নামিয়ে রাখল বাবা। তারপর দক্ষিণের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বুকে বাঁ হাত রেখে ওপরের দিকে মুখ করে চিৎ কার করে বলল, 'হে বিশ্বমাতা। আমাদের রক্ষাকর্ত্রী। আমাদের কৃপা করো। দেখাও তোমার শুভ সংকেত------'

বাবার কথা শেষ হতে গোটা দলটাও আকাশের দিকে মুখ তুলে সেই একই প্রার্থনা জানাল। তারপর সবাই অপেক্ষা করতে লাগল কখন ভবানীর সংকেত আসে।

খানিক বাদে পিলাহু, মানে বাঁদিকের সংকেত শোনা গেল। একটা গাধার ডাক। প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই ডান দিকের সংকেত বা তিলাহু ভেসে এলো-- অন্য একটা গাধার ডাক। গাধার ডাক বড় পবিত্র সংকেত। বহু বছরের মধ্যে এমন শুভ সংকেত পাওয়া যায়নি ভবানীর কাছ থেকে। গোটা দলটাই আনন্দে গর্জন করে উঠল একবার। এর পর প্রয় ঘন্টা সাতেক ধরে যাত্রার শেষ প্রস্তুতি চলল আমাদের। গোটা সময়টাই বাবা সেই জায়গাটায় ঠায় বসেছিলো। সব তৈরি হয়ে গেলে আমরা গনেশপুরের পথে চললাম।

ক্রমশ

ছবি:মৌসুমী

অব্যক্ত

মহাশ্বেতা

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর নাম নিশ্চয় তোমরা সবাই শুনেছো। ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের নামের যদি একটা লিস্ট বানানো যায়, তবে জগদীশচন্দ্রের নাম আসবে তার একদম শুরুর দিকে। কিন্তু দু:খের বিষয় এই যে, ওরকম কৃতী হওয়া সত্বেও য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের তুলনায় খ্যাতি বা সম্মান তিনি খুব কমই পেয়েছে। বেতার যন্ত্র, কিম্বা রেডিওর আবিষ্কারক হিসেবে পৃথিবীর লোক চেনে ফরাসি বিজ্ঞানী মার্কনিকেই। কিন্তু তাঁর অনেক আগে সেই যন্ত্র টি যে জগদীশ বসু বানিয়ে ফেলেছিলেন, তার খবর রাখে না বিশেষ কেউ। শুধু বেতার যন্ত্রই নয়, আরও বেশ কিছু যুগান্তকারী আবিষ্কারও করেছিলেন এই বিজ্ঞানী। গাছের যে জীবন আছে, তারা যে আসলে আমাদের মতোই জীবিত, সেটা তিনিই প্রথম নিজের বানানো কিছু যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রমাণ করেছিলেন।

এবার যে বইটার কথা বলব, সেটা জগদীশচন্দ্র বসুর লেখা। বইটার নাম অব্যক্ত। ছোট্ট সবুজ বই। 'অব্যক্ত' জগদীশ বোসের লেখা বেশ কিছু প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলো বেশির ভাগই বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে লেখা। বিজ্ঞানের কঠিন, জটিল বেশ কিছু তত্ত্বকে অত্যন্ত সহজ ও সুন্দর করে বোঝানোয় এনার কোন তুলনা নেই। শুধু বিজ্ঞানই নয়, অন্য অনেক বিষয় নিয়েও বেশ কিছু প্রবন্ধ আছে সংকলনটিতে। পাশাপাশি রয়েছে অদৃশ্য আলোকের চরিত্রের বর্ণনা আর ইংরেজদের বিরুদ্ধে কলুঙ্গা দুর্গের বীর বাসিন্দাদের যুদ্ধের গল্প। জগদীশ বসু আদতে বিজ্ঞানী হলেও তাঁর ভাষাটি কিন্তু একজন সাহিত্যিকের। শুরুতে তাঁর লেখার ধরনটা হয়তো একটু খটোমটো লাগতে পারে পড়ুয়াদের, কিন্তু একবার ভালো করে পড়তে শুরু করলে থামা মুশকিল।

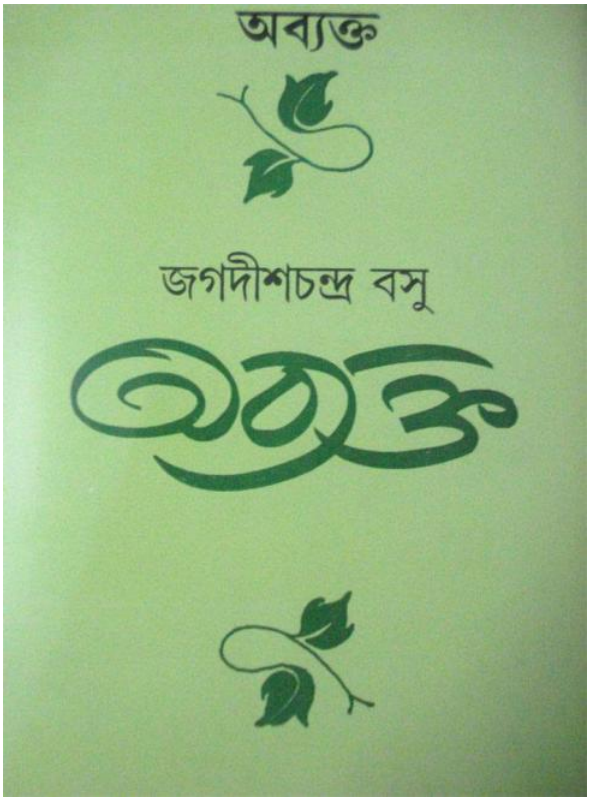

কে তাঁকে বিজ্ঞানের জগতে এই সব আলোড়ন সৃষ্টিকারী আবিষ্কার করতে অনুপ্রেরিত করেছিল, তার উত্তর তিনি দেন সংকলনটির শেষ প্রবন্ধ 'হাজির!'-এ। প্রবন্ধটির একটা ছোট্ট অংশ এখানে দিচ্ছি:

'কোনোদিনও লিখিতে পারি নাই, কিন্তু ভিতর হইতে কে আমাকে লিখাইতে আরমভ করিল। তাহারই আজ্ঞাতে 'আকাশ স্পন্দন ও অদৃশ্য আলোক' বিষয় লিখিলাম; পরে লিখাইল, 'উদ্ভিদ-জীবন মানবীয় জীবনেরই ছায়ামাত্র'। পূর্বে জীবন সম্বন্ধে বেশি কিছু জানিতাম না। কাহার আদেশে এরূপ লিখিলাম? লিখিয়াও নিষ্কৃতি পাইলাম না; ভিতর হইতে কে সমালোচক সাজিয়া বলিতে লাগিল- 'এত যে কথা রচনা করিলে,

পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ কি- ইহার কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা?' জবাব দিলাম, 'যেসব বিষয় অনুসন্ধান করিতে গিয়া বড় বড় পণ্ডিতেরা পরাস্ত হইয়াছেন, আমি সে সব কি করিয়া নির্ণয় করিব? তাহাদের অসংখ্য কল-কারখানা ও পরীক্ষাগার আছে এখানে তাহার কিছুই নাই, অসমভবকে কি করিয়া সমভব করিব?' ইহাতেও সমালোচকের কথা থামিল না। অগত্যা ছুতার কামার দিয়া তিন মাসের মধ্যে একটা কল প্রস্তুত করিলাম। তাহা দিয়া যেসব অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল তাহা আমার কথা দুরে থাকুক, বিদেশী বৈজ্ঞানিকদিগকে পর্যন্ত বিস্মিত করিল।'

এটুকু পড়েই হয়তো বুঝতে পারছো বাকি বইটা আরও কতটা সুন্দর হবে। অতএব দেরি না করে বইটা কিনে, কিংবা ধার করে পড়ে ফেল। আর জয়ঢাককে জানিও কেমন লাগলো।

বই - অব্যক্ত

প্রকাশনী - দে'জ পাবলিশিং

দাম - ৬৫ টাকা

লোককথা

গুজব ছড়ায় কেমন করে

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

এক পণ্ডিত একদিন মাঠ পেরিয়ে আল ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ তার মনে হল, মুখের মধ্যে কী যেন একটা রোয়েছে। থু থু করে সেটাকে ফেলতে দেখে সেটা একটা পাখির পালক। তা মুখের মধ্যে হঠৎ করে বলা নেই কওয়া নেই পাখির পালক এলো কোথা থেকে? ভেবে ভেবে কুল পায়না পণ্ডিত।

বাড়ি এসে বউকে সব কথা খুলে বলে পণ্ডিত বলল, ‘এসব কথা আবার পাঁচজনকে ফলাও করে বলতে যেওনা যেন। শুনতে পেলে কে জানে লোকে কী উল্টোপাল্টা ভেবে বসবে!’

এদিকে এমন একটা অবাক কাণ্ড ঘটে গেল কিন্তু সে কথা কাউকে ফলাও করে বলতে না পেরে পণ্ডিতের বউয়ের তো পেট ফুলতে শুরু করেছে। না পারতে শেষে পাশের বাড়ির বউকে গিয়ে বলে, ‘দিদি , দিব্যি গেলে বলো যদি কাউকে কিছু বলবে না তাহলে তোমায় এক আশ্চর্যি কথা বলতে পারি।‘

পাশের বাড়ির বউ বলল, ‘বলো , বলো , কাউকে বলব না দিব্যি করলাম।’

তখন তো পণ্ডিতের বউ হড়বড় করে সব কথা বলে ফেললো। তবে মুশকিল হল, বরের মুখ থেকে একখানা পালক বেরিয়েছে বলতে গিয়ে সে বলে ফেলেছে কয়েকটা পালক। পাশের বাড়ির বউ তো সেই শুনে একেবারে অবাক। খানিক পরে ঢোঁক টোক গিলে বলে, ‘ভয় পাস না বোন। ওতে কিছু হবে না। কয়েকটা পালক বই তো আর কিছু নয়!’

‘কি জানি দিদি। ভয় তো লাগেই! তবে তুমি কিন্তু আর কাউকে এসব কিছু বোলোনা। দিব্যি গেলেছো মনে থাকে যেন।’

‘আমায় কি তুই তেমন মুখ পাতলা ভেবেছিস? এই যে ঠোঁটে কুলুপ আঁটলাম। কাউকে যদি কিছু বলেছি!’

কিন্তু এমন একটা খবর কাউকে না বলে কতক্ষণ আর থাকা যায়। পাশের বাড়ির বউয়ের পেটও ফুলতে শুরু করল একটুক্ষণের ভেতরে। খানিক বাদে রাস্তা দিয়ে ধোবার বউকে যেতে দেখে তাকে ডেকে সে তাড়াতাড়ি গল্পটা বলেই ফেললো। তবে কিনা বলতে গিয়ে ক’খানা পালকের বদলে ভুল করে বলল, নাকি একখানা গোটা বক বেরিয়েছে পণ্ডিতের মুখ থেকে।

শুনে ধোবানি অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে বলে, ‘ও মা! বলো কী গো? আমি তো জানতাম পণ্ডিতমশাই নিরিমিষ টিরিমিষ খান। মাছ মাংস ছোঁয় বলে তো কখনো ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি! ও বউ ,এ যে ঘোর কলিকাল! কার মনে যে কী আছে----’

যাবার আগে ধোবানীও অনেক দিব্যিটিব্যি গেলে গিয়েছিলো যে সে নাকি কাউকে বলবে না। তবে প্রতিজ্ঞা তার বেশিক্ষণ টিঁকল না। পথে তার এক সইয়ের সঙ্গে দেখা হতে গল্পটা যেন নিজেনিজেই তার গলা দিয়ে উঠে এলো। তবে কিনা উত্তেজনার বশে একটা বকের বদলে সে শুধু বলে ফেলেছিলো ক’টা বক।

ধোবানির সই যখন ঘরে এসে তার বরকে গল্পটা বলল, ততক্ষণে সেই ‘‘ক’টা বক’’ হয়ে গিয়েছে একঝাঁক বক।

এমনি করে আর কয়েক মুখ ঘুরতেইও শোনা যেতে লাগলো পণ্ডিতের মুখ থেকে নাকি জঙ্গলের ছোটবড় সব কিসিমের পাখি হাজারে হাজারে বের হয়ে চলেছে। সন্ধে হবার আগেই দেখা গেল গোটা গ্রাম এসে ভেঙে পড়েছে পণ্ডিতের উঠোনে। তারা সবাই পণ্ডিতের মুখ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি বের হওয়া দেখতে চায়। পণ্ডিত যত বলে আরে আমার মুখ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে দূরে থাক একখানা পাখিও বের হয়নি কোনদিন, তত লোকে মিনতি করে বলে, ‘একটিবার কেরামতিটা আমাদেরও দেখিয়ে দাও না দাদা!’

শেষমেষ লোকজন যখন রেগে উঠে পণ্ডিতকে পেটাবার তাল করেছে তখন পণ্ডিতের মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। সে উঠোনে বের হয়ে এসে সবাইকে বলল, ‘‘পাখি বের করা দেখবে? তাহলে সবাই চুপটি করে এইখানে বোসো, আমি ঘরে গিয়ে মন্ত্রটা বলে আসি।’’

সেই শুনে যেই না গ্রামের লোকজন উঠোনে চুপটি করে বসেছে, ওমনি পণ্ডিতও ঘরে ঢুকে পেছনের দরজা দিয়ে চুপি চুপি বের হয়ে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়েছে।

মাসখানেক এইভাবে লুকিয়ে থাকবার পর অবশেষে লোকজন ঠাণ্ডা হলে তবে পণ্ডিত আবার বাড়ি ফিরতে পেরেছিলো।

বাংলার উপকথা

ছবি: মৌসুমী

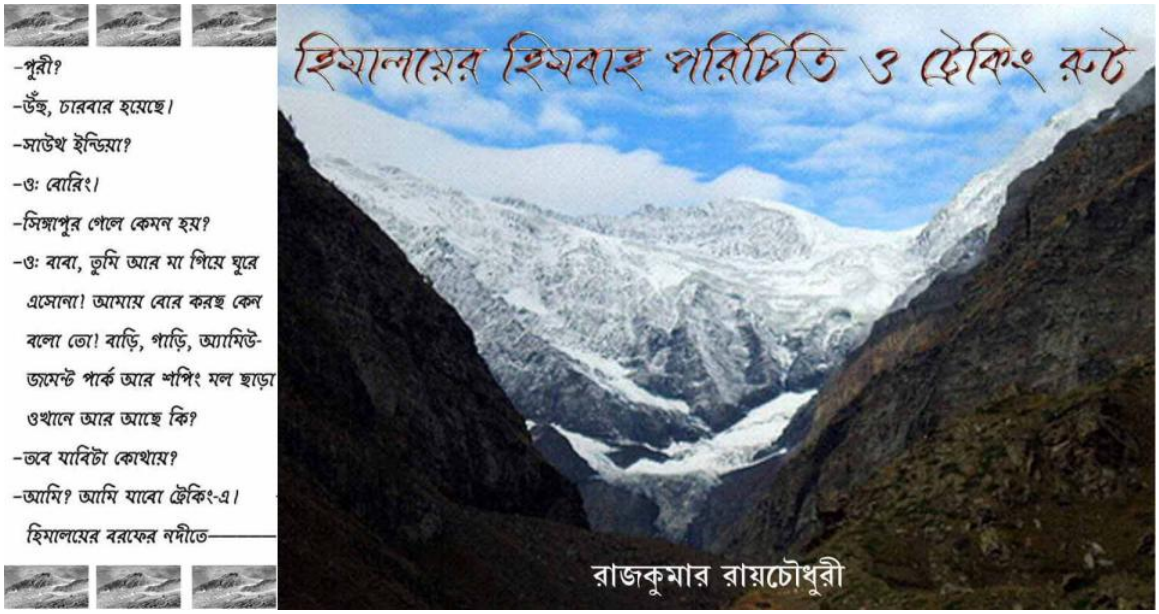

যমুনোত্রী, সপ্তর্ষিকুন্ড ও যমুনা গিরিখাত

যমুনোত্রী হিমবাহের নামকরণ যমুনার উৎস হিসাবে হলেও যমুনার আসল উৎস হল সপ্তর্ষিকুন্ড। যমুনোত্রী হিমবাহ যমুনোত্রীর উপরেই অবস্থিত। কিন্তু এই হিমবাহের পথ অত্যন্ত দূর্গম ও বিপজ্জনক বলে তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণার্থীরা যমুনোত্রী মন্দির দর্শন করেই সন্তুষ্ট থাকেন। সপ্তর্ষিকুন্ড একটি গ্লেসিয়াল হ্রদ। এটি ৪৪২১ মি উচ্চে কালিন্দী পর্বতের উপর অবস্থিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বহু যুগ আগে প্লিস্টোসিন যুগে অর্থাৎ কয়েক লক্ষ বছর আগে যমুনোত্রীর গতিপথ ছিল ভিন্ন। এটি ছিল সিন্ধুনদের শাখানদী। টেক্টনিক ভূ-সঞ্চালনের ফলে এর গতিপথ পরিবর্তিত হয় এবং আরাবল্লী পর্বত যমুনোত্রী কে বেঁধে ফেলে।

ট্রেকিং রুট - বেস ক্যাম্প: হনুমান চটি

	উচ্চতা (মি)	দূরত্ব (কিমি)	রাস্তা
হৃষিকেশ - হনুমান চটি		২২২ কিমি	বাস / জিপ
হনুমান চটি - জানকী চটি		৮ কিমি	বাস / জিপ
জানকী চটি - যমুনোত্রী	৩২৯৩ মি	৬ কিমি	হাঁটা
যমুনোত্রী - সপ্তর্ষিকুন্ড	৪৪২১ মি	১০ কিমি	হাঁটা
যমুনোত্রী - যমুনোত্রী গিরিখাত	৪৫০০ মি	১২ কিমি	হাঁটা
যমুনোত্রী গিরিখাত - কিয়ার কোটি		১০ কিমি	হাঁটা
কিয়ার কোটি - রুইসারা হ্রদ	৩৫০০ মি	৯ কিমি	হাঁটা
রুইসারা - ওসলা	২৫৫৯ মি	১৩ কিমি	হাঁটা

ওসলা থেকে হর-কি-দুন হয়ে ফের ওসলা নেমে তালুকা নৈটায়ার হয়ে দেরাদুন ফিরুন।

যাঁরা গঙ্গোত্রী দেখে ফিরছেন তাঁরা উত্তরকাশী থেকে বারকোট হয়ে যমুনোত্রী যেতে পারেন। জানকি চটি অবধি বাস বা জিপ চলে যাচ্ছে। সেখান থেকে একদিনে যমুনোত্রী যাওয়া যায়। যাঁরা শুধু যমুনোত্রীতে যাবেন তাঁরা যমুনোত্রী দেখে জানকী চটিতে থাকতে পারেন। যমুনোত্রী তে উষ্ণকুন্ড আছে, জানকী চটিতে একটি ছোট উষ্ণকুন্ড আছে, স্নান করার পক্ষে আদর্শ।

নন্দাদেবী হিমবাহঃ-

নন্দাদেবী স্যাংচুয়ারীতে দুটি বিখ্যাত হিমবাহ হল নন্দাদেবী নর্থ ও নন্দাদেবী সাউথ। এদের দুটিরই দৈর্ঘ্য প্রায় ১৯ কিমি। হিমবাহ দুটি ঋষিগঙ্গার catchment অঞ্চলে অবস্থিত। ঐ অঞ্চলের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য হিমবাহ হল ত্রিশূল হিমবাহ, কুরুমতোলী হিমবাহ, বারতোলী হিমবাহ, রামালী হিমবাহ, ইত্যাদি।

ট্রেকিং রুট - বেস ক্যাম্পঃ লতা

	উচ্চতা (মি)	দূরত্ব (কিমি)	রাস্তা
যোশী মঠ - লতা	২৩১৭ মি	২৫ কিমি	বাস
লতা - লতা খড়ক	৩৬৮৯ মি	১০ কিমি	হাঁটা
লতা খড়ক - ধারানসি	৪২৫২ মি	৭ কিমি	হাঁটা
ধারানসি - দেব্রুঘেটা	৩৫০০ মি	৪ কিমি	হাঁটা
দেব্রুঘেটা - দেওদি	৩৩৫৪ মি	৬ কিমি	হাঁটা
দেওদি - ভোজঘেড়া	৪০৫০ মি	৫ কিমি	হাঁটা
ভোজঘেড়া - তিলচুনি	৪২০০ মি	৪ কিমি	হাঁটা
তিলচুনি - নন্দাদেবী বেস ক্যাম্প	৪৫০০ মি	৬ কিমি	হাঁটা

নন্দাদেবী স্যাংচুয়ারিতে আসেননি এমন নামকরা পর্বতারোহীর সংখ্যা কম। যদিও রাস্তা দূর্গম কিন্তু এর অনুপম সৌন্দর্য ও বন্যপ্রাণী স্যাংচুয়াবির আকর্ষণে ছুটে আসেন পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে পর্বতারোহী ও ট্রেকাররা।

হৃষীকেশ থেকে যোশীমঠ বাসে আসুন। যোশীমঠ থেকে লতা সড়ক পথে ২৫ কিমি। বাসে বা জিপে আসুন। লতা গ্রাম থেকে হাঁটা শুরু। লতা থেকে লতা খড়ক এর রাস্তা বেশ চড়াই, তবে পথে যেতে যেতে রন্টি, নন্দাদেবী, নন্দাঘুন্টি ও বেথারতলির সৌন্দর্য্য পথের ক্লান্তি বিস্মরণে সাহায্য করবে। লতাখড়ক চওড়া ঘাসে ছাওয়া গিরিশিরা। এখানে যেমন প্রবল বাতাস পাবেন তেমনই ঠান্ডাও। এখান থেকে ত্রিশূল ও বেথারতলি (Bethartoli) শৃঙ্গের দৃশ্য ট্রেকারদের মুগ্ধ করবে। এরপর চড়াই ভেঙে আসুন ধারানসিতে। ধারানসি গিরিপথ অতিক্রম করার সময় প্রথমে দেখা মিলবে দুনাগিরির (৭০৬৮ মি) পরে দেখা দেবেন নন্দাদেবী (৭৮১৮ মি)। সিকিম বাদ দিলে বাকি ভারতের উচ্চতম শৃঙ্গ এটি। ধারানসির পরে পৌঁছন দেব্রুঘেটা। এখানে নদীর ধারে ক্যাম্প করুন। এর পরের দিন ঋষিগঙ্গা অতিক্রম করে পৌঁছন তিলচুনিতে। তিলচুনি থেকে নন্দাদেবী বেস ক্যাম্প ৬ কিমি রাস্তা। এ পথে আসার জন্যে বিশেষ অনুমতি সংগ্রহ করতে হবে, প্রশাসন ও বনদপ্তর থেকে। জীব বৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য ভারত সরকার এই স্যাংচুয়রিতে ঢোকা নিষিদ্ধ করেছেন।

যোশীমঠ-গোবিন্দঘাট

বিশালী হিমবাহ ও কেলিয়ন হিমবাহ :

মদমহেশ্বর উপত্যকা থেকে মন্দাকিনী উপত্যকার পথে পড়বে এই দুটি অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত হিমবাহ। পথ বেশ দূর্গম। বিশালী ও কেলিয়নের মাঝে আছে বিশাল তুষার প্রাচীর (ice wall)। ট্রেকিং রুটের শুরু মদমহেশ্বর যাবার পথের রাঁশি গ্রাম থেকে। অভিজ্ঞতা না থাকলে এপথে একা না যাওয়াই শ্রেয়। তবে যদি কোন অভিজ্ঞ দলের সঙ্গে এ পথে যাওয়ার সৌভাগ্য হয় তবে এক অনাস্বাদিত জগতে প্রবেশ

রাঁশি গ্রাম

করার অভিজ্ঞতা হবে।

ট্রেকিং রুটঃ বেস ক্যাম্প রাঁশি

	উচ্চতা (মি)	দূরত্ব (কিমি)	রাস্তা
মন্‌সুনা - লেখ (বা লেঙ্ক)		৬ কিমি	হাঁটা
লেঙ্ক - রাঁশি	১৩১১ মি	৩ কিমি	হাঁটা
রাঁশি - কানার	৩৩০৮ মি	১১কিমি	হাঁটা
কানালা - মান্দানী	৩৬০৯ মি	৭ কিমি	হাঁটা
মান্দানী - ইয়ংবুক	৪৭০০ মি	৪ কিমি	হাঁটা
ইয়ংবুক - বিশালী	৪৭৫০ মি	৪ কিমি	হাঁটা

কেদারনাথের পথে কূন্ড, উখীমঠ হয়ে মন্‌সুনা পৌঁছন। মন্‌সুনা উভয় জায়গায় থাকার বন্দোবস্ত আছে। বস্তুত রাঁশি গ্রাম অবধি থাকার জায়গা মিলবে। এপথে যেতে পাহাড়ে চড়ার সামগ্রী, তাঁবু খাবার দাবার সমস্ত নিয়ে যাওয়া আবশ্যিক ।

কুমায়ুনের হিমবাহ

গাড়োয়ালের যেমন খ্যাতি চারধামের জন্য কুমায়ুনের খ্যাতি এর অনুপম নৈসর্গিক দৃশ্যের জন্য। কুমায়ুনকে ট্রেকারদের স্বর্গরাজ্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। সাধারণ ভ্রমণার্থীদের কাছে যেমন নৈনিতাল, রানীক্ষেত, আলমোড়া, কৌশানী এবং বর্তমানে মুনসিয়ারী বিনসর, চৌকরি প্রভৃতি শৈলশহরগুলি অতিপরিচিত, ট্রেকারদের কাছে ও তেমনি কুমায়ুনের পিন্ডারী, মিলাম, সুন্দরডুঙ্গা, রূপকুন্ড প্রভৃতি ট্রেকিং রুটের আকর্ষণ চুম্বকের আকর্ষণের মতই। তবে কুমায়ুনের হিমবাহের মধ্যে প্রথমেই যে নামটি সকলের মনে আসে তা হল নি:সন্দেহে পিন্ডারীর নাম। আমরা তাই কুমায়ুনের হিমবাহের পরিচিতি শুরু করব পিন্ডারী হিমবাহ দিয়ে।

পিন্ডারী হিমবাহঃ-

হিমালয়ের যত হিমবাহ আছে গোমুখ বাদ দিলে সবচেয়ে জনপ্রিয় পিন্ডারী হিমবাহ। অবশ্য পিন্ডারীতে সাধারণত: চারধামের যাত্রীরা যান না। তবে পথ অপেক্ষাকৃত সুগম ও বহু-ব্যবহৃত বলে ট্রেকারদের কাছে খুবই প্রিয় এই হিমবাহ।

হিমবাহটি কিন্তু খুব বড় নয়। মোট ৫ কিমি দৈর্ঘ্য। এটি Transverse হিমবাহ, এটিতে দুটি বরফের ধারা এসে মিশেছে যাদের উপহিমবাহ বলা যায়। এই দুটি ধারাব মধ্যে পার্থক্য ৩ কিমি। পিন্ডারীর স্নাউটের উচ্চতা ৩,৫১৬ মি। পিন্ডারীর কাছে কিন্তু রয়েছে পটিং হিমবাহ (Poting Glacier) যেটি দৈর্ঘ্যে মোটে ৩.৫ কিমি কিন্তু এর চারিপাশের নৈসর্গিক দৃশ্য অপূর্ব। এটির স্নাউটের উচ্চতা ৩৬৫০ মি। এটি নন্দাকোট শৃঙ্গের ঢালের উপর অবস্থিত Transverse হিমবাহ। অবশ্য এর ট্রেকিং রুট পরিচিত নয় বলে ট্রেকারদের কাছে এর দ্বার রুদ্ধ।

চলবে

ছবি: সংগৃহীত

‘‘টুভালু, বা কাছাকাছি আটজন’’-

হারিয়ে যেতে থাকা এক স্বর্গের গল্প।

ইন্দ্রশেখর

ছোটবেলায় যখন টুভালুতে থাকতাম তখন কখনো এমন দানবিক জোয়ার কখনো আসতে দেখিনি। এখন এই ধরনের ‘রাজা জোয়ার’ বা কিং টাইড বেশ ঘনঘনই আসছে এ দেশে। সেইসব জোয়ারের সময় গোটা সমুদ্রটা উঠে একেবারে যেন ঘরবাড়ির উঠোনে চলে আসে।----

কথাগুলো বলেছেন সঙ্গের ছবির মানুষটি। তাঁর নাম ডন কেনেডি। উপস্থিত অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন শহরে থাকেন। মাঝেমধ্যে নিজের দেশে ঘুরে যান। তবে খুব শিগগিরিই মাতৃভূমিতে আসা বন্ধ করতে হবে তাঁকে। কারণ তাঁর মাতৃভূমি আর কিছুদিনের মধ্যেই সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যাবে। হারিয়ে যাবে একটা গোটা দেশ। তার নাম টুভালু। ঘন ঘন ধেয়ে আসা ওই ‘রাজা জোয়ার’-রা তারই ইঙ্গিত।

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে হাওয়াই আর অস্ট্রেলিয়ার মাঝামাঝি পঁচিশ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের একটা নীল লেগুনকে ঘিরে লম্বাটে গড়ণের আটটি প্রধান ও কয়েকটি ছোট ছোট প্রবাল দ্বীপ নিয়ে গড়া টুভালু নামের দেশটার মোট আয়তন দশ বর্গমাইল। সাড়ে দশ হাজার জনসংখ্যার নীরিখে এটি পৃথিবীর তৃতীয় ক্ষুদ্রতম দেশ। টুভালুয়ান ভাষায় এ দেশের নামের অর্থ হল ‘কাছাকাছি আটজন।’ তিন হাজার বছর আগে পলিনেশিয়রা এখানে প্রথম বসবাস শুরু করে। ১৮৪১ সালে মার্কিনদের একটা অভিযানের মাধ্যমে সাহেবরা এ দেশে প্রথম পা ফেলে। এরপর ইংল্যান্ড এ দেশের দখল নেয়। ১৯৭৮ সলে টুভালু স্বাধীন হয়।

এখন টুভালু একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এর পার্লামেন্টের (*ফালে ই ফোনো*) সদস্যসংখ্যা ১৫। প্রতিটি দ্বীপের শাসনভার আছে রয়েছে একটি করে দ্বীপ কাউন্সিল বা *তে সিনা ও ফিনুয়ার* (অর্থ: দেশের পাকাচুল মাথাগণ)ও একটি নির্বাচিত গ্রামসভার হাতে। তাদের নেতাকে বলা হয় যথাক্রমে *উলু আলিকি এবং পুলে ও কাপুলে*। নির্বাচন হলেও এ দেশে কোন রাজনৈতিক দল নেই।

শুধুমাত্র রাজনৈতিক দল নেই তা নয়, এ দেশের কোন সেনাবাহিনীও নেই। একটামাত্র পেট্রল বোট আছে গোটা দেশে, যা কিনা আবার ডুবন্ত মানুষকে উদ্ধার আর নজরদারির কাজে ব্যবহার করা হয়।

এ দেশে রাস্তা আছে মোট আট কিলোমিটার। তার অধিকাংশটাই রয়েছে রাজধানী দ্বীপ ফুনাফুটিতে। সেইখানেই রয়েছে এ দেশের একমাত্র বিমানবন্দরটিও। আজ একুশ শতকেও বৃষ্টির জল ধরে টুভালুয়ানরা খাবার জলের চাহিদা মেটান। প্রধান খাদ্য, মাটিতে গর্ত করে তাতে কমপোস্ট জমিয়ে ফলানো পুলাকা গাছের শেকর, সমুদ্রের কাঁকড়া, কচ্ছপ আর কিছু মাছ। কোন উৎসব হলে তবে শুয়োরের মাংস জোটে ভোজের খাবার হিসেবে।

স্বর্গের মতো সুন্দর এই দেশের মানুষ অবসর পেলে খেলেন ক্রিকেটের মত একরকমের খেলা । তার নাম কিলিকিটি। ছ থেকে পনেরো বছরের মধ্যে শিক্ষা বাধ্যতামূলক। একশো শতাংশ লোক শিক্ষিত এই দ্বীপদেশে।

হানাহানি, যুদ্ধ, হিংসা, ব্যবসা, অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রযুক্তি, এর কোনকিছুই নয়, আন্তর্জাতিক মঞ্চে টুভালু একটি মাত্র বিষয় নিয়েই কথা বলে। তা হল, পৃথিবীর তাপমাত্রার বেড়ে চলা। তার ফলে সমুদ্র উঁচু হয়ে উঠে ক্রমশই গিলে ফেলছে গোটা দেশটাকেই। বিভিন্ন সভায় সমিতিতে তারা বারংবার শুধু উন্নত দেশদের কাছে আবেদন করে, আমাদের কথা একটু ভেবে পরিবেশ দূষণ একটু কমান আপনারা। নইলে আপনাদের উন্নতির দৌড় বাতাসকে দূষিত করে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়াচ্ছে আর তার ফলে আমাদের দেশটা তলিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের গভীরে।

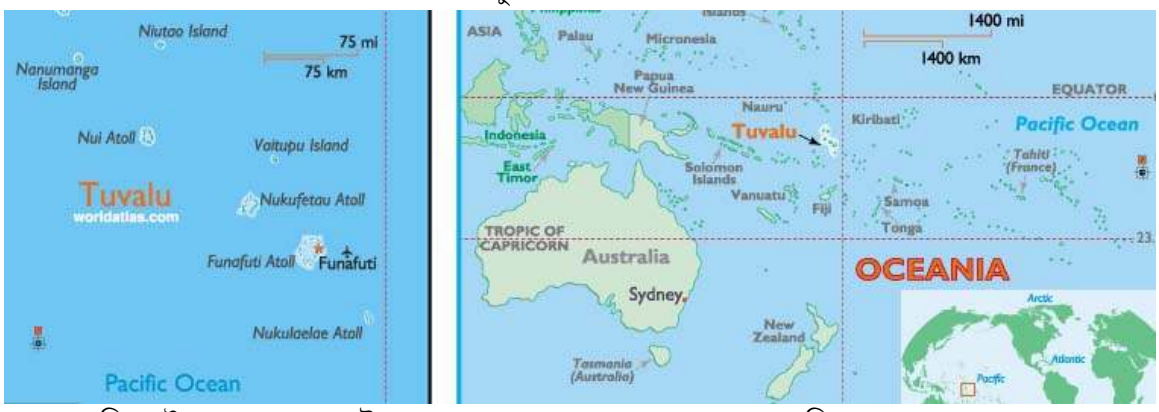

কিন্তু টুভালুর কথা কেউ শোনে না। শোনবার সময় আছে নাকি আমাদের? অথবা আমাদের জগতে হয়তো এখন এইরকম শিক্ষিত , সরল, যুদ্ধহীন, রাজনীতিহীন, গাছের শেকর আর বৃষ্টির জল খেয়ে বেঁচে থাকা মানুষের দেশের কোন স্থান নেই। তাই কি টুভালু বাকি দুনিয়াটাকে দেখে লজ্জায় সমুদ্রের মধ্যে মিশে যাচ্ছে?

ডন কেনেডি অবশ্য এত সহজে দমে যাবার লোক নন। আধুনিক যুগের এই নোয়া তাঁর দেশবাসীর জন্য, ফিজির কিওয়া দ্বীপে গড়ে তুলছেন একটা নতুন ছোট্ট , সুন্দর দেশ, যাতে তাঁর সমুদ্রে তলিয়ে যাবার পরেও তাঁর মাতৃভূমি টুভালু বেঁচে থাকে নতুন কোন শক্ত জমির ওপরে।

ডন কেনেডি সফল হোন, এই কামনা করে জয়ঢাক। বেঁচে থাক সুন্দর দেশ টুভালু। নইলে ভবিষ্যতে যখন আমাদের হুঁশ ফিরবে, তখন মানুষকে সুন্দরভাবে বাঁচবার রাস্তা নতুন করে দেখাবার লোকের বড় অভাব হয়ে যাবে যে!

ছবি: সংগৃহীত